উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর জীবনী

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية يؤدي إلى راحة البال

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর জীবনী

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

উমর ইবনে খাত্তাবের জীবন (রহঃ)

দ্বিতীয় সংস্করণ। 17 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মহান সাহাবী, ইসলামের দ্বিতীয় সঠিক নির্দেশিত খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবন থেকে কিছু পাঠ নিয়ে আলোচনা করে।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর জীবনী

ইসলাম গ্রহণের আগে মক্কায় জীবন

শিক্ষার গুরুত্ব

এমনকি প্রাক-ইসলামী জাহেলী যুগেও, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবী পড়তে শিখেছিলেন, যা সেই সময়ে খুবই বিরল ছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 44-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তার মনোভাব স্পষ্টভাবে জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

আপনার যত্ন অধীনে

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শৈশব ছিল কঠোর। তিনি তার পিতা আল খাত্তাবের উটের প্রতি যত্নবান হতেন, যিনি তাকে ক্লান্ত করে দিতেন এবং যদি তিনি তার কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হন তবে তাকে মারধর করতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 45-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

শৈশবকালে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কঠোর আচরণ তার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল কারণ তিনি প্রাক-ইসলামী যুগে কঠোর প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের সাথে এইভাবে আচরণ না করার চেষ্টা করতে হবে এবং পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সঠিক উপায়ে লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত

অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখ হালাল জিনিসের দিকে তাকানোর জন্য এবং তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জন্য প্রদান করা এবং মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে কারণ এটিই শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

অসুবিধা পরে সহজ

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শৈশব ছিল কঠোর। তিনি তার পিতা আল খাত্তাবের উটের প্রতি যত্নবান হতেন, যিনি তাকে ক্লান্ত করে দিতেন এবং যদি তিনি তার কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হন তবে তাকে মারধর করতেন। তার খিলাফতের সময়, তিনি একবার তার রুক্ষ শৈশবের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং তারপর মন্তব্য করেছিলেন যে যদিও তাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে তার এবং মহান আল্লাহর মধ্যে কোন ব্যক্তি ছিল না, অর্থাত্, তার উপর তার মতো কারো কর্তৃত্ব ছিল না। খলিফা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 45-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদ, 2803 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝার গুরুত্বের উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি অসুবিধা সহজে অনুসরণ করা হবে। এই বাস্তবতাটি পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, তালাকের অধ্যায় 65, আয়াত 7:

"... আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি [অর্থাৎ স্বস্তি] আনবেন।"

মুসলমানদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ধৈর্য এবং এমনকি সন্তুষ্টির জন্ম দেয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয়ে অনিশ্চিত হওয়া একজনকে

অধৈর্য, অকৃতজ্ঞতা এবং এমনকি বেআইনি জিনিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন বেআইনি বিধান। কিন্তু যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত অসুবিধা অবশেষে সহজে প্রতিস্থাপিত হবে, তিনি ধৈর্য সহকারে ইসলামের শিক্ষার উপর আস্থা রেখে এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন। এই ধৈর্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং অনেক পুরস্কারপ্রাপ্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 146:

"... আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

এই কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এমন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করেছেন যখন কঠিন পরিস্থিতির পরে স্বাচ্ছন্দ্য ও আশীর্বাদ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে মহানবী নূহ (আঃ) তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে মহাকষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিভাবে মহান আল্লাহ তাকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 76:

"আর [উল্লেখ করুন] নূহ, যখন তিনি [আল্লাহর কাছে] ডাকেন [সেই সময়ের আগে], অতঃপর আমরা তাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে এবং তার পরিবারকে মহা বিপদ [অর্থাৎ বন্যা] থেকে রক্ষা করেছি।"

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 69:

“আমরা [অর্থাৎ আল্লাহ] বললাম, হে আগুন, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।

মহানবী ইব্রাহীম (আঃ) একটি বড় আগুনের আকারে একটি বড় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এটিকে শীতল ও শান্তিময় করে দিয়েছিলেন।

এই উদাহরণগুলি এবং আরও অনেকগুলি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে কঠিন সময়ের একটি মুহূর্ত অবশেষে তাদের জন্য সহজ হবে যারা আল্লাহর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য এই ইসলামী শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ যে অগণিত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য, যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পরে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। মহান আল্লাহ যদি তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাদেরকে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত বড় অসুবিধা থেকে রক্ষা করেন তবে তিনি ছোট ছোট অসুবিধার সম্মুখীন আজ্ঞাবহ মুসলমানদেরকেও রক্ষা করতে পারেন এবং করবেন।

উপার্জনের গুরুত্ব

তাঁর শৈশবকালে, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা এবং তাঁর খালাদের জন্য রাখাল হিসাবে কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তিনি একজন ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন যিনি অনেক ব্যবসায়িক সফর করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 45-47-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি একজনের হালাল রিজিক উপার্জনের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দাবি করে, তাদের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ,

মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে এবং মহান আল্লাহ্‌ অকার্যকর জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা। একজন মুসলিম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান যার মধ্যে রয়েছে সম্পদও বরাদ্দ করা হয়েছিল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তাই একজন মুসলমানের উচিত হবে আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা দাবী করার সময়, যখন তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় আছে, তখন সামাজিক সুবিধা নিয়ে চলার মাধ্যমে অলস হওয়া উচিত নয়।

ন্যায়বিচার দিয়ে বিচার করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু আরবদের জীবন, পরিস্থিতি ও রীতিনীতি সম্পর্কে জানার জন্য সর্বদা উদগ্রীব থাকতেন, লোকেরা তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য তাঁর কাছে আসত। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 47-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের মধ্যে বিচার করা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই, একজনকে সর্বদা তাদের সমস্ত সিদ্ধান্তে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল

নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও...”

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

ইসলামের রাষ্ট্রদূত

যেহেতু উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন জ্ঞানী, বাগ্মী, সুভাষী, বলিষ্ঠ, মহৎ এবং বক্তৃতায় স্পষ্ট, তাই তিনি মক্কার শাসক গোত্র তথা কুরাইশদের দূত হিসেবে নির্বাচিত হন। কুরাইশ গোত্রের সাথে অন্য কারো মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য পাঠাত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 47-48-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মুসলমানদের ইসলামের দূত হিসেবে তাদের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেবে। মুসলমানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হল মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর পছন্দের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া। ইসলাম সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে কারণ ধার্মিক পূর্বসূরিরা এই দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। যখন তারা উপকারী জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তার উপর কাজ করেছিল তখন বহির্বিশ্ব তাদের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেছিল। এর ফলে অগণিত মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। দুর্ভাগ্যবশত, আজকে অনেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে ইসলাম সম্পর্কে অন্যদের দেখানো শুধুমাত্র একজনের চেহারা, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা। এটি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার একটি দিক মাত্র। পবিত্র কুরআনে আলোচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবলম্বন করা এবং তাঁর ঐতিহ্যের সবচেয়ে বড় অংশ। শুধুমাত্র এই মনোভাব নিয়েই বহির্বিশ্ব ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ অবলোকন করবে। একজন মুসলমানের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে ইসলামিক চেহারা

গ্রহণ করা শুধুমাত্র বহির্বিশ্বকে ইসলামকে অসম্মান করার কারণ করে। তাদের এই অসম্মানের জন্য দায়ী করা হবে কারণ তারা এর কারণ। তাই একজন মুসলমানের উচিত ইসলামের বাহ্যিক রূপের পাশাপাশি ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃত দূত হিসেবে আচরণ করা।

উপরন্তু, এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, মুসলমানদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে যে তারা বিচারের দিনে এই ভূমিকা পালন করেছে কি না। একজন বাদশাহ যেভাবে তাদের কূটনীতিক ও প্রতিনিধির উপর ক্রুদ্ধ হবেন যদি তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তেমনি মহান আল্লাহও সেই মুসলিমের উপর ক্রুদ্ধ হবেন যারা ইসলামের দূত হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

ইচ্ছাপূজা করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে কঠোরভাবে লালন-পালন করায় এবং তাঁর জনগণের আচার-আচরণ ও রীতিনীতির প্রতি প্রবল ভালোবাসা থাকায় তিনি প্রাথমিকভাবে ইসলামের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে ইসলাম মক্কায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করবে, এমন একটি ব্যবস্থা যা মক্কাকে আরব জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিল যে মক্কাবাসীদের সম্মানের সাথে আচরণ করা হয়েছিল এবং এটি তাদের সমৃদ্ধির কারণ ছিল। মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে থেকে ধনী ও প্রভাবশালীরা ইসলামের সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করার এটাই একটি প্রধান কারণ। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 48-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সত্য হল যে মিথ্যা দেবতার প্রতিটি উপাসক কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার পূজা করে। তাদের দেবতারা তাদের আকাঙ্ক্ষার একটি শারীরিক প্রকাশ মাত্র যা তারা পূজা করে। এটা স্পষ্ট যে একজন ব্যক্তি যে মূর্তির আকারে একটি দেবতার পূজা করে সে জানে যে নিষ্প্রাণ মূর্তি তাদের জীবনকে নির্দিষ্টভাবে বাঁচতে নির্দেশ দিতে পারে না তাই উপাসক নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কীভাবে তাদের নিষ্প্রাণ মূর্তিটি তাদের জীবনযাপন করতে চায় তা কল্পনা করে। এবং এই আচরণবিধি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তাদের কামনা বাসনার উপাসনাই তাদের ইবাদতের মূল। প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তিরা এই মানসিকতায় আরও নিমজ্জিত হয় কারণ তারা সচেতন যে সত্য অর্থ ইসলাম গ্রহণ করা তাদের একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য করবে যা তাদের বিপথগামী ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে বাধা দেবে। তারা অন্যদের তাদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেয় কারণ তারা তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হারাতে চায় না। এ কারণেই

ইতিহাসে দেখা যায় তারাই সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা করেছিল।

সহানুভূতি অনুভব করা

সামাজিকভাবে দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মক্কার অমুসলিমদের সহিংসতা বেড়ে যাওয়ায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের কয়েকজনকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের রাজা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং তারা সেখানে নিপীড়নের সম্মুখীন হবে না। অনেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পরিবার, ব্যবসা এবং ঘরবাড়ি রেখে চলে গেলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খন্ড 2, পৃষ্ঠা 1-2 এ আলোচনা করা হয়েছে।

যখন সাহাবায়ে কেরামের একটি দল, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মক্কা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা তাকে বলেছিল যে তারা মক্কা ছেড়ে যাচ্ছে কারণ তারা তার এবং অন্যান্য অমুসলিমদের প্রতি বিরক্ত ছিল যারা ক্রমাগত তাদের উপর অত্যাচার করত। তার সাধারণ কঠোরতা দেখানোর পরিবর্তে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এমন কিছু কথা বলেছিলেন যা তাদের ধারণা দেয় যে তিনি তাদের মিস করবেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 49-50-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি কঠোর ছিলেন তবুও তাঁর কঠোরতা মন্দের মধ্যে নিহিত ছিল না বরং মক্কার অমুসলিমদের প্রতি ভুল আনুগত্য এবং তাদের পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিহিত ছিল। মনে হয়, তিনি কেবল সেভাবেই আচরণ

করেছিলেন যেভাবে তিনি তার লোকদের ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন, যেমনটি ইসলামের আগমনের আগে ছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অন্যদের প্রতি এই ধরনের সহানুভূতি থাকা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি সম্ভবত প্রথম আবেগ ছিল যা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রতি তার মনোভাব পুনর্বিবেচনা করতে উৎসাহিত করেছিল, কারণ তার আচরণ তার নিজের লোকদেরকে তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। যেখানে, মক্কার অন্যান্য অমুসলিমদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র সম্পদ ও কর্তৃত্বের লোভ থেকে তাদের জীবনযাত্রাকে রক্ষা করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং তাই, তারা বিদায়ী সাহাবীদের জন্য আনন্দিত হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারায় যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে যার ফলে তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সমর্থন করার দায়িত্ব ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের

বাইরেও প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য যেমন ভালো এবং আন্তরিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এড়াতে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম।

যদিও একজন মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

উমর (রাঃ) ইসলামের সন্ধান

ইসলামকে সমর্থন করে

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ইসলাম গ্রহণের কিছু আগে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নিম্নোক্ত দু'জনের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল, তার মাধ্যমে ইসলামকে সমর্থন করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। : আবু জাহেল বা উমর ইবনে খাত্তাব রা. তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। জামে আত তিরমিযী, ৩৬৮১ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আন্তরিকতা অবলম্বন করে ইসলামকে সমর্থন করেছিলেন। মুসলমানদের অবশ্যই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল আন্তরিকতার প্রতি: আল্লাহ, মহান, তাঁর গ্রন্থ, অর্থ, পবিত্র কুরআন, পবিত্র নবী মুহাম্মদের প্রতি, শান্তি। এবং তার উপর, সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যীনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি...।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না...।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য , অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার

ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি আন্তরিক হওয়া। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের

প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলমানের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

ঈমানে অবিচলতা

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার অমুসলিমদের নেতারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজতে খুঁজতে তরবারি নিয়ে তাদের সভা ত্যাগ করলেন, তখন তিনি নুয়াইম ইবনে আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলেন, যিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধমক দিয়েছিলেন, তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন: তাঁর বোন, শ্যালক এবং চাচাতো ভাই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বোনের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তিনি তাদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনেছিলেন এবং তার বাড়িতে প্রবেশ করার পরে তারা প্রথমে অস্বীকার করেছিল যে তারা যা করছে। অবশেষে, তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা প্রহার করা সত্ত্বেও তাদের ইসলাম ঘোষণা করে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 51-53-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এমনকি সহিংসতা ও নিপীড়নের মুখেও উমরের বোন ফাতিমা বিনতে আল খাত্তাব এবং তার স্বামী সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিশ্বাসে অটল ছিলেন।

জীবনে একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি

মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

জেদ এড়িয়ে চলা

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার অমুসলিমদের নেতারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজতে খুঁজতে তরবারি নিয়ে তাদের সভা ত্যাগ করলেন, তখন তিনি নুয়াইম ইবনে আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলেন, যিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধমক দিয়েছিলেন, তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন: তাঁর বোন, শ্যালক এবং চাচাতো ভাই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বোনের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তিনি তাদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনেছিলেন এবং তার বাড়িতে প্রবেশ করার পরে তারা প্রথমে অস্বীকার করেছিল যে তারা যা করছে। অবশেষে, তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা প্রহার করা সত্ত্বেও তাদের ইসলাম ঘোষণা করে। অবশেষে, উমর, তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, শান্ত হন এবং তার বোনকে অনুরোধ করেন যে তারা কী আবৃত্তি করছে তাকে দেখাতে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 51-53-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর আত্মীয় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করার পর, তাঁর একগুঁয়েমিকে একপাশে রেখেছিলেন এবং তাদের বিশ্বাসকে সঠিকভাবে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের বিষয়ে অটল থাকা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু অধিকাংশ পার্থিব বিষয়ে একে বলা হয় একগুঁয়েমি, যা দোষারোপযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে বা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা জেদীভাবে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে এই বিশ্বাস করে যে তারা যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ তারা হেরেছে এবং অন্যরা যারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে তারা জিতেছে। এটা নিছক শিশুসুলভ।

প্রকৃতপক্ষে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকবে তবে পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, যতক্ষণ না এটি পাপ নয়, তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় এটি আসলে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের জীবনে অন্যরা তাদের পরিবর্তন করতে চান, যেমন তাদের আত্মীয়রা। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হ'ল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের উচিত তার চেয়ে ভাল পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের

সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্কে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ ভালোর জন্য একজনের চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রকৃত শক্তি লাগে।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায় যা তাদের জীবন থেকে শান্তি সরিয়ে দেবে। এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে তারা সবসময় শান্তির এক স্টেশন থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে তবে অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলে তারা পরিবর্তন করেছে তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

উপসংহারে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পাপ সংঘটিত হয় না একজন ব্যক্তির উচিত মানিয়ে নিতে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি পায়।

সত্যিকারের বিশ্বাস

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার অমুসলিমদের নেতারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজতে খুঁজতে তরবারি নিয়ে তাদের সভা ত্যাগ করলেন, তখন তিনি নুয়াইম ইবনে আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলেন, যিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধমক দিয়েছিলেন, তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর নিজের পরিবারের সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন: তাঁর বোন, শ্যালক এবং চাচাতো ভাই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বোনের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তিনি তাদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনেছিলেন এবং তার বাড়িতে প্রবেশ করার পরে তারা প্রথমে অস্বীকার করেছিল যে তারা যা করছে। অবশেষে, তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বারা প্রহার করা সত্ত্বেও তাদের ইসলাম ঘোষণা করে। অবশেষে, উমর তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, শান্ত হন এবং তার বোনকে অনুরোধ করেন যে তারা কী আবৃত্তি করছে তাকে দেখাতে। তিনি তাকে প্রথমে নিজেকে ধৌত করতে আদেশ করলেন, কারণ সে অশুচি ছিল। এটি করার পর, তিনি যে কাগজটি তারা তেলাওয়াত করছেন তা হাতে নিয়ে পবিত্র কুরআনের 20 ত্বহা তিলাওয়াত করতে লাগলেন। তাঁর তিলাওয়াতের সময় ঈমানের আলো তাঁর আধ্যাত্মিক হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। তারপর তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের গৃহের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আধ্যাত্মিক হৃদয়ে প্রবেশকারী সত্য প্রত্যক্ষ করার পর, তিনি নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার কথা বললেন। তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, তাঁর হেদায়েত বা আবু জাহেলের হেদায়েতের জন্য তৈরি। এই দোয়াটি জামে আত তিরমিযী, 3681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, অতঃপর মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

কাছে গেলেন, যিনি তাঁর সাহাবীগণের সাথে ছিলেন। তাদের সাথে সন্তুষ্ট। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেন কিন্তু তাকে ভিতরে যেতে দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করতে চেয়ে তাকে ধরে ফেলেন। , কিন্তু পরেরটি তাদের তাকে ছেড়ে দিতে আদেশ করেছিল৷ অতঃপর মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ইসলাম ঘোষণা করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 51-56-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবন থেকে এটা স্পষ্ট যে, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি শুধুমাত্র মৌখিকভাবে এর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেননি বরং বাস্তবে এর শিক্ষা অনুসরণ ও মেনে চলেন। এটা প্রত্যেক মুসলমানের মনোভাব হওয়া উচিত।

কুফরী হতে পারে ইসলামকে আক্ষরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা কর্মের মাধ্যমে, যার মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করা জড়িত, যদিও কেউ তাকে বিশ্বাস করে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি একজন অসচেতন ব্যক্তিকে অন্য একটি সিংহের কাছ থেকে সতর্ক করা হয় এবং অসচেতন ব্যক্তি নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেয় তবে তারা এমন একজন বলে বিবেচিত হবে যিনি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করেছিলেন কারণ তারা সতর্কতার ভিত্তিতে তাদের আচরণকে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, যদি অসচেতন ব্যক্তি সতর্ক করার পরে কার্যত তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে, তবে লোকেরা সন্দেহ করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সতর্কীকরণে বিশ্বাস করে না এমনকি যদি অসচেতন ব্যক্তিটি তাদের প্রদত্ত সতর্কতায় মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করে।

কিছু লোক দাবি করে যে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য তাদের অন্তরে রয়েছে এবং তাই তাদের বাস্তবিকভাবে এটি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূর্খ মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের অধিকারী যদিও তারা ইসলামের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো অন্তর পবিত্র হয় তখন তার শরীর পবিত্র হয় যার অর্থ তার কর্ম সঠিক হয়। কিন্তু কারো হৃদয় কলুষিত হলে শরীর কলুষিত হয় যার অর্থ তাদের কাজ হবে কলুষিত ও ভুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে সে কখনো বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা বাস্তবিকভাবে তাদের প্রমাণ ও প্রমাণ যা বিচার দিবসে জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকাটা একজন ছাত্রের মতোই নির্বোধ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে তাদের জ্ঞান তাদের মনে আছে তাই তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এটি লিখতে হবে না। নিঃসন্দেহে এই ছাত্রটিও একইভাবে ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে বিচার দিবসে উপনীত হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, যদিও তাদের বিশ্বাস থাকে। তাদের হৃদয়

মন্দ থেকে ভালোর স্বীকৃতি

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, প্রাক-ইসলামী জাহেলিয়াতের দিনগুলির উপায় ও রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের প্রতি ভালবাসা এবং তারা যে পার্থিব সুবিধা নিয়ে এসেছেন, তিনি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর, তিনি এর সৌন্দর্য এবং প্রকৃত প্রকৃতি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই ভাল এবং মন্দের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য স্বীকার করেছিলেন; হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতা; এবং সত্য এবং মিথ্যা। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 48-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, কারণ অজ্ঞতা একজনকে মন্দ থেকে ভাল এবং মিথ্যা থেকে সত্যকে চিনতে বাধা দেয়।

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র। এর অর্থ এই যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং পাপ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় জীবন

একটি ভিন্ন পথ নির্বাচন করা

ইসলাম গ্রহণের পর, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মামা আবু জাহেলের সাথে দেখা করতে যান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবু জাহেল রাগান্বিত হয়ে তার ঘরে ফিরে আসে এবং তার মুখে দরজা ধাক্কা দেয়। একই ঘটনা ঘটেছিল যখন তিনি মক্কার অমুসলিমদের মধ্যে থেকে আরেকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যান। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 57-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সাধারণত যখন কেউ এমন একটি পথ বেছে নেয় যা অন্যদের পথ থেকে ভিন্ন, যেমন তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব, তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনা এবং প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সমালোচনা একজন ব্যক্তির আত্মীয়দের কাছ থেকে আসে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন মুসলমান ইসলামের শিক্ষার উপর কাজ করার জন্য আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যদি এটি এমন কিছু হয় যা তাদের পরিবার নিজেরাই অনুসরণ করে না তখন তারা তাদের কাছ থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হবে। তারা বোকা এবং চরম বলে আখ্যা দেবে যারা তারা বিশ্বাস করেছিল যে তাদের পথে তাদের সমর্থন করবে। মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যে বৈধ পথ বেছে নেয় তার উপর অবিচল থাকা এবং মহান আল্লাহর সাহায্যের উপর আস্থা রাখে, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ

থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, এই অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার জন্য। .

এটি মানুষের কাছ থেকে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া কারণ যখন একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে জীবনের একটি ভিন্ন পথ বেছে নেয় তখন তাদের মনে হয় যে তার পথটি খারাপ বা মন্দ এবং এই কারণেই ব্যক্তিটি একটি ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে। যদিও ব্যক্তি এটি বিশ্বাস করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি ভিন্ন পথ বেছে নেয় এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের জন্য ভাল তবুও তারা সমালোচনার সম্মুখীন হবে। একই কারণে সমস্ত নবী (সাঃ) তাদের লোকদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল কারণ তারা বেছে নিয়েছিলেন এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্যদেরকে একটি ভিন্ন ভাল পথের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

উপসংহারে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের জীবনে চলার পথ বৈধ হয় ততক্ষণ তাদের অবিচল থাকা উচিত এবং অন্যের সমালোচনায় বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাদের অবস্থা ও চরিত্রের উন্নতির চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের বৈধ পছন্দ অনুসরণ করতে তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

আপনার ব্যবসা মন

ইসলাম গ্রহণের পর, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর ঘর, কাবার নিকটবর্তী অমুসলিমদের সমাবেশে ঘুরে বেড়ান। প্রতিবার তিনি একটি দলকে তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতেন তারা তাকে আক্রমণ করবে কিন্তু সে তাদের প্রতিহত করবে, কারণ সে একজন শক্তিশালী মানুষ ছিল। এটি কিছু সময়ের জন্য চলল এবং অবশেষে মক্কার অমুসলিমদের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আল আস ইবনে ওয়াইল আস সাহমি কি ঘটছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে বলা হল উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাদের নিজস্ব ধর্ম বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা হিসাবে তাদের তাকে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, যদি তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করে, তাহলে তার গোত্র বানু আদিয়াই তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেবে। ফলে অমুসলিমরা তাকে একা ছেড়ে দেয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 57-58-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আল আস, একজন অমুসলিম হতে পারে তবুও সে সত্য বলেছিল। ব্যবসায় মন দেওয়া ইসলামের একটি প্রধান শাখা।

জামে আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইসলামকে সুন্দর করে তুলতে পারে না যতক্ষণ না তারা সেসব বিষয় এড়িয়ে চলে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এই হাদিসটিতে একটি সর্বব্যাপী উপদেশ রয়েছে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এতে একজন ব্যক্তির বক্তৃতা এবং সেইসাথে তাদের অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অর্থ হল যে একজন মুসলমান যে তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে চায় সেগুলিকে অবশ্যই কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে এড়িয়ে চলতে হবে, যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এবং পরিবর্তে তাদের অবশ্যই সেই জিনিসগুলির সাথে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে যা করে। যে বিষয়গুলো তাদের উদ্বেগজনক তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সাথে যে দায়িত্ব পালন করা হয় তা পালন করার চেষ্টা করা উচিত একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে কেউ যদি তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জিনিসগুলি এড়িয়ে চলে তবে তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দেয় সে সেসব এড়িয়ে চলে যা ইসলাম পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছে। অর্থ, একজনকে তাদের সকল দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, সমস্ত পাপ এবং ইসলামে অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এমনকি অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসের অতিরিক্ত ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে হবে। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। এটি তখনই যখন কেউ মহান আল্লাহকে পালন করে এবং উপাসনা করে, যেন তারা তাকে পালন করতে পারে বা অন্ততপক্ষে তারা আল্লাহ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়। , মহিমান্বিত, তাদের প্রতিটি চিন্তা এবং কর্ম পর্যবেক্ষণ. এই ঐশ্বরিক নজরদারি সম্পর্কে সচেতন হওয়া একজন মুসলমানকে সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং সৎ কাজের দিকে ত্বরান্বিত করতে উৎসাহিত করবে। যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে না, সে এ শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাতে পারবে না।

একজন ব্যক্তিকে উদ্বেগজনক নয় এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার একটি প্রধান দিক বক্তৃতার সাথে যুক্ত। অধিকাংশ গুনাহ তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি

এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয়, যেমন গীবত এবং অপবাদ। নিরর্থক কথা বলার সংজ্ঞা হল যখন একজন ব্যক্তি এমন শব্দ উচ্চারণ করে যা পাপপূর্ণ নাও হতে পারে কিন্তু অকেজো এবং তাই তাদের উদ্বেগের বিষয় নয়। সহীহ বুখারি, 2408 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অনর্থক কথাবার্তা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অগণিত তর্ক, মারামারি এমনকি শারীরিক ক্ষতি হয়েছে কেবল এই কারণে যে কেউ এমন কিছু কথা বলেছে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে গেছে; অনেক বিয়ে শেষ হয়েছে কারণ কেউ তাদের ব্যবসায় কিছু মনে করেনি। এ কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন ধরনের উপকারী কথাবার্তার পরামর্শ দিয়েছেন যেগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তা করা উচিত। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

প্রকৃতপক্ষে, এমন শব্দ উচ্চারণ করা যা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয়, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের প্রধান কারণ হবে। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সমস্ত বক্তৃতা গণনা করা হবে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যদি না এটি ভাল উপদেশ, মন্দ নিষেধ বা মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে যুক্ত হয়। এর মানে হল যে অন্য সব ধরনের বক্তৃতা একজন ব্যক্তির উদ্বেগের বিষয় নয় কারণ তারা তাদের উপকার করবে না। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ভালো উপদেশ দেওয়া এমন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজনের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনে উপকারী, যেমন তারা পেশা।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বিষয়গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যা তাদের জন্য উদ্বেগজনক নয় যাতে তারা তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারে। সহজ করে বললে, যে ব্যক্তি সেসব বিষয়ের জন্য সময় উৎসর্গ করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়, সে তাদের উদ্বেগজনক বিষয়গুলিতে ব্যর্থ হবে। এবং যে ব্যক্তি তাদের উদ্বেগজনক জিনিসগুলির সাথে নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে যে বিষয়গুলিকে চিন্তা করে না সেগুলি ব্যয় করার জন্য সময় পাবে না। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর রহমতে উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করবে।

সত্যের উপর কাজ করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় কাবা শরীফে খোলাখুলিভাবে সালাত আদায় করতে রাজি করেন। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন. তাদের সংখ্যা, সামাজিক ক্ষমতা ও প্রভাব খুবই কম এবং দুর্বল হওয়ায় আগে এটা করা সম্ভব ছিল না। মক্কার অমুসলিমরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে তাদের আক্রমণ করার সাহস করেনি। এরপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল ফারুক উপাধি দেন, যার অর্থ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৩ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা অবলম্বন করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

নিজেকে রক্ষা করা

যেহেতু সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সামাজিকভাবে দুর্বল ছিলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তারা আল্লাহর ঘর, কাবা শরীফে সালাত আদায় করতে পারেননি। যখন তিনি মুসলিম হন তখন তিনি সাহাবীদের রক্ষা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, ক্ষতি থেকে এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন যতক্ষণ না তারা সাহাবীগণকে ছেড়ে চলে যান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 59-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

একজন মুসলমান যেমন চায় অন্যরা তাদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তাদের সম্মান রক্ষা করুক তাদেরও তাদের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে অন্যের সম্মান রক্ষা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, নিজের জন্য যা চায় তা অন্যের জন্য ভালবাসাই হল একজন প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা যখন অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে, যেমন গীবত করা। বা অপবাদ, নির্বিশেষে তারা যা বলছে তা সত্য বা না। এটি অন্যের দোষ গোপন করার একটি দিক যা মহান আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং উভয় জগতে তাদের দোষ গোপন

করে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এমন আচরণ করা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যের প্রতি ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ, যা একটি হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। জামি আত তিরমিযী, 2688 নম্বরে পাওয়া গেছে।

আলোচ্য প্রধান হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে একজন মুসলিম অন্যদের সমর্থন করে উপকৃত হয়, এমনকি যদি তারা অন্যের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে তবে তাদের অন্তত নিজের স্বার্থে এই পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত।

কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষতির ভয় ছাড়া অন্যদের সম্মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় যখন তারা এটি করার সুযোগ এবং শক্তি থাকে তার ভয় করা উচিত যে মহান আল্লাহ এমন সময় এবং স্থানে তাদের সম্মান রক্ষা করবেন না যেখানে অন্যরা তা লঙ্ঘন করছে। এবং বিশেষ করে, কেয়ামতের দিন।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি যেমন অন্যের সম্মান রক্ষার পরামর্শ দেয়, এটি পরোক্ষভাবে অন্যের সম্মান লঙ্ঘন না করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে আন নাসাই, নং 4998-এ প্রাপ্ত একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং বিশ্বাসীর লক্ষণ। বিশেষত, এটি পরামর্শ দেয় যে একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং বিশ্বাসী তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রাখে। .

মদিনায় হিজরত

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণের বিরুদ্ধে সহিংসতার পর, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেন। গোপনে, তারা তাদের মালিকানাধীন এবং জানত সবকিছু রেখে মদিনায় হিজরত করতে শুরু করে।

একমাত্র ব্যক্তি যিনি গোপনে হিজরত করেননি তিনি হলেন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যখন হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তিনি তার তলোয়ার নিয়েছিলেন, তার কাঁধে তার ধনুক রেখেছিলেন, তার তীরগুলি তুলেছিলেন এবং তার লাঠিটি তার পাশে নিয়েছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর ঘর কাবার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, যেখানে অমুসলিমরা বসে ছিল এবং কাবা প্রদক্ষিণ করে এবং ইব্রাহিম (আঃ)-এর মঞ্চের পিছনে সালাত আদায় করে। অতঃপর তিনি অমুসলিমদের প্রতিটি মজলিসে গেলেন এবং তাদের বললেন যে তিনি হিজরত করছেন এবং যে ব্যক্তি তাদের মাকে নিজের থেকে, তার সন্তানকে এতিম এবং তার স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, সে যেন উপত্যকার পিছনে তার সাথে দেখা করে। কেউ তাকে লড়াইয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ করার সাহস করেনি। পরিবর্তে, কিছু দুর্বল ও নিপীড়িত লোক তাকে অনুসরণ করে এবং তিনি তাদের ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং তারপর মক্কা ত্যাগ করেন এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাবীর সাথে মদিনার দিকে রওনা হন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 60-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এমন অসুবিধাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে দাবি করেন না। উদাহরণস্বরূপ, তারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে যেখানে তারা তাদের পরিবার, ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য রেখে এক বিচিত্র দেশে হিজরত করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তুলনামূলকভাবে, মুসলমানরা এখন যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ততটা কঠিন নয় যতটা ধার্মিক পূর্বসূরিরা সম্মুখীন হয়েছিল। তাই মুসলমানদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাদের শুধুমাত্র কয়েকটি ছোট কুরবানী করতে হবে, যেমন ফরজ ফজরের নামাজ পড়ার জন্য কিছু ঘুম কুরবানী এবং বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার জন্য কিছু সম্পদ। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাদের বাড়িঘর ও পরিবার পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে একজনের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি ব্যবহার করে কার্যত দেখাতে হবে।

উপরন্তু, যখন একজন মুসলিম সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তাদের উচিত ধার্মিক পূর্বসূরিরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল এবং কীভাবে তারা মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল তা মনে রাখা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই জ্ঞান একজন মুসলিমকে তাদের অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে শক্তি প্রদান করতে পারে কারণ তারা জানে যে ধার্মিক পূর্বসূরিরা মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল, তবুও তারা ধৈর্যের সাথে আরও কঠিন সমস্যা সহ্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী (সাঃ) তাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সহ্য করেছেন এবং তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

একজন মুসলমান যদি ধার্মিক পূর্বসূরিদের অটল মনোভাব অনুসরণ করে তবে আশা করা যায় যে তারা পরকালে তাদের সাথেই থাকবে।

সাঃ) এর জীবদ্দশায় মদিনায় জীবন

মাইগ্রেশনের পর ১ ম বছর

মদিনায় মসজিদে নববী নির্মাণ

একটি সুন্দর উত্তরাধিকার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল মহান আল্লাহর ঘর, মসজিদে নববী নির্মাণ। জমিটি দুই এতিম বালক সুহাইল ও সাহল (রাঃ)-এর ছিল, যারা বিনা মূল্যে জমিটি প্রদান করেছিলেন কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিনামূল্যে নিতে অস্বীকার করেন এবং তাদের কাছ থেকে কিনে নেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 165-166-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের

ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধু মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের পিছনে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায় যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান মারা যায় এবং দরকারী কিছু রেখে যায়, যেমন একটি জলের কূপ আকারে চলমান দাতব্য তারা এর জন্য সওয়াব পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 4223 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত নেক আমল করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভালো কিছু পাঠানোর চেষ্টা করা উচিত, তবে তাদের পিছনে একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের উপকার করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান তাদের সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রত্যেক মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য তাদের কাছে প্রচুর সময় আছে কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকারটি ভাল এবং উপকারী হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি তাদের তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের এমন কিছু প্রস্তুত করা উচিত যা তারা কেবল আখেরাতের জন্য কল্যাণই প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত তাদের উত্তরাধিকার কি?

নামাযের আহবান

সফলতার জন্য কল করুন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ নির্মাণের পর, যখন মসজিদে জামাত নামাজ শুরু হতে চলেছে তখন জনগণকে সতর্ক করা দরকার। কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, যেমন একটি শিং বা ঘণ্টা ব্যবহার করা, কিন্তু পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তিনি কিতাবের লোকদের অনুকরণ করতে চাননি। কেউ একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে ডাকা উচিত যখন জামাতের প্রার্থনা শুরু হতে চলেছে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিকল্পের পক্ষে ছিলেন। আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে একজন ব্যক্তি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে নামাযের আযানটি কী হওয়া উচিত। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুও একই ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিলাল বিন রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জামাতে নামাযের আযান দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য নবি (সাঃ)-এর ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 731-733-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সালাতের আযান দেওয়ার জন্য একজন ইথিওপীয় প্রাক্তন ক্রীতদাসকে বেছে নিয়েছিলেন, যাকে

প্রায়শই আরবের বৃহত্তর সমাজ তার জাতিগত এবং সামাজিক অবস্থানের কারণে অবজ্ঞার চোখে দেখত। . এটি ইসলামে সমতার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পরিশেষে, এই ঘটনাটি শিক্ষার স্বার্থে মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্বকেও নির্দেশ করে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"... আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 550 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের এই দাবি করা উচিত নয় যে তারা অন্য ধার্মিক কাজ করছে যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এটি করে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে না তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করছে যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা

মদিনায় হিজরত করার পর, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জানানো হয়েছিল যে মক্কার দুই অমুসলিম, আবু জাহল ইবনে হিশাম এবং আল হারিস ইবনে হিশাম তাদের মুসলিম সৎ ভাই আয়াশ ইবনেকে রাজি করার জন্য মদিনায় এসেছিলেন। আবি রাবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে মক্কায় ফিরে আসার জন্য। তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা তার ক্ষতি করতে চায় না এবং শুধুমাত্র সে তাদের মায়ের সাথে দেখা করতে মক্কায় ফিরে যেতে চায়, যিনি তাকে না দেখা পর্যন্ত নিজের যত্ন না নেওয়ার শপথ করেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুধাবন করেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে দুই অমুসলিম আয়েশের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করছে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁকে বললেন তাদের সঙ্গে না যেতে। তার মায়ের প্রতি ভালোবাসার কারণে, আয়েশ, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, মক্কায় যেতে ইচ্ছা করে এবং মন্তব্য করেন যে তিনি তার মাকে দেখার পর তার কিছু সম্পদ মক্কা থেকে মদিনায় ফিরিয়ে আনবেন। তাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার অর্ধেক সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু আয়েশ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তখনও মদিনায় থাকতে অস্বীকার করেন। অবশেষে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার নিজের দ্রুতগতির উট উপহার দিয়েছিলেন এবং মক্কার অমুসলিমদের বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ হলে অবিলম্বে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে সতর্ক করেছিলেন। মক্কায় ফেরার পথে আয়েশ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বাসঘাতকতা ও অপহরণ হন। তারা তাকে নির্যাতন করে যতক্ষণ না সে ইসলাম ত্যাগ করে তার পূর্ব ধর্মে ফিরে আসে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন, বিশ্বাস করতেন যে, মহান আল্লাহ কখনোই ধর্মত্যাগকারী ব্যক্তির তওবা কবুল করবেন না। পরবর্তীতে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর যারা ধর্মত্যাগ করেছিল

তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 53-55:

বল, "হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং [তাওবা করে] ফিরে আসো।] তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও এবং তোমার উপর আযাব আসার পূর্বে তুমি সাহায্য পাবে না এবং তোমার প্রতি অকস্মাৎ আযাব আসার পূর্বে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সর্বোত্তম অনুসরণ কর। যখন তুমি বুঝ না।"

উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তারপর এই আয়াতগুলো লিখেছিলেন এবং তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং অবশেষে তাদের মুসলিম ভাইদের সাথে যোগ দিতে মদিনায় হিজরত করতে সক্ষম হয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 61-64-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিটি পদক্ষেপে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মুসলিম ভাইদের প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে আয়েশকে সতর্ক করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, দুই অমুসলিমদের সাথে মক্কায় ফিরে না যাওয়ার জন্য এবং মদিনায় তাকে রাখার জন্য তার অর্ধেক সম্পদও দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি তাকে ভ্রমণের জন্য নিজের উটও দিয়েছিলেন। অবশেষে, তিনি তাদেরকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করতে উত্সাহিত করার জন্য পবিত্র

কুরআনের এই আয়াতগুলি তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। অন্যদের প্রতি এই আন্তরিকতা ইসলামের একটি মূল দিক।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত

করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

ভ্রাতৃত্ব

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর সহযাত্রী মুহাজিরগণ এবং সাহায্যকারী আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর পথে ভাই ভাই হওয়ার উপদেশ দেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর ইবনে খাত্তাব এবং অন্য তিনজন সাহাবীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন: উওয়ায়ম ইবনে সাঈদা, উতবান ইবনে মালিক এবং মুআয ইবনে আফরা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 66-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে একসময় তাদের দৃঢ় সংযোগ হারায়। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন । যেখানে,

বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সংবেদনশীল প্রশ্ন

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মতামত প্রকাশ করতে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করেননি যখন তিনি কোন বিষয়ে অনিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তা করার সময় সর্বদা সঠিক আচার-আচরণ পালন করতেন এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করতেন এবং যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশ করতেন, যার মূলে ছিল ইসলামী জ্ঞান। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 75-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 3257 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন কারণ এটি অতীতের জাতিগুলির ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছিল। বরং মুসলমানদের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যা আদেশ করা হয়েছে তা করা এবং যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা।

মুসলমানদের এই মানসিকতা অবলম্বন করা উচিত নয় কারণ যাদের অনেক বেশি প্রশ্ন করার অভ্যাস রয়েছে তারা প্রায়শই তাদের দায়িত্ব পালনে এবং উপকারী জ্ঞান অর্জনে ব্যর্থ হয় কারণ তারা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং গবেষণা করতে ব্যস্ত থাকে। এই মানসিকতা একজন ব্যক্তিকে এই ধরণের বিষয় নিয়ে তর্ক করতে এবং বিতর্ক করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মনোভাব আজ মুসলমানদের মধ্যে বেশ বিস্তৃত কারণ তারা প্রায়শই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ না করে এবং

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে অ-বাধ্য এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তর্ক করে , সঠিক অর্থ, পরিপূর্ণতা। তাদের সম্পূর্ণ শিষ্টাচার এবং শর্তাবলী সহ।

একজন মুসলমানের উচিত সেই বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করা এবং জিজ্ঞাসা করা যা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় তারা এই হাদীসে বর্ণিত লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং কেবল তাদের নিজের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে।

গভীর বোঝাপড়া

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য তিনি প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাকে ইসলাম সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দেওয়া হয়েছিল, যা কেবলমাত্র কয়েকজনের দ্বারা মেলে। তিনি এমন একটি স্তরে পৌঁছেছিলেন যে তাঁর মতামত এবং বক্তব্যগুলি প্রায়শই ঐশী ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ কারণেই আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বিশ্বাস করতেন যে একজন ফেরেশতা ছিলেন যিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহ্বা দিয়ে কথা বলতেন। . ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৪ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি একক হাদীসে, 402 নম্বরে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর তিনটি মতামত ঐশ্বরিক ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে। প্রথমটি ছিল মক্কায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্থানকে নামাজের স্থান হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা। মহান আল্লাহ অতঃপর নাজিল করেন অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 125:

"...এবং, [হে ঈমানদারগণ], ইব্রাহিমের দাঁড়ানো স্থান থেকে প্রার্থনার স্থান গ্রহণ কর..."

দ্বিতীয়টি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর উপদেশ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের, মুমিনদের মা, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিলেন, ভালো ও মন্দ উভয় পুরুষ হিসেবে নিজেদেরকে পুরুষদের থেকে ঢেকে রাখতে। পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করতেন এবং তাই অনিবার্যভাবে তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করতেন। মহান আল্লাহ অতঃপর 24 নুর, আয়াত 31 নাজিল করেন:

“এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংকুচিত করে এবং তাদের গোপনাঙ্গের হেফাজত করে এবং তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে তবে যা দেখায় [3] *এবং তাদের মাথার চাদর তাদের বুকের উপর আবৃত করে এবং তাদের প্রকাশ না করে। অলংকরণ [অর্থাৎ, সৌন্দর্য] তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের স্বামীর পিতা, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীর পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভাইয়ের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের মহিলাদের, তাদের ডান হাতে যা আছে [অর্থাৎ, ক্রীতদাস], অথবা সেই সমস্ত পুরুষ পরিচারক যাদের শারীরিক ইচ্ছা নেই, বা শিশু যারা এখনও মহিলাদের ব্যক্তিগত দিক সম্পর্কে সচেতন নয়। আর তারা যেন তাদের পায়ের মোহর না দেয় যাতে তারা তাদের সাজসজ্জার বিষয়টি গোপন করে। হে ঈমানদারগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"*

এবং অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 59:

“হে নবী, আপনার স্ত্রীদেরকে এবং আপনার কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের পোশাকের কিছু অংশ নিজেদের উপর নামিয়ে আনে...”

তৃতীয়বার যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন । উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্ভবত তিনি তাদের সবাইকে তালাক দেবেন এবং মহান আল্লাহ তাকে তাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দেবেন। অতঃপর আল্লাহ তাহরীমে ৬৬ অধ্যায় নাযিল করেন, আয়াত ৫:

"সম্ভবত তার পালনকর্তা, যদি তিনি তোমাদের [সকলকে] তালাক দেন, তবে তার স্থলাভিষিক্ত হবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী - [আল্লাহর কাছে] আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, ভক্তিপূর্ণ আনুগত্যকারী, অনুতপ্ত, উপাসনাকারী এবং ভ্রমণকারী - [যারা] পূর্বে বিবাহিত এবং কুমারী।"

ইসলাম সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জনের জন্য মুসলমানদের অবশ্যই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্যোগকে অনুকরণ করার জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি একটি ভৌত পথ নির্দেশ করে যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞানের সন্ধান করে। এটি জ্ঞানের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যার কাছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং কীভাবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। উপরন্তু, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই বিশ্বের একটি শহরে তার অবস্থান এবং এটির দিকে নিয়ে যাওয়া পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভ করা যায় না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনে যেমন তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ।

কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলমানের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করার উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন প্রদর্শন, তারা যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় তবে সে জাহান্নামে যাবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি

করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

শুধু শাস্তি

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য তিনি প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাকে ইসলাম সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দেওয়া হয়েছিল, যা কেবলমাত্র কয়েকজনের দ্বারা মেলে। তিনি এমন একটি স্তরে পৌঁছেছিলেন যে তাঁর মতামত এবং বক্তব্যগুলি প্রায়শই ঐশী ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ কারণেই আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বিশ্বাস করতেন যে একজন ফেরেশতা ছিলেন যিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহ্বা দিয়ে কথা বলতেন। . ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৪ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের বিজয় লাভের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যুদ্ধবন্দীদের সাথে কি করবেন সে বিষয়ে তাঁর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অনেক অপরাধ ও যুদ্ধের জন্য তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরামর্শ অপছন্দ করেন। তারপরে, আবু বক্কর সিদ্দিক, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাদের মৃত্যুদন্ড থেকে ক্ষমা করার পরামর্শ দেন এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা ক্রয় করার অনুমতি দেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উপদেশে সন্তুষ্ট হন এবং এর উপর আমল করেন। পরের দিন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কাঁদতে দেখেন। যখন তিনি তাদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন মহানবী

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেন যে, মহান আল্লাহ তাকে এমন শাস্তি দেখিয়েছেন যা তাদের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে বন্দীদের মুক্তিপণ নেওয়ার জন্য তাদের কষ্ট দিত। অতঃপর মহান আল্লাহ 8 আল আনফাল, আয়াত 67-68 নাজিল করেন:

"একজন নবীর জন্য [যুদ্ধের] বন্দী থাকা উচিত নয় যতক্ষণ না সে দেশে [আল্লাহর শত্রুদের উপর] হত্যাযজ্ঞ চালায়। তোমরা [অর্থাৎ, কিছু মুসলমান] দুনিয়ার মাল কামনা কর, কিন্তু আল্লাহ [আপনার জন্য] আখেরাত চান। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী আদেশ না থাকত, তবে আপনি যা নিয়েছিলেন তার জন্য আপনাকে একটি বড় শাস্তি স্পর্শ করা হত।"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 305 এবং সহীহ মুসলিমের 4588 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বন্দীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা তাদের অপরাধের জন্য ন্যায়সঙ্গত শাস্তি এবং মক্কার অমুসলিমদের সহিংস আচরণের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করত। এই প্রতিবন্ধক, দীর্ঘমেয়াদে, জীবন বাঁচানোর ফলে আরও যুদ্ধ প্রতিরোধ করতে পারে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটা শেখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির যতই শারীরিক বা সামাজিক শক্তি থাকুক না কেন একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন তারা তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি তাদের জীবনের সময় ঘটে যেখানে একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ তাদের সমস্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন জেল এবং অবশেষে তারা পরকালেও তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবে । এটা শুধু নেতা নয় সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

তাই একজন মুসলমানকে কখনই অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়, যেমন তাদের আত্মীয়। ইতিহাসের অত্যাচারী নেতাদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা এখনও তাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল, একটি দিন অবশ্যই এসেছিল যখন তাদের শক্তি তাদের উপকারে আসেনি এবং তারা তাদের খারাপ কাজের পরিণতির মুখোমুখি হয়েছিল। সামাজিক প্রভাব এবং শক্তি হল চঞ্চল জিনিস কারণ এগুলি দ্রুত ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে চলে যায়, দীর্ঘকাল কারও সাথে থাকে না। অতএব, এমন শক্তির অধিকারী একজন মুসলমানের উচিত নিজের এবং অন্যদের উপকারের মাধ্যমে এটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। কিন্তু যদি তারা তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে তাহলে শেষ পর্যন্ত তারা করবে একটি শাস্তি সম্মুখীন যা থেকে কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

উপরন্তু, এটা গুরুত্বপূর্ণ কারও কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করা কারণ এটি তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। প্রতিটি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজ তাদের শিকারকে দিতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ গ্রহণ করতে হবে। এতে অনেক অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে, একজন মুসলমানের কখনই তাদের কাজের জন্য নিজেকে জবাবদিহি করতে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যারা করবে তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা এবং অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যারা নিজেরা বিচার করবে না তারা আল্লাহর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে এবং অন্যদের ক্ষতি করতে থাকবে। না জেনে যে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কিন্তু যখন তারা এই সত্যটি উপলব্ধি করবে তখন তাদের শাস্তি থেকে বাঁচতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

নিখুঁত বিশ্বাস

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য তিনি প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাকে ইসলাম সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দেওয়া হয়েছিল, যা কেবলমাত্র কয়েকজনের দ্বারা মেলে। তিনি এমন একটি স্তরে পৌঁছেছিলেন যে তাঁর মতামত এবং বক্তব্যগুলি প্রায়শই ঐশী ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ কারণেই আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বিশ্বাস করতেন যে একজন ফেরেশতা ছিলেন যিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহ্বা দিয়ে কথা বলতেন। . ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৪ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা যান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময় নিয়মিত তাঁর কাছে যেতেন এই আশায় যে তিনি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবেন এবং একজন সত্যিকারের মুসলমান হবেন। তবে তিনি অনুতপ্ত হননি এবং মুনাফিক মারা যান। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শার্টের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তিনি তা দিয়ে তাঁর পিতার দেহ আবৃত করতে পারেন। এ ছাড়া তিনি তাকে তার বাবার জানাজায় ইমামতি করার অনুরোধ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযের ইমামতি করার জন্য তাঁর জামা ও গোলাপ দিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গাউনটি ধরেছিলেন এবং তাকে সেই ব্যক্তির জানাযার নামাযের ইমামতি না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যে ইসলাম এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ধ্বংস করার চেষ্টা করে কিছুতেই

থামেনি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনকি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি মুনাফিকদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা চাইলেও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। অধ্যায় 9 তওবাহ, আয়াত 80:

"তাদের জন্য ক্ষমা চাও, [হে মুহাম্মাদ], অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো না। আপনি যদি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে আল্লাহ কখনই তাদের ক্ষমা করবেন না। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে তিনি সত্তর বারের বেশি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এরপর তিনি তার জানাযার ইমামতি করেন। মহান আল্লাহ অতঃপর তাকে ভবিষ্যতে এটা করতে নিষেধ করলেন। অধ্যায় 9 এ তওবাহ, আয়াত 84:

"এবং তাদের মধ্যে যে কেউ মারা গেছে তার জন্য [জান্নার নামায] নামায পড়বেন না - বা তার কবরে দাঁড়াবেন না। প্রকৃতপক্ষে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছিল এবং অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 46-47 এবং জামি আত তিরমিযী, 3097 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এমন আচরণ করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর পূর্ণ ঈমানের কারণে।

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলমানের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা উত্তম তা কামনা করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায়ে সমর্থন করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালবাসা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার একটি দিক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল যে মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে ঘৃণা করা উচিত কারণ মানুষ মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। বরং একজন মুসলমানের উচিত সেই গুনাহকে অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় তা পরিহার করা এবং অন্যদেরকেও এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া, কারণ এই সদয় আচরণ তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কিছু অপছন্দ না করা, যেমন একটি কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজনের অপছন্দের প্রমাণ এই যে, তারা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে তখন তা কখনই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। অর্থ, কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনোই কোনো গুনাহের কারণ হবে না কারণ এটি প্রমাণ করে যে কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজেদের স্বার্থে।

অন্যদের পরিদর্শন

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য তিনি প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাকে ইসলাম সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দেওয়া হয়েছিল, যা কেবলমাত্র কয়েকজনের দ্বারা মেলে। তিনি এমন একটি স্তরে পৌঁছেছিলেন যে তাঁর মতামত এবং বক্তব্যগুলি প্রায়শই ঐশী ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ কারণেই আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বিশ্বাস করতেন যে একজন ফেরেশতা ছিলেন যিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহ্বা দিয়ে কথা বলতেন। . ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৪ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একবার মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একজন ক্রীতদাস পাঠালেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ঘুমাচ্ছিলেন এবং তাঁর শরীরের কিছু অংশ অনাবৃত ছিল তখন ক্রীতদাসটি অনুমতি ছাড়াই তাঁর ঘরে প্রবেশ করে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরস্পরের সাথে দেখা করার বিষয়ে মহান আল্লাহর কাছ থেকে আদেশ ও নিষেধ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ 24 নুর, আয়াত 58 নাজিল করলেন:

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যাদের অধিকার আছে এবং যারা বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত পৌছেনি তারা তিনবার [প্রবেশের পূর্বে] তোমাদের কাছে অনুমতি চাইবে: ফজরের সালাতের আগে এবং যখন তোমরা তোমাদের পোশাক সরিয়ে রাখবে।

বিশ্রামের জন্য] দুপুরে এবং রাতের নামাজের পরে। [এগুলি] আপনার জন্য গোপনীয়তার তিনবার..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের জন্য তাদের সওয়াব পাওয়ার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে দেখা করার শিষ্টাচার এবং শর্তগুলি পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। তারা যাতে হোস্ট এবং তাদের আত্মীয়দের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে বেশি দিন থাকা উচিত নয়। এই দিন এবং যুগে তারা উপযুক্ত সময়ে তাদের সাথে দেখা করার জন্য হোস্ট এবং তাদের পরিবারের সাথে আগেই যোগাযোগ করা সহজ। তাদের উচিত তাদের কাজ এবং কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা পরচর্চা, গীবত করা এবং অন্যদের নিন্দা করার মতো সব ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকে। তাদের উচিত দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা করা। যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তখনই তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত সওয়াব লাভ করবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয় তবে তারা হয় কোন পুরষ্কার পাবে না বা তারা কীভাবে আচরণ করেছে তার উপর নির্ভর করে তাদের পাপের সাথে অবশিষ্ট থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান এই ধার্মিক কাজটি সম্পাদন করতে উপভোগ করে কিন্তু সঠিকভাবে এর শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

অল ইভিলের চাবিকাঠি

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য তিনি প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাকে ইসলাম সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি দেওয়া হয়েছিল, যা কেবলমাত্র কয়েকজনের দ্বারা মেলে। তিনি এমন একটি স্তরে পৌঁছেছিলেন যে তাঁর মতামত এবং বক্তব্যগুলি প্রায়শই ঐশী ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ কারণেই আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বিশ্বাস করতেন যে একজন ফেরেশতা ছিলেন যিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জিহ্বা দিয়ে কথা বলতেন। . ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৬৪ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আল্লাহর কাছে মিনতি করেছিলেন, যেন তিনি মদ সম্পর্কে তাঁর রায় সকলের কাছে স্পষ্ট করে দেন। মহান আল্লাহ অতঃপর নাজিল করেন অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 219:

“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, "তাদের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং [তবুও, কিছু] মানুষের জন্য উপকারী। কিন্তু তাদের পাপ তাদের উপকারের চেয়ে বড়।"..."

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তারপরে মহান আল্লাহ অবশেষে অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 43 নাজিল করলেন:

"হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তুমি বুঝতে পারো তুমি কি বলছ..."

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবারও তাঁর প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তারপরে মহান আল্লাহ অবশেষে অধ্যায় 5 আল মায়িদা, 90-91 আয়াত নাজিল করলেন:

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই নেশা, জুয়া, পাথরের উপর কুরবানী করা [আল্লাহ ব্যতীত] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্র, সুতরাং তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো শুধু চায় নেশা ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে। তাহলে কি তুমি বিরত হবে না?"

এ কথা শোনার পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, তারা বিরত থাকবে। জামে আত তিরমিযী, 3049 নম্বরে একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রহিতকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কিছু সময়ের পরে একটি আদেশ বা নিষেধ অন্য আদেশ বা নিষেধ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

মহান আল্লাহ একজন অমুসলিম থেকে একজন শক্তিশালী মুসলিমে রূপান্তর একজন ব্যক্তির জন্য সহজ করার জন্য এই কৌশলটি ব্যবহার করেছেন। যদি সমস্ত চূড়ান্ত আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি একবারে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয় তবে এই প্রক্রিয়াটি কঠিন হয়ে যায়। এই কারণেই ইসলামে অ্যালকোহলকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা হয়নি, কারণ এটি এক মুহুর্তে ছেড়ে দেওয়া বেশিরভাগ লোকের পক্ষে কঠিন ছিল যারা এটি পান করেন। পরিবর্তে এটি পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ ছিল, পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতের মাধ্যমে।

এই প্রক্রিয়াটি এমন চিকিত্সকদের দ্বারাও গৃহীত হয় যারা সরাসরি ওষুধের সম্পূর্ণ ডোজ নির্ধারণ করে না এবং সময়ের সাথে সাথে ডোজ তৈরি করে যাতে রোগীরা তাদের সাথে ইতিবাচক উপায়ে মানিয়ে নেয়। এই কৌশলটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মহান আশীর্বাদ ও রহমত ছিল, কারণ অগণিত লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা এটিকে প্রত্যাখ্যান করত যদি নাযিলের শুরুতে সমস্ত চূড়ান্ত আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা এক সাথে নাজিল হয়ে যেত। এই আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যদিও মহান আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে এটি করার ক্ষমতা রাখেন তবুও তিনি মানুষের জন্য সহজ ও করুণার পথ বেছে নিয়েছেন।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা ও আদেশ মানুষের জীবনকে কঠিন করে তোলার জন্য বিদ্যমান নেই। এগুলি কেবলমাত্র এই পৃথিবীতে এবং পরের উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের উপকার করার জন্য বিদ্যমান, এমনকি যদি এই সুবিধাগুলি

মানুষের কাছে দৃশ্যমান না হয়। উদাহরণস্বরূপ, অ্যালকোহলের নেতিবাচক প্রভাব, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর নেতিবাচক প্রভাবের মতো সর্বদা স্পষ্ট ছিল না। এটি এবং অন্যান্য ক্ষতি থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য এটি শুধুমাত্র ইসলামে বেআইনি হয়ে গেছে। উপরন্তু, কোন কিছুর প্রজ্ঞা না বুঝে গ্রহণ করা ঈমানের একটি দিক। হুকুম-নিষেধের সমস্ত হিকমত যদি প্রকাশ পায় তাহলে তা মুসলমানদেরকে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে দেবে না। মহান আল্লাহ এই আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উপকৃত হন না শুধুমাত্র মানুষ।

রহিতকরণের এই প্রক্রিয়াটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালার সুরক্ষা ও সাহায্যের একটি দিক, যাতে উভয় জগতে সহজে সফলতা লাভ করা যায়।

সুনানে ইবনে মাজা 3371 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, একজন মুসলমানকে কখনই অ্যালকোহল সেবন করা উচিত নয় কারণ এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশত, সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে এই মহাপাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি কারণ এটি অন্যান্য পাপের জন্ম দেয়। এটি বেশ সুস্পষ্ট কারণ একজন মাতাল তাদের জিহ্বা এবং শারীরিক কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মদ্যপানের কারণে কতটা অপরাধ সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য একজনকে কেবল খবরটি দেখতে হবে। এমনকি যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের শরীরের ক্ষতি হয়, যা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে। অ্যালকোহলের সাথে জড়িত শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলি অসংখ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং করদাতাদের উপর একটি ভারী বোঝা সৃষ্টি করে। এটি সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি

কারণ এটি একজন ব্যক্তির তিনটি দিককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে যেমন তাদের শরীর, মন এবং আত্মা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 90:

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতপক্ষে, নেশা, জুয়া, [আল্লাহ ব্যতীত] পাথরের বদৌলতে [কোরবানি করা] এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীর শয়তানের কাজ থেকে অপবিত্রতা মাত্র, সুতরাং তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

এই আয়াতে শিরকবাদের সাথে যুক্ত জিনিসগুলির পাশে মদ পান করার বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে।

এটি এমন একটি গুরুতর গুনাহ যে, সুনানে ইবনে মাজা, 3376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সুনানে ইবনে মাজা, ৬৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা প্রচার করা জান্নাত লাভের চাবিকাঠি। তবুও, ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 1017 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মুসলমানদের পরামর্শ দেয় যে কেউ নিয়মিত মদ্যপান করে এমন কাউকে সালাম না করার জন্য। অ্যালকোহল

অ্যালকোহল একটি অনন্য বড় পাপ কারণ সুনানে ইবনে মাজা, 3380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটিকে দশটি ভিন্ন উপায়ে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহল নিজেই, যিনি এটি তৈরি করেন, যার জন্য এটি তৈরি করা হয়, যার জন্য যে এটি বিক্রি করে, যে এটি ক্রয় করে, যে এটি বহন করে, যার কাছে এটি বহন করা হয়, যে এটি বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে, যে এটি পান করে এবং যে এটি ঢেলে দেয়। যে ব্যক্তি এইভাবে অভিশপ্ত কিছু নিয়ে কাজ করে সে প্রকৃত সফলতা পাবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

সত্য নির্দেশনা মেনে চলা

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিজের মতামত প্রদান এড়িয়ে যান এবং পরিবর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দেওয়া নির্দেশনা মেনে চলেন। যেমন একবার তাকে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন কিন্তু যোগ করেছেন যে তিনি মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ব্যাখ্যা শুনেছেন, অন্যথায় তিনি তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতেন না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 84-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ

হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার এই দুটি উত্‌স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্‌স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

জ্ঞানের জন্য প্রচেষ্টা

মদিনায় বসবাসের সময়, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁর অন্যান্য দায়িত্বগুলি তাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনে বাধা দেবে না। তিনি এবং তার প্রতিবেশীর একটি ব্যবস্থা ছিল যার মাধ্যমে তাদের একজন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যাবেন, একদিন জ্ঞান অর্জন করবেন এবং অন্যকে শিক্ষা দেবেন। এবং পরের দিন অন্য একজন জ্ঞান অন্বেষণ করতে যেতেন এবং তারপর পূর্ববর্তীকে তা শেখাতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 87-88-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর জ্ঞানের গভীর স্তর আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে একটি স্বপ্নে যা দেখেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মনে রাখতে হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্নগুলো ঐশী ওহীর একটি রূপ। স্বপ্নে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দুধ আনা হলো। তিনি তা পান করলেন যতক্ষণ না তিনি তার আঙ্গুলের ডগা থেকে এর আর্দ্রতা দেখতে পান। অতঃপর তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উচ্ছিষ্টগুলো দিলেন। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেছেন যে দুধ জ্ঞানকে নির্দেশ করে। এটি সহীহ বুখারী, 3681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায়

প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে তবে স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। কেবলমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ে আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা বাস্তবে আমল না করলেও 1000 সাইকেল নামাজ পড়ার সওয়াব পাবে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠরা আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তাদের আচরণ এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম কারণ তারা মহান আল্লাহর উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা তারা বোঝে না। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

একজন প্রকৃত মুমিন

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাছে নিজের ব্যতীত অন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রিয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি প্রকৃত মুমিন হতে পারবেন না যতক্ষণ না তিনি তার নিজের থেকেও বেশি প্রিয় হবেন। অতঃপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জবাবে ঘোষণা করলেন যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে নিজের চেয়েও প্রিয় হয়ে উঠেছেন। অবশেষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিলেন যে তিনি এখন একজন প্রকৃত মুমিন। এটি সহীহ বুখারী, 6632 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সততা লক্ষ্য করার প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত বিশ্বাসের সাথে আন্তরিকতা জড়িত। সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"... আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং

তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতা

একবার, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছিলেন তা লক্ষ্য করলেন এবং ফলস্বরূপ তিনি কাঁদলেন। তার কান্নাকাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, দুনিয়ার রাজারা যখন দুনিয়ার বিলাসিতা উপভোগ করছিলেন, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, দুনিয়ার রাজারা পরকালের সুখ ভোগ করলেও তিনি কি সন্তুষ্ট ছিলেন? সহীহ মুসলিমের ৩৬৯১ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সারা জীবন ধরে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সরল জীবনধারা অনুকরণ করেছেন, এমনকি তাঁর খেলাফতের সময়ও, যখন বিশ্ব তাঁর পায়ের কাছে স্থাপন করা হয়েছিল।

এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুগত জগত যা থেকে একজনকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত তা আসলে একজনের ইচ্ছাকে বোঝায়। এটি পাহাড়ের মতো ভৌত জগতের উল্লেখ করে না। এটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, 14 নং আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে:

"মানুষের জন্য শোভিত হল সেই ভালবাসা যা তারা কামনা করে - নারী ও পুত্রের, সোনা ও রৌপ্যের স্তূপ, সূক্ষ্ম দানাদার ঘোড়া এবং গবাদি পশু এবং চাষের জমি। এটাই পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন [অর্থাৎ জান্নাত]।

এই জিনিসগুলি মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা মানুষ পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত হয়। যখন কেউ তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকে তখন তারা বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণেই একজন মুসলিম যার কাছে পার্থিব জিনিস নেই, তাকে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কারণে দুনিয়াবী মানুষ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অথচ, একজন মুসলমান যে জাগতিক জিনিসের অধিকারী, কিছু ধার্মিক পূর্বসূরিদের মতো, তাকে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ তারা তাদের মন, হৃদয় এবং কাজগুলি তাদের সাথে কামনা করে না এবং দখল করে না। পরিবর্তে তারা চিরন্তন পরকালে মিথ্যা কামনা করে।

বিরত থাকার প্রথম স্তর হল অবৈধ ও অসার কামনা-বাসনা থেকে দূরে সরে যাওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এই ব্যক্তি আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করার সময় তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। তারা এমন জিনিস এবং লোকদের থেকে দূরে সরে যায় যারা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি পূরণ করতে বাধা দেয়।

পরিহারের পরবর্তী পর্যায় হল যখন কেউ তার প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব পালনের জন্য জড়জগত থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গ্রহণ করে। তারা এমন

কিছুতে তাদের সময় ব্যয় করে না যা তাদের পরবর্তী জগতে লাভবান হবে না। সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া এক হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একজন মুসলমানকে এই জড় জগতে একজন অপরিচিত বা ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মানুষই তাদের গন্তব্য অর্থাৎ পরকাল নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করবে। তাদের মৃত্যু এবং পরকালের গমন কতটা নিকটবর্তী তা বোঝার মাধ্যমে একজন মুসলমান এটি অর্জন করতে পারে। মৃত্যু যে কোন সময় একজন ব্যক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তা নয়, একজন দীর্ঘ জীবন যাপন করলেও মনে হয় যেন তা এক মুহূর্তে চলে যায়। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে একজন ব্যক্তি চিরন্তন পরকালের জন্য মুহূর্তটি উৎসর্গ করে। এই জড়জগতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করা তাদেরকে সৎ কাজ করতে উৎসাহিত করবে, তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। যে দীর্ঘায়ু কামনা করে সে বিপরীত আচরণে উদ্‌বুদ্ধ হবে।

বস্তুজগতে যিনি সত্যিকার অর্থে বর্জন করেন, তিনি একে দোষ দেন না, প্রশংসা করেন না। তারা যখন এটি লাভ করে তখন তারা আনন্দ করে না এবং যখন এটি তাদের অতিক্রম করে তখন তারা দুঃখিত হয় না। এই ধার্মিক মুসলমানের মন লোভের সাথে ক্ষুদ্র বস্তুজগতকে লক্ষ্য করার জন্য চিরন্তন পরকালের দিকে নিবদ্ধ।

বিরত থাকা বিভিন্ন স্তর নিয়ে গঠিত। কিছু মুসলমান তাদের হৃদয়কে সমস্ত নিরর্থক ও অকেজো পেশা থেকে মুক্ত করার জন্য বিরত থাকে যাতে তারা মহান আল্লাহকে আনুগত্যে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করতে পারে এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 257 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় , যে

ব্যক্তি এমন আচরণ করবে সে দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পার্থিব বিষয়ের যত্ন নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যে শুধু পার্থিব বিষয় নিয়েই চিন্তিত সে তাদের যন্ত্রের কাছে চলে যাবে এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের আধিক্য, যেমন অতিরিক্ত সম্পদের পেছনে ছুটবে, সে দেখতে পাবে যে তাদের উপর এর ন্যূনতম প্রভাব এই যে, এটি তাদের মহান আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্য থেকে বিচ্যুত করে। এটি এখনও সত্য এমনকি যদি একজন ব্যক্তি বস্তুজগতের অতিরিক্ত দিকগুলির সাধনায় কোনও পাপ না করে।

কেউ কেউ বিচার দিবসে তাদের জবাবদিহিতা হালকা করার জন্য দুনিয়া থেকে বিরত থাকে। একজনের কাছে যত বেশি সম্পত্তি থাকবে তত বেশি তাদের জবাবদিহি করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা যাদের ক্রিয়াকলাপ যাচাই-বাছাই করবেন, বিচারের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। সহীহ বুখারি, ৬৫৩৬ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজনের জবাবদিহিতা যত কম হবে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা তত কম। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহিহ বুখারি, ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যারা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অধিকারী তারা কিয়ামতের দিনে খুব কম কল্যাণের অধিকারী হবে যারা উৎসর্গ করে। তাদের মাল ও সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে, কিন্তু এগুলো সংখ্যায় অল্প। এই দীর্ঘ জবাবদিহিতার কারণেই বিচারের দিন ধনী বা দরিদ্র প্রত্যেক ব্যক্তিই কামনা করবে যে, পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে তাদের প্রতিদিনের রিজিক দেওয়া হয়েছে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4140 নম্বরে পাওয়া হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু মুসলমান জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার জন্য এই জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে যা এই জড় জগতের আনন্দকে হারাতে হবে।

কেউ কেউ জাহান্নামের ভয়ে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করে। তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে এই জড় জগতের আধিক্যে কেউ যত বেশি লিপ্ত হয়, ততই তারা হারামের কাছাকাছি থাকে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজা, 4215 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিম ধার্মিক হবে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু থেকে বিরত থাকে যা পাপ নয় এই ভয়ে যে এটি পাপ হতে পারে।

সর্বোত্তম স্তরের বিরত থাকা হল মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে যা চান তা বোঝা এবং তার উপর কাজ করা যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যথা, মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে জড় জগতের আধিক্য পরিহার করা, জেনে রাখা যে তাদের রব বস্তুজগতকে পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ির নিন্দা করেছেন এবং এর মূল্যকে তুচ্ছ করেছেন। এই ধার্মিক বান্দারা লজ্জিত হয়েছিল যে তাদের রব তাদের এমন কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখবেন যা তিনি অপছন্দ করেন। এরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা যেহেতু তারা শুধুমাত্র তাদের পালনকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এমনকি যখন তাদের এই দুনিয়ার বৈধ বিলাসিতা ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যদিও তাকে পৃথিবীর ভান্ডার দেওয়া হয়েছিল। সহীহ বুখারী, ৬৫৯০ নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এটিই চান। মহান আল্লাহ যেমন জড়জগৎকে অপছন্দ করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিভাবে একজন প্রকৃত

বান্দা তাদের পালনকর্তা যা অপছন্দ করেন তাকে ভালবাসতে পারে এবং লিপ্ত হতে পারে?

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দারিদ্র্যকে বেছে নিয়ে দরিদ্রদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং ধনীদেরকে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কীভাবে বাঁচতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। তিনি সহজে বিকল্পটি বেছে নিতে পারতেন এবং কার্যত ধনীদের দেখিয়ে দিতে পারতেন কিভাবে তাকে দেওয়া পৃথিবীর ভান্ডার নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং তিনি তার কথা ও কাজের মাধ্যমে গরিবদেরকে সঠিকভাবে বাঁচতে শেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট কারণে দারিদ্র্যকে বেছে নিয়েছিলেন যা তার প্রভু মহান আল্লাহর দাসত্বের বাইরে ছিল। এই বিরত থাকা সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের প্রথম সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আবু বক্কর সিদ্দিক, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার যখন তাকে মধুর সাথে মিষ্টি জল দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি কেঁদেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি একবার এক অদৃশ্য বস্তুকে দূরে ঠেলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখেছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে জড় জগত তার কাছে এসেছে এবং তিনি তাকে একা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জড় জগত উত্তর দিল যে সে জড় জগত থেকে পালিয়ে গেছে কিন্তু তার পরে যারা থাকবে না। এ কারণে আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, মধু মিশ্রিত পানি দেখে কেঁদেছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে জড়জগত তাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছে। এই ঘটনাটি ইমাম আশফাহানীর, হিলিয়াত আল আউলিয়া, 47 নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রকৃতপক্ষে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, আনন্দ লাভের জন্য কখনো ভোজন বা পোশাক পরেননি বরং পরকালের জন্য প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করার সময় বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করতেন। তারা অপছন্দ করত যখন জড়জগৎ তাদের পায়ে দাঁড় করানো হয় এই

ভয়ে যে তাদের প্রতিদান আখেরাতের পরিবর্তে এই দুনিয়াতেই তাদের দেওয়া হয়েছে।

যে কেউ সত্যিকারের পরিহারকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। মুসলমানদের এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে নিজেদেরকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং দাবি করা উচিত যে তাদের হৃদয় মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। যদি একজন ব্যক্তির হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তবে তা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং তাদের কর্মে প্রকাশ পায় যা সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যার অন্তর মহান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে, সে যা গ্রহণ করে সৎ পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাদের প্রয়োজন জড়জগত থেকে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটাই প্রকৃত বিরত থাকা।

অন্যদের জন্য যত্ন

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ একবার উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছিলেন, তিনি রাত্রে গোপনে তার বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। তারপর তিনি তাকে অনুসরণ করলেন এবং দেখলেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি বাড়িতে প্রবেশ করেছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তা ছেড়ে চলে গেছেন। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু পরের দিন বাড়িতে গিয়ে দেখেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোপনে একজন দরিদ্র ও বৃদ্ধা অন্ধ মহিলাকে তার দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করছেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৭১ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি দরিদ্রদের সাহায্য করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

এটি শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য নয় অন্যদের সাহায্য করার সব ধরনের অন্তর্ভুক্ত। অন্যের যেকোনো ধরনের বৈধ প্রয়োজন নিজের শক্তি অনুযায়ী পূরণ করা উচিত এবং যদি কোনো মুসলমান দেখতে পায় যে তারা এই সাহায্য প্রদান করতে পারে না, তাহলে তাদের উচিত একজন অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে নির্দেশ করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্যকারীর মতো একই পুরস্কার পাবে। জামি আত তিরমিযী, 2671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে অবশ্যই অন্যদেরকে এমনভাবে সাহায্য করতে হবে যাতে তাদের উপকার হয় শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান কামনা না করে কারণ এটি

শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিলের দিকে পরিচালিত করে। . অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সহজভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমান যদি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের প্রয়োজনের সময় অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা অন্যদের সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা তাদের প্রয়োজনের সময় আটকা পড়ে যেতে পারে।

মুসলমানরা যদি মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়, যাতে তারা আশীর্বাদ বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাদের অবশ্যই ইসলামের নির্দেশ অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

এর একটি দিক হল ভালো উপদেশের মতো যা কিছু আছে তা দিয়ে অভাবীদের সাহায্য করা।

একজনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা উচিত যা তাদের গর্বিত হতে বাধা দেবে। যথা, তারা অভাবীকে যে সাহায্য দেয় তা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাই মহান আল্লাহর মালিকানাধীন, এবং তাই তাদের অবশ্যই প্রকৃত মালিকের ইচ্ছানুযায়ী গরীবদের সাহায্য করার মাধ্যমে এটি ব্যবহার করতে হবে। বাস্তবে, দরিদ্ররা তাদের সাহায্যকারীকে একটি উপকার করছে কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। প্রয়োজনে কেউ না থাকলে মানুষ অনেক পুরস্কার লাভের এই পদ্ধতিটি হারিয়ে ফেলত।

সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া

একবার, জুমার খুতবার সময়, কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মদীনায় আগত একটি বাণিজ্য কাফেলার দিকে ঝুঁকে পড়ার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচার করার সময় ছেড়ে যান। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন। তারপর অধ্যায় 62 আল জুমুআ, আয়াত 11, অবতীর্ণ হয়:

"কিন্তু [একটি অনুষ্ঠানে] যখন তারা কোনো লেনদেন বা বিচ্যুতি দেখতে পেল তখন তারা সেখানে ছুটে গেল এবং আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল। বল, "আল্লাহর কাছে যা আছে তা বিমুখতা ও লেনদেনের চেয়ে উত্তম এবং আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।"

এটি সহীহ মুসলিমের 2000 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও এটি একটি পাপ কিছু কম ছিল না, এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঠিক আচরণের পরিপন্থী। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 62:

“মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যখন তারা তাঁর সাথে কোন সাধারণ স্বার্থের জন্য [সাক্ষাত] করে, তখন তার অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত প্রস্থান করে না। প্রকৃতপক্ষে, যারা আপনার [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর অনুমতি চায়, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। সুতরাং যখন তারা তাদের কোন বিষয়ে আপনার কাছে অনুমতি চায়, তখন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকা দরকারী জ্ঞান বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। এটি বাণিজ্য এবং বিমুখতার চেয়ে ভাল। এর অর্থ এই নয় যে একজনকে তাদের হালাল জীবিকা পরিত্যাগ করা উচিত, বরং তাদের উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার দিকে ঝুঁকে পড়ার সময় উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। এই পদ্ধতিতে আচরণ করলে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য আসে।

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে এবং তারা পাবে। সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত বিধান।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে বৈধ উপায়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদান করাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, যে ব্যক্তি যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে যদিও তারা জিনিস থেকে স্বাধীন হয়। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্‌ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। এর কারণ হল বস্তুজগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আবৃত করবে, অর্থাত্ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেয়, নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে, পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। কখনই সন্তুষ্ট হন না যা সংজ্ঞা দ্বারা তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে

হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা শুধুমাত্র উভয় জগতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

উদাহরণের সাহায্যে পরিচালনা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি জানেন না যে তিনি কতদিন সাহাবীদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে তারা তার পরবর্তী দুজনকে অনুসরণ করবে এবং তারপর আবু বকর ও উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইশারা করল। সুনানে ইবনে মাজাহ-এর ৯৭ নম্বর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তারা উভয়ই নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত ছিল কারণ তারা উভয়েই উদাহরণের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের

চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

দৃঢ় বিশ্বাস

উল্লেখ্য, মহানবী (সা.)-এর স্বপ্ন এক প্রকার ঐশী ওহী। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে তিনি একদল লোককে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু পোশাক পরা ছিল যা তাদের বুকে পৌঁছেছিল এবং অন্যরা তার চেয়ে নীচে। অতঃপর তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করলেন, যিনি এত লম্বা পোশাক পরেছিলেন যে তা তাঁর পিছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইঙ্গিত করেছেন যে পোশাকগুলি একজনের বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি সহীহ মুসলিমের ৬১৮৯ নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে।

এই স্বপ্নটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের নিশ্চিততার ইঙ্গিত দেয়।

সকল মুসলমানের ইসলামে বিশ্বাস আছে কিন্তু তাদের বিশ্বাসের শক্তি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে কারণ তাদের পরিবার তাদের বলেছিল যে তারা প্রমাণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্বাস করে তার মতো নয়। যে ব্যক্তি কোন কিছুর কথা শুনেছে সে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না যেভাবে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, দরকারী জ্ঞান অর্জন করা সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এর একটি কারণ হল একজন মুসলমানের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার এটাই সর্বোত্তম উপায়। এটি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততা যত বেশি শক্তিশালী তারা সঠিক পথে অবিচল থাকার সম্ভাবনা তত বেশি, বিশেষত যখন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। উপরন্তু, সুনানে ইবনে মাজা, 3849 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি সর্বোত্তম জিনিস হিসাবে বিশ্বাসের নিশ্চিত হওয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই জ্ঞানটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা উচিত। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধু একটি সত্য ঘোষণা করেননি বরং উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণও দিয়েছেন। অতীতের জাতির মধ্যে যে উদাহরণগুলি পাওয়া যায় তা নয়, উদাহরণগুলি যা নিজের জীবনে স্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো একজন ব্যক্তি কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যদিও তা পেয়ে গেলে তাকে কষ্ট দেয়। একইভাবে, তারা একটি জিনিস ঘৃণা করতে পারে যখন তাদের জন্য অনেক ভাল লুকিয়ে আছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

ইতিহাসে এই সত্যের অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন হুদাইবার চুক্তি। কিছু মুসলমান বিশ্বাস করেছিল যে এই চুক্তিটি, যা মক্কার অমুসলিমদের সাথে করা হয়েছিল, সম্পূর্ণরূপে পরবর্তী গোষ্ঠীর পক্ষে হবে। তবুও, ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে এটি ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষপাতী ছিল। এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 2731 এবং 2732 নম্বরে পাওয়া হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি তাদের নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করে তবে তারা অনেক উদাহরণ পাবে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল যখন এটি তাদের জন্য খারাপ ছিল এবং এর বিপরীতে। এই উদাহরণগুলি এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে এবং একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা (বিচার দিবস) দেখবে যেদিন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে কিভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যখন তারা চলে গেল তখন এমনভাবে চলে গেল যেন তারা ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীতেই ছিল। তাদের কয়েকটি চিহ্ন বাদে সবগুলি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে যেন তারা পৃথিবীতে প্রথম স্থানে ছিল না। একইভাবে, যখন কেউ তাদের নিজের জীবনের প্রতি চিন্তাভাবনা করে তখন তারা বুঝতে পারে

যে তারা যতই বয়সী হোক না কেন এবং নির্দিষ্ট কিছু দিন যতই ধীরগতির মনে হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন এখন পর্যন্ত ঝাঁকুনিতে কেটে গেছে। এই আয়াতের সত্যতা বোঝা একজনের বিশ্বাসের নিশ্চিততাকে শক্তিশালী করে এবং এটি তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে অনুপ্রাণিত করে।

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস এ ধরনের উদাহরণে পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে এই খোদায়ী শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তারা বিশ্বাসের দৃঢ়তা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করবে সে তাদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হবে না এবং জান্নাতের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া পথে অবিচল থাকবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

জান্নাতের চাবি

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, যে কেউ সাক্ষ্য দেবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে, তাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, কারোরই সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার নেই। মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করা হয়। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই কথা শুনেছিলেন, তখন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, এটি প্রচার না করার জন্য, কারণ লোকেরা অলস হয়ে যেতে পারে এবং কঠোর পরিশ্রম করার পরিবর্তে তাদের ঈমানের মৌখিক ঘোষণার উপর নির্ভর করতে পারে। মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মতের সাথে একমত পোষণ করেন। সহীহ মুসলিমের ১৪৭ নম্বর হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে হাদিসটি আসলে স্পষ্ট করে যে কেউ ইসলামের শিক্ষা না শিখে এবং আমল না করে বিশ্বাসের সাথে ইসলামে বিশ্বাস করতে পারে না তবে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে লোকেরা হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করবে যার অর্থ কেউ কেবল দাবি করতে পারে। মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য না করে ইসলামে বিশ্বাস।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদিস রয়েছে, যা মানবজাতিকে উপদেশ দেয় যে, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহর বান্দা ও শেষ রসূল, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবেন। এরকম একটি উদাহরণ সহীহ বুখারী, 128 নম্বরে পাওয়া যায়।

এই হাদিসগুলোর তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করবে সে হয় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে অথবা তারা তাদের পাপের পরিমাণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি সহীহ বুখারী, 7510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যারা জাহান্নামে প্রবেশ না করেই জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তাদের ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাস শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ঘোষণা করতে হবে না বরং এর শর্ত ও বাধ্যবাধকতাও তাদের পালন করতে হবে। ঈমানের সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে জান্নাতের চাবি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দরজা খোলার জন্য একটি চাবির দাঁত প্রয়োজন। জান্নাতের চাবিকাঠির দাঁত হল এর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এগুলো ছাড়া মানে, দাঁত ছাড়া চাবি জান্নাতের দরজা খুলবে না। এটা অনেক হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত যা নির্দেশ করে যে জান্নাতে প্রবেশের জন্য একজনকে ইসলামের শর্ত ও কর্তব্য পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 1397 নম্বর, ইঙ্গিত করে যে সাক্ষ্যকে অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলির আকারে কর্ম দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যেমন ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সাক্ষ্যের প্রথম অংশটি হল, মহান আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এর অর্থ হল, মহান আল্লাহই একমাত্র যিনি মান্য করতে হবে এবং কখনই অবাধ্য হবে না। যখন কেউ মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তাদের এমন কিছু মান্য করা উচিত নয় যা তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান

আল্লাহই তাদের মালিক এবং তারা কেবল তাঁর দাস। কিন্তু যে মুহুর্তে কেউ এমন কিছু মান্য করে যা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, তখন তারা তাঁর একত্বের উপর তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করেছে যা আল জাথিয়াহ, 23 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের ইচ্ছাকে তার উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

পবিত্র কুরআন মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছে যে যে কেউ পাপ করে সে প্রকৃতপক্ষে শয়তানের উপাসনা করে যেমন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে তার আনুগত্য করেছে। অধ্যায় 36 ইয়াসিন, আয়াত 60:

"হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে শয়তানের ইবাদত না করার নির্দেশ দেইনি - [কারণ] সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

যে মুসলমানরা তাদের আকাঙ্ক্ষা, অন্যের আকাঙ্ক্ষা এবং শয়তানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং পরিবর্তে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে মান্য করে, তারা সত্যিই মহান আল্লাহকে তাদের ঈশ্বর হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই মুসলমানদের উভয় জগতে মহান আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। এই মুসলিমরা কার্যত ইসলামের সাক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করেছে কারণ তারা তাদের মৌখিক এবং অভ্যন্তরীণ দাবিকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর

রেওয়ায়েত অনুযায়ী আন্তরিক পদক্ষেপের সাথে সমর্থন করেছে। যখন কেউ তার রেওয়ায়েত অনুযায়ী কাজ করে তখন তারা সাক্ষ্যের দ্বিতীয় দিকটি পূরণ করে, যথা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বান্দা ও চূড়ান্ত রাসূল। সহীহ বুখারি, 128 নম্বর হাদিসে এই মুসলিমদের উল্লেখ করা হয়েছে। এটি পরামর্শ দেয় যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে।

যে ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে ইসলামের ঘোষণা দেয় এবং অভ্যন্তরীণভাবে তা গ্রহণ করে সে নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম কিন্তু মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি তাদের সত্যিকারের আন্তরিক বিশ্বাস তাদের গুনাহ অনুসারে হ্রাস পায়।

সাক্ষ্যের উপর সত্যিকারের আমল করার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন। এটি পরামর্শ দেয় যে এটি একজন ব্যক্তির ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি তখনই হয় যখন একজন মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তিনি যা ঘৃণা করেন তা পছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন। যেহেতু এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য, সুনানে ইবনে মাজা, 2333 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মুসলমানদেরকে তাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

ইসলামি শিক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, মহান আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাকে ঘৃণা করা এবং অপছন্দ করা একজন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার অনুসরণ এবং মহান আল্লাহর উপর তাদের আনুগত্য করার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। এই মনোভাব মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসকে কমিয়ে দেয়। নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই মানসিকতা গ্রহণ করা ইসলামের সাক্ষ্যের সত্য বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 24:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছ, বাণিজ্য যাতে তোমরা পতনের আশঙ্কা কর, এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট, তা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করুন, অতঃপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করেন এবং আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, সে প্রান্তে তাঁর ইবাদত করে। অর্থ, যখন তারা স্বাচ্ছন্দ্যের মুখোমুখি হয় তখন তারা খুশি হয় কিন্তু যখন তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা ক্রোধে তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা

হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে এবং বিশ্বাসের সাক্ষ্যের উপর কাজ করার বিষয়ে জানায়, যা পরবর্তী পৃথিবীতে জাহান্নামের আগুন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটি হল প্রথমে তাদের সমস্ত শর্ত এবং শিষ্টাচারগুলি পূরণ করার সাথে সাথে সঠিকভাবে বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করা। অতঃপর স্বেচ্ছাকৃত সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এর সাথে যোগ করতে হবে, যার মধ্যে সর্বোত্তম হল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য। এটি মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসার দিকে পরিচালিত করে এবং মহান আল্লাহকে তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে ক্ষমতায়িত করে যাতে তারা কেবল তাঁরই আনুগত্য করে। এই সত্য ও আন্তরিক আনুগত্যই ঈমানের সাক্ষ্যের পরিপূর্ণতা। এটি সেই সুস্থ হৃদয় যার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ভালবাসা এবং পার্থিব কামনা-বাসনা ও জড় জগতের ভালবাসা মুক্ত। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান পাপ করা থেকে মুক্ত হয়ে যায় তবে এর অর্থ হল তারা তাদের থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় যখন তারা খুব কমই পাপ করে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ও মৌখিকভাবে ইসলামের সাক্ষ্য ঘোষণা করা নয় বরং তাদের অবশ্যই তাদের কর্মে তা দেখাতে হবে কারণ এই পৃথিবীতে প্রকৃত সফলতা অর্জনের এবং পরের দুনিয়াতেও শাস্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় এটি। .

মন্দ প্রভাব হ্রাস

সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 3294 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে ইসলামের দ্বিতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা, উমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যে পথই গ্রহণ করেন, শয়তান তার ভয়ে ভিন্ন পথ গ্রহণ করবে। শয়তান কেন এইভাবে কাজ করেছিল তার একটি কারণ ছিল উমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর তার সামান্য প্রভাব ছিল। শয়তান শারীরিকভাবে কাউকে পাপ করতে বাধ্য করতে পারে না। তিনি পরিবর্তে ফিসফিস করে তাদের তা করতে উত্সাহিত করেন। কিন্তু সেগুলিকে কার্যকর করার জন্য একজন ব্যক্তিকে একধরনের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হতে হবে। তারপর তার ফিসফিস করে তিনি এই পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিকে উত্সাহিত করেন যতক্ষণ না এটি ব্যক্তিকে এর উপর কাজ করার জন্য একটি পাপ করার জন্য প্ররোচিত করে। উমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপর শয়তানের সামান্য প্রভাবের কারণ হল, তিনি তার অন্তর থেকে পার্থিব কামনা-বাসনা দূর করে দিয়েছিলেন। তার একমাত্র ইচ্ছা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার সাথে যুক্ত ছিল। অতএব, মুসলমানরা যদি তাদের উপর শয়তানের প্রভাব কমাতে চায় তবে তাদের হৃদয় থেকে অপ্রয়োজনীয় কামনা-বাসনা দূর করতে হবে। এটি তখনই ঘটে যখন কেউ এই জড় জগতের অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় দিকগুলিতে প্রবৃত্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। তারা যত বেশি এটি করবে ততই এই পার্থিব বাসনাগুলি তাদের হৃদয় ছেড়ে চলে যাবে যতক্ষণ না তারা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাবে যেখানে তারা তাদের সমস্ত কাজে কেবল মহান আল্লাহকে খুশি করতে চায়। শয়তান এই ব্যক্তির কাছ থেকে পালিয়ে যাবে কারণ সে জানে যে সে তাদের উপর সামান্য প্রভাব ফেলবে। কিন্তু এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় দিকগুলিতে কেউ যত বেশি লিপ্ত হবে সে তত বেশি জাগতিক আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবে এবং তাই, শয়তান তাদের উপর তত বেশি প্রভাব ফেলবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য ভালোবাসা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে, যার জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীর নাম রেখেছিলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন পুরুষ তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং তিনি তার পিতার নাম রাখেন আবু বক্কর এবং তার পরে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। সহীহ বুখারী, ৩৬৬২ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আজকাল বেশিরভাগ লোকের বিপরীতে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিকতা এবং আনুগত্যের কারণে আবু বক্কর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসতেন। অর্থ, তার ভালবাসা ছিল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পার্থিব কারণের জন্য নয়।

সহীহ মুসলিম, 6548 নম্বরে পাওয়া একটি খোদায়ী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালবাসতেন এমন দু'জনকে ছায়া দেবেন। বিচার এর দিন।

মহান আল্লাহ এই দুই ব্যক্তিকে ছায়া দিবেন যেদিন সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি

উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকালে মানুষ যদি সূর্যের তাপ মোকাবেলা করতে কষ্ট করে তাহলে বিচার দিবসে তাপের তীব্রতা কল্পনা করা যায় কি?

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা এমন পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। আর যে ব্যক্তি এটি নিয়ন্ত্রণে ধন্য হবে সে ইসলামের দায়িত্ব সরাসরি পালন করতে পারবে। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এই কারণেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসাকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা ভালো তা কামনা করা। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায় অনুসারে সমর্থন করা। একজন অন্যের জন্য যে অনুগ্রহ করে তা গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং তাদের অকৃত্রিমতাও প্রমাণ করে কারণ তারা শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালোবাসা, যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত মুমিন হওয়ার একটি দিক।

সত্যবাদিতা মূর্ত করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ সত্যকে জিহ্বায় এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে রেখেছেন। জামে আত তিরমিযী, ৩৬৮২ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

লোভ পরিহার করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপহার হিসেবে কিছু সম্পদ দিয়েছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন তাঁর চেয়ে দরিদ্র কাউকে তা দিতে পারেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তা নিতে বলেছেন এবং যোগ করেছেন যে কেউ যদি তাকে এমন কিছু দেয় যা সে চায়নি বা আশাও করেনি সে যেন তা গ্রহণ করে। আর যা তার কাছে আসে না, সে যেন তা খোঁজ না করে। এটি সহীহ মুসলিম, 2405 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা একজনকে লোভ পরিহার করতে উৎসাহিত করে।

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদেরকে লোভের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এটি একজনকে বাধ্যতামূলক দাতব্য বন্ধ করে দিতে পারে যা কেবল উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

“আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

যদি কারো লোভ তাদের স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করতে বাধা দেয় তবে এটি বেআইনি নাও হতে পারে তবে এটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত কারণ এটি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সহজ কথায়, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মাইগ্রেশনের পর 2 য় বছর

বদরের যুদ্ধ

দৃঢ় অবস্থান

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার অমুসলিমদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার পথে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে জানানো হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী সংগঠিত করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে কি করতে হবে তার মতামত জানতে চাইলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 259-260-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ সময় হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে গিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেন, সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার করেন এবং অন্যান্য সাহাবীগণকে উৎসাহিত করেন, আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। তাদের, একই করতে. অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে এসে একই কাজ করলেন: তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর সমর্থনের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 93-94-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনাটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

উপরন্তু, ভন্ডামির একটি দিক হল যখন কেউ মৌখিকভাবে অন্যদের এবং তাদের ভাল প্রকল্পগুলির জন্য সমর্থন দেখায় যেমন, একটি মসজিদ নির্মাণ কিন্তু যখন প্রকল্পে অংশ নেওয়ার সময় আসে, যেমন সম্পদ দান করার সময় তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। একইভাবে, লোকেরা যখন ভাল সময়ের মুখোমুখি হয় তখন তারা তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা অন্যদের মনে করিয়ে দিয়ে মৌখিকভাবে তাদের সমর্থন করে। কিন্তু জনগণ যে মুহুর্তে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এই মুনাফিকরা কোন মানসিক বা শারীরিক সমর্থন দেয় না। বরং তারা তাদের সমালোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মুনাফিকদের এই মনোভাব ছিল। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 62:

“অতএব কেমন হবে যখন তাদের হাতের বর্ধনের কারণে তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসে এবং তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার কাছে আসে, “আমরা সদাচরণ ও বাসস্থান ছাড়া আর কিছুই চাইনি।”

বিশ্বাসে আপসহীন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং অমুসলিমরা পরাজিত হওয়ার পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অমুসলিমদের মৃতদেহ একটি পুরাতন কূপে রাখার নির্দেশ দেন। এটি সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি কূপের মধ্যে থাকা লোকদের গণনা করে তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি না তারা তা পেয়েছেন কি না, যেমন মহান আল্লাহ তাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তাকে দেওয়া হয়েছিল। যখন তাকে মৃতকে ডাকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তারা তার কথা শুনতে পাচ্ছে কিন্তু তারা উত্তর দিতে পারেনি। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 300-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই যুদ্ধে, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মামা আল আস ইবনে হাশিমকে মোকাবিলা করেন এবং হত্যা করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 93-94-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট কোনো সম্পর্ককে তাঁর আন্তরিকতা ও আনুগত্যকে পরাভূত করতে দেননি মহান আল্লাহ ও মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি। মুসলমানদের অবশ্যই এই আপোষহীন মনোভাব অবলম্বন করতে হবে, যদি তারা উভয় জগতেই সাফল্য চায়।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহূর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে

সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

সত্য ভালবাসা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় বছরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের বিজয় প্রদানের পর কিছু যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয় যার মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা, আল আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, আল আব্বাস রা.-কে ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তার নিজের পিতা ইসলাম গ্রহণ করলে তার চেয়ে ইসলাম গ্রহণ করা তাকে বেশি খুশি করবে, কারণ এটি পবিত্র ধর্মকে অত্যন্ত খুশি করবে। নবী মুহাম্মদ সা. ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 307-308-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার একটি নিদর্শন হল যে, কেউ পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে প্রাধান্য দেবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসসমূহকে প্রাধান্য দেবে। তার উপর, তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং মতামত উপর. অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 24:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছ, বাণিজ্য যাতে তোমরা পতনের আশঙ্কা কর, এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট, তা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করুন,

অতঃপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করেন এবং আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের প্রতি ভালবাসার কারণে এই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলির দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু যখন কেউ এসবের উপর ইসলামের আনুগত্য বেছে নেয়, তখন তা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা। একজন সত্যিকারের প্রেমিক কেবল তাদের প্রিয়তমের আনুগত্য করতে এবং সর্বদা তাদের খুশি রাখতে চায়। এটা তখনই সম্ভব যখন একজন মুসলমান ইসলামের শিক্ষা মেনে চলে।

মাইগ্রেশনের পর ৩ য় বছর

উহুদের যুদ্ধ

অসুবিধা এবং কষ্টের মুখোমুখি

পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতের সামনে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় জাবাল আল রুমায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধটি ছিল। ওভার এবং কমান্ড আর প্রয়োগ করা হয় না। তারা যখন জাবাল আল রুমায় নেমেছিল, তখন এটি মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশ উন্মোচিত করেছিল। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণ নিরাপদে উহুদ পর্বতে পশ্চাদপসরণ করার পর অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়েছে কি না। আবু সুফিয়ান বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলামের ধারাবাহিকতা এই মহান ব্যক্তিত্বদের উপর নির্ভরশীল। প্রথমদিকে, কেউ তাকে উত্তর দেয়নি যেহেতু মহানবী হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে চুপ থাকতে বলেছেন। কিন্তু যখন আবু সুফিয়ান যা ঘটেছে তা নিয়ে গর্ব করতে শুরু করলেন, তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ থাকতে পারলেন না এবং তাকে তিরস্কার করলেন। আবু সুফিয়ান তখন তাদের বলে যে তার সৈন্যরা পতিত সাহাবীদের মৃতদেহ বিকৃত করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যদিও তিনি তাদের তা করার নির্দেশ দেননি, কিন্তু তাদের কাজ তাকে অসন্তুষ্ট করেনি। আবু সুফিয়ান গর্ব করেছিলেন যে কীভাবে এই যুদ্ধটি বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ ছিল, কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি ভুল করেছিলেন যে অমুসলিমরা যারা নিহত হয়েছিল তারা জাহান্নামে যেখানে পতিত সাহাবীগণ, আল্লাহ খুশি হতে পারেন। তারা জান্নাতে ছিল। যাওয়ার আগে, আবু সুফিয়ান মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরের বছর বদর যুদ্ধের জন্য আবার দেখা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যা পরবর্তীতে গ্রহণ করেছিল। অমুসলিম সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর, আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতে এবং অমুসলিম সেনাবাহিনী মক্কার দিকে বাড়ি যাচ্ছে নাকি মদিনা আক্রমণ করতে যাচ্ছে তা মূল্যায়ন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেছেন যে, যদি তারা মদিনার দিকে রওনা হয়, তবে তিনি সেখানে অগ্রসর হবেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু আলী (রাঃ) এর পর পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে তিনি বুঝতে পারলেন যে তারা মক্কার দিকে রওনা হচ্ছেন। ইমাম সাফি উর রহমানের দ্য সিলড নেক্টার, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮২-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং

লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে , কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

অসুবিধার মধ্যে বাধ্যতা

পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর তৃতীয় বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা পূর্ববর্তী বছরে সংঘটিত বদর যুদ্ধে ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে উহুদ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, দ্রুত অমুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেন যার ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু তীরন্দাজ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ফলাফল নির্বিশেষে উহুদ পর্বতের সামনে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় জাবাল আল রুমায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধটি ছিল। ওভার এবং কমান্ড আর প্রয়োগ করা হয় না। তারা যখন জাবাল আল রুমায় নেমেছিল, তখন এটি মুসলিম সেনাবাহিনীর পিছনের অংশ উন্মোচিত করেছিল। অমুসলিম বাহিনী তখন একত্রিত হয়ে উভয় দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা চালায়। এর ফলে অনেক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের দেহ অমুসলিমদের দ্বারা বিকৃত হয়ে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ যখন মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তারা অবগত হন যে মক্কার অমুসলিম নেতারা মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন যাতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ইসলাম ভালোর জন্য। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের বেদনাদায়ক ক্ষত এবং ক্লান্ত শরীর সত্ত্বেও, অমুসলিমদের অনুসরণে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইতিবাচকভাবে সাড়া দিলেন, মহান আল্লাহ, অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 172 নাজিল করলেন:

“যারা [মুমিনদের] আঘাতের পর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সাড়া দিয়েছিল তারা আঘাত করেছিল। তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 67-68-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন

তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা জরুরী যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , সব পরিস্থিতিতে।

একটি উপযুক্ত জীবনসঙ্গী

উমর ইবনে খাত্তাবের কন্যা হাফসাহ যখন বিধবা হয়ে যান, তখন তিনি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একটি সম্ভাব্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। পরেরটি যথাক্রমে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ সে বিয়ের জন্য সঠিক অবস্থানে ছিল না। উমর তখন আবু বক্করের সাথে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেননি। পরবর্তীতে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন এবং আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন। আবু বক্কর তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ব্যাখ্যা করলেন যে, তিনি প্রথমে উত্তর দেননি কারণ তিনি জানতেন যে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই তথ্য প্রকাশ করার পরিবর্তে তিনি অবিলম্বে উত্তর না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 3261 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মেয়েকে একজন উপযুক্ত মুসলিমের সাথে বিবাহ নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যে তার অধিকার পূরণে সচেষ্ট হবে। মুসলমানদের অবশ্যই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যখন নিজেদের জন্য বা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের জন্য জীবনসঙ্গী খোঁজার সময়। একজন উপযুক্ত জীবনসঙ্গী তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করে।

উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তাদের সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা তাদের ধার্মিকতার জন্য। তিনি সতর্ক করে উপসংহারে বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাকওয়ার জন্য বিয়ে করা উচিত অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই জিনিসের সাথে নয় যা চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিয়েটি কার্যকর না হয় তবে এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য বিয়ে করা মানে, প্রেম বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত কারণ এটি এমন একজনকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার মূল বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি দেখা উচিত তা হল তাকওয়া। এটি

তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটি ।

পরিশেষে, একজন মুসলিম যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে প্রথমে তাদের উচিত এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান যেমন তারা তাদের পত্নীর পাওনা কি অধিকার, তাদের জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে তাদের পাওনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে তার স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক তর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের সঙ্গী পূরণ করতে বাধ্য নয়। জ্ঞান একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

মাইগ্রেশনের পর ৪ র্থ বছর

বনু নাদির

প্রতিশোধ ভুলে যাওয়া

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর চতুর্থ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি অমুসলিম গোত্র বনু নাদিরকে পরিদর্শন করেন, যার কাছে তিনি পূর্বে অঙ্গীকার করেছিলেন। সহায়তা এবং শান্তির সাথে, আর্থিক সহায়তার জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য। তারা উত্তর দিয়েছিল যে গোপনে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করার সময় তারা তাকে সাহায্য করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিয়ে ঐশ্বরিক ওহী পেয়েছিলেন এবং তাদের মন্দ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পাওয়ার আগেই তিনি চলে যান এবং মদিনায় ফিরে আসেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তারপর বনু নাদিরদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেন যাতে তারা তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে এবং সুরক্ষা দেয়। মুনাফিকরা বনু নাদিরকে থাকার জন্য অনুরোধ করল এবং তাদের সমর্থন দিল। তারা দাবি করেছিল যে, যদি বনু নাদিররা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তবে তারা তাদের সমর্থন করবে, যদি বনু নাদির যুদ্ধ করে তবে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যদি তাদের অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হয় তবে তারা তাদের সাথে চলে যাবে। তাদের এটি বনু নাদিরকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত মুনাফিকরা কিছুই করেনি যখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ

তাদের উপর সন্তুষ্ট, বনু নাদিরকে অবরোধ করেন, তখন তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করেছিলেন যে তারা তাদের রক্তকে বাঁচিয়ে দিন এবং পরিবর্তে তাদের নিরাপদ পথ প্রদান করুন যাতে তারা তাদের জিনিসপত্র সহ এলাকাটি খালি করতে পারে। . বনু নাদিরদের বিরুদ্ধে তাদের মন্দ পরিকল্পনার প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে অস্ত্র ব্যতীত যা কিছু বহন করতে পারে তা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 100-101-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় বদর

উহুদের যুদ্ধ ছেড়ে যাওয়ার আগে, অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ান পরের বছর বদরে আবার মিলিত হওয়ার জন্য দুই সেনাবাহিনীর জন্য নিয়োগের ঘোষণা দেন। সময় এলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় 1500 সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং অমুসলিমদের জন্য অপেক্ষা করে বদরে শিবির স্থাপন করেন। অমুসলিম সেনাবাহিনীতে প্রায় 2000 সৈন্য ছিল কিন্তু বদর থেকে দূরে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন এবং যদিও তিনি নিজেই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, আবু সুফিয়ান সৈন্যদের মক্কায় ফিরে যেতে উৎসাহিত করেন। মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত হতে তারা ভীত হয়ে পড়ায় তারা তার কোন বিরোধিতা না করে মক্কায় ফিরে আসেন। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, বদরে থেকে যান এবং কিছু লাভজনক ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। আট দিন পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্ময় ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বদর ত্যাগ করেন যা আরব জনগণের হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইমাম সাফি উর রহমানের দ্য সিলড নেক্টার, পৃষ্ঠা 306-307-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাদের দৃঢ়তার কারণে, মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে একটি মনস্তাত্ত্বিক বিজয় দান করেছিলেন যা সামরিক বিজয়ের চেয়ে সারা আরব জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান

এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয় । পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ

মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

মাইগ্রেশনের পর ৫ ম বছর

আহযাবের যুদ্ধ

একটি প্রস্থান

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনার ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দক/আহজাবের যুদ্ধ শুরু হয়। যখন তাদের আক্রমণের কথা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছায়, তখন সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে তিনি শত্রুদের মদিনার একমাত্র পাশে একটি বিশাল পরিখা খননের নির্দেশ দেন। থেকে সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে এবং পরকালের পুরস্কার অন্বেষণ করতে। তারা সবাই তার পাশাপাশি কাজ করেছে। শত্রু বাহিনী মদিনা ও পরিখার কাছাকাছি পৌঁছে ক্যাম্প স্থাপন করে। মদিনার মধ্যে একটি অমুসলিম উপজাতি, বনু কুরাইজা, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল, তাদের দুর্গগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল। একজন অমুসলিম অমুসলিম সেনাবাহিনী থেকে ভ্রমণ করে বনু কুরাইজার একজন নেতা কাব বিন আসাদকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করার এবং পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। -মুসলিম বাহিনী এবং

সাহাবীদের উপর আক্রমণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মদিনার মধ্যে থেকে যুদ্ধ শুরু হয়. কাব বিন আসাদ তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তার শান্তি চুক্তি ভেঙ্গে দেন এবং যে দলিলটি লেখা ছিল তা ছিঁড়ে ফেলেন। মদিনার বাইরে ও ভিতরে শত্রুরা থাকায় উদ্বেগ ও ভয় বেড়ে গেল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণ এই যুদ্ধ জুড়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ করলেন। অমুসলিম বাহিনী যা তাদের শিবিরকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলে এবং তাদের বিভ্রান্তি ও দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত করে। আবহাওয়া তাদের বিপক্ষে থাকায় অমুসলিমরা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা সফলভাবে পরিখা ভেদ করে মদিনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 154-155-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অমুসলিম সৈন্যবাহিনী চলে যাবার আগে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুদাইফা বিন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রু শিবির থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তাকে এমন কিছু না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন যা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আমার মুখোমুখি। শত্রু শিবিরে পৌঁছে তিনি অমুসলিম নেতা আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করলেন। হুদাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ধনুক বোঝাই করে আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁকে দেওয়া আদেশের কথা মনে পড়লে তিনি তাঁর হাত আটকে রাখেন। তিনি গোপনে অমুসলিমদের একটি সভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন যে তারা তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ তাদের সরবরাহ শেষ হয়ে যাচ্ছিল, মহান আল্লাহ প্রেরিত বাতাস তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং তারা মুসলমানদের খনন করা পরিখা ভেদ করতে পারেনি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী'র দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য নবী (সাঃ) এর ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 1383-1384-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা। এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও যা অনিবার্য এবং বিপর্যয়কর বলে মনে হয়, এই মহান ঘটনার মতো, একজন মুসলমানের সর্বদা মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা উচিত। মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং তারা অত্যন্ত অদূরদর্শী। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ঐশ্বরিক উপলব্ধি সীমাহীন। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রাখা, যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তি তাদের শারীরিক পথপ্রদর্শকের দিকনির্দেশনাকে বিশ্বাস করে। একজন মুসলিমের মনোভাব যাই হোক না কেন, মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দ ঘটবে তাই অধৈর্যতা দেখানোর পরিবর্তে তাঁর প্রজ্ঞার উপর আস্থা রাখা উত্তম যা কেবলমাত্র আরও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

এছাড়াও, একজন ব্যক্তির জীবনের অগণিত উদাহরণগুলি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যখন একজন ব্যক্তি কিছু পাওয়ার পরে অনুশোচনা করতে চেয়েছিলেন। এবং যখন তারা কিছু ঘটতে অপছন্দ করে শুধুমাত্র পরে তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যেহেতু ভাগ্য মানুষের হাতের বাইরে, তাই মুসলমানদের জন্য জরুরী যে বিষয়গুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যদি তারা কঠিন থেকে মুক্তি পেতে চায়, যেমন, মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা। ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তিনি একজন মুসলিমকে উভয় জগতের সমস্ত অসুবিধা থেকে রক্ষা করবেন। তাদের যা করতে হবে তা হল তাঁর আনুগত্য করা। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে নেই তার অর্থ, ভাগ্যের উপর জোর দেওয়া এবং যে জিনিসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তার প্রতি উদাসীন থাকা, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আনুগত্য করা বোকামি।

বনু কুরাইজা

বিশ্বাসঘাতকতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর পঞ্চম বছরে মদিনার ইসলামের শত্রুরা মক্কার অমুসলিম এবং অন্যান্য বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রকে মদিনায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল। এর ফলে খন্দকের যুদ্ধ শুরু হয়। মহান আল্লাহ অমুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তাদের শান্তি ও সমর্থনের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। খন্দকের যুদ্ধের সময় পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং এর পরিবর্তে অমুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজাকে অবরোধ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। বনু কুরাইজা একজন সাহাবী সাদ বিন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হয়েছিল, যাকে তারা মুসলিম হওয়ার আগেই ভাল করে চিনতেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের রায়ের জন্য ডেকে পাঠালেন এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে বনু কুরাইজার সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর ঘোষণা করলেন যে, তিনি মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 166-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য মৃত্যুদণ্ড একটি খুব সাধারণ রায়, এমনকি এই দিন এবং যুগেও। উপরন্তু, তাদের অপরাধ ছিল একক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, পুরো জনপদে ভরা। তাদের পরিবর্তে নির্বাসিত হলে তারা আবার মদিনার সাথে যুদ্ধ করত।

যারা তার দুর্বল বান্দাদের উপর অত্যাচার করে তাদের উপর মহান আল্লাহ প্রতিশোধ নেন কারণ তারা নিজেদের রক্ষা করার বা প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে মহান আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার করবে না, বিশেষ করে যারা প্রতিরক্ষাহীন বলে মনে হয় বাস্তবে তাদের রক্ষাকর্তা এবং প্রতিশোধদাতা হলেন মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এবং বিশেষ করে বিচার দিবসে প্রতিশোধ নেবেন। তিনি অত্যাচারীকে তাদের সৎ কাজগুলো তাদের শিকারের কাছে হস্তান্তর করতে বাধ্য করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপ তাদের অত্যাচারীর কাছে স্থানান্তরিত করবেন। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে । এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই স্বর্গীয় নামের উপর কাজ করতে হবে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মাধ্যমে, যা তাদেরকে মহান আল্লাহর কঠোর আনুগত্যের অধীন করে মন্দের দিকে অনুপ্রাণিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং

ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। . এবং একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিসের প্রতিশোধ নিতে হবে।

মাইগ্রেশনের পর ৬ ষ্ঠ বছর

আগুনের দুটি জিহ্বা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরা এই অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাদের একটি দল তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে একটি কূপ ঘিরে ফেলে। কূপের আশেপাশের এলাকা ঠাসাঠাসি হওয়ায় দুইজন সাহাবী, একজন মদীনার এবং অন্যজন মক্কার, তাদের সাথে সামান্য ঝগড়া হয়। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এই সুযোগটি নিয়ে আরও বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এই দাবি করে যে, মক্কার হিজরতকারীরা তাদের সমস্যা সৃষ্টি করছে। মক্কার হিজরতকারীদের মদিনায় চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য তিনি অন্যান্য মুনাফিকদের সমালোচনা করতে শুরু করেন। যায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নামক এক শিশু তার মন্দ কথা শুনে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন উবাইকে তলব করা হয়েছিল কিন্তু তিনি বড় শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি কখনও এই শব্দগুলি বলেননি। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন পদক্ষেপ নেননি। এই প্রসঙ্গে, মহান আল্লাহ, অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 7-8 অবতীর্ণ করেছেন:

"তারা তারা যারা বলে, "যারা আল্লাহর রসূলের সাথে আছে তাদের উপর ব্যয় করো না যতক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" আর নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আমানত আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না। তারা বলে, "যদি আমরা আল-মদীনায়

ফিরে আসি, [ক্ষমতার জন্য] যত বেশি সম্মানিত হবে, তত বেশি বিনয়ীকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দেবে।" আর সম্মান আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।"

এই আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর কান ধরে সান্ত্বনা দিয়ে মন্তব্য করলেন যে, তিনিই তাঁর কান মহান আল্লাহর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। . ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 213-215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিমুখী হওয়া ভন্ডামির লক্ষণ। এই সেই ব্যক্তি যে তাদের আচরণ পরিবর্তন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের খুশি করার জন্য যাতে কিছু পার্থিব জিনিস লাভ করার ইচ্ছা থাকে। তারা বিভিন্ন লোকেদের প্রতি তাদের সমর্থন দেখিয়ে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং তাদের প্রতি অপছন্দকে আশ্রয় করে। তারা লোকদের প্রতি আন্তরিক হতে ব্যর্থ হয় যা সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। যদি তারা তাওবা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা পরকালে নিজেদেরকে আগুনের দুটি জিভ দিয়ে দেখতে পাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4873 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 14:

"যখন তারা মুমিনদের সাথে দেখা করে, তখন তারা বলে: "আমরা ঈমান এনেছি" কিন্তু যখন তারা তাদের দুষ্ট সঙ্গীদের সাথে দেখা করে (গোপনে), তারা বলে: "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি; আমরা নিছক ঠাট্টা করছিলাম।"

নিজেকে উপকৃত করুন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য অনৈক্য ও সমস্যা সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উপর এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। একবার তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যিনি একজন অনুগত সাহাবী ছিলেন, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসেছিলেন এবং তার মুনাফিক পিতাকে তার রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজের জন্য হত্যা করার প্রস্তাব দেন। মদিনা শহর এবং এর নেতা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে। কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি তার পরিবর্তে তার পিতা, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে ক্ষমা করবেন এবং সদয় আচরণ করবেন। মদিনার লোকেরা এই কথা শোনার পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখনই খারাপ আচরণ করত তখন প্রায়ই তার সমালোচনা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ কথা শুনলেন, তখন তিনি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মন্তব্য করলেন, যিনি রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদি তিনি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেন। তার আগে, কিছু লোক তার পক্ষে দাঁড়াতেন, কিন্তু এখন, যদি তিনি তার ফাঁসির আদেশ দেন তবে জনগণ তা কার্যকর করতে দ্বিধা করবে না। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যখন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে বাস্তবে, তখন নিজেদের উপকার করে, অন্যদের নয়। এর কারণ হল

অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা একটি সওয়াব লাভ করে।

উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের প্রতি সদয় হয় তখন তারা জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করবে যা তাদের উপকারে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6929 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, গোপনে একজন ব্যক্তির জন্য করা প্রার্থনা সর্বদা উত্তর দেওয়া হয়।

উপরন্তু, তারা মারা যাওয়ার পরে লোকেরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে যা অবশ্যই উত্তর দেওয়া হবে কারণ এটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"... বলেন, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী..."

পরিশেষে, যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে বিচারের দিন তাদের সুপারিশ লাভ করবে, যেদিন মানুষ অন্যদের সুপারিশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এটি সহীহ বুখারী, 7439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তারা পূর্বে উল্লেখিত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। এবং বিচারের দিন তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে নিপীড়কের নেক আমল তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের প্রতি সদয় হওয়ার মাধ্যমে নিজের প্রতি সদয় হওয়া, কারণ বাস্তবে তারা কেবল নিজেরাই ইহকাল ও পরকালে লাভবান হচ্ছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 6:

"এবং যে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে..."

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ

লেটিং থিংস গো

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ বনুদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। আল মুসতালিক। তাঁর স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর সাথে ছিলেন। যাত্রার সময় মহিলারা একটি ছোট বগির ভিতরে বসতেন যা একটি উটের উপর স্থাপন করা হত। সেনাবাহিনী যখন আয়েশা (রা.) শিবির স্থাপন করেছিল, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন নিজেকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য চলে যান এবং ক্যাম্পে ফিরে আসেন। ফেরার সময় সে লক্ষ্য করল তার নেকলেস হারিয়ে গেছে। তারপরে তিনি এটি না পাওয়া পর্যন্ত তার পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করেছিলেন। যখন তিনি আবার ক্যাম্পে ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে তারা তাকে ছাড়াই চলে গেছে। এটি ঘটেছিল যখন একটি উটের উপর তার বগি স্থাপন এবং বেঁধে রাখার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ধরে নিয়েছিল যে সে ইতিমধ্যে ভিতরে রয়েছে। সাফওয়ান বিন আল মুআত্তাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন সাহাবী তাকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি পরিত্যক্ত শিবিরের স্থানেই ছিলেন। তাকে সেনাবাহিনী থেকে পিছিয়ে যাওয়ার এবং ভ্রমণকারী সেনাবাহিনী থেকে অজান্তে পড়ে থাকা যে কোনও লাগেজ তুলে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি আয়েশাকে চিনতে পারলেন, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, যেমনটি তিনি তাকে দেখেছিলেন ইসলামে নারীদের পর্দা করা ফরজ হওয়ার আগে। তিনি সসম্মানে তাকে তার উটটি চড়ার প্রস্তাব দিলেন যখন তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন। যখন তারা সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছল তখন লোকেরা আয়েশাকে সাক্ষী করল, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ক্যাম্পে প্রবেশ করছেন। এই সুযোগে মুনাফিকরা তার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে এবং লোকেরা ভীষণভাবে বিচলিত

হয়ে পড়ে। আল্লাহর পরে, মহান, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন, তাঁর পিতা আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই অপবাদ ছড়ানোয় অংশ নেওয়া তাঁর আত্মীয়কে আর আর্থিকভাবে সাহায্য করবেন না। মহান আল্লাহ, তারপর অধ্যায় 24 আন নুর, 22 নং আয়াত নাজিল করেছেন, তাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে অন্যের ভুল ক্ষমা ও উপেক্ষা করতে উত্সাহিত করেছেন:

" আর তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল ও সম্পদশালী তারা যেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের [সাহায্য] না করার শপথ না করে এবং তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এরপর আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘোষণা প্রত্যাহার করেন এবং তাঁর আত্মীয়কে সাহায্য করতে থাকেন। জামে আত তিরমিযী, 3180 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা

বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন।

হুদাইবিয়ার চুক্তি

সত্যকে সমর্থন করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। সংঘাত এড়াতে এবং তার শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় স্পষ্ট করার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার অমুসলিমদের কাছে তাঁর দূত হিসাবে প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মুসলিম হওয়ার পর থেকে অমুসলিমরা তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর মনোভাবের কারণে তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সুপারিশ গ্রহণ করলেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 227-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন, যা স্পষ্টভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দিত। কিন্তু সত্যের প্রতি আনুগত্য এবং আন্তরিকতার কারণে তিনি এই চরিত্রের জন্য আরও উপযুক্ত কাউকে সুপারিশ করেছিলেন।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের বিদায়ের পর থেকে মুসলিম জাতির শক্তি নাটকীয়ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা যৌক্তিক যে একটি দলে যত বেশি লোকের সংখ্যা বেশি হবে সেই দলটি তত শক্তিশালী হবে কিন্তু মুসলিমরা এই যুক্তিকে কোনো না কোনোভাবে অস্বীকার করেছে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুসলিম জাতির শক্তি কমেছে। এটি হওয়ার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2 এর সাথে সংযুক্ত:

"... আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনো ভালো বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে এবং খারাপ কোনো বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন না করতে। ধার্মিক পূর্বসূরিরা এটিই করেছে কিন্তু অনেক মুসলমান তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অনেক মুসলমান এখন তারা কী করছে তা দেখার পরিবর্তে কে একটি কর্ম করছে তা পর্যবেক্ষণ করে। যদি ব্যক্তিটি তাদের সাথে সংযুক্ত থাকে, উদাহরণস্বরূপ, একটি আত্মীয়, তারা তাদের সমর্থন করে যদিও জিনিসটি ভাল না হয়। একইভাবে, যদি ব্যক্তির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক না থাকে তবে জিনিসটি ভাল হলেও তারা তাদের সমর্থন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মনোভাব ধার্মিক পূর্বসূরিদের ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এটি

করছে তা নির্বিশেষে তারা ভালভাবে অন্যদের সমর্থন করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের উপর আমল করতে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা এমনকি তাদের সমর্থন করবে যেগুলিকে তারা মেনে নিতে পারেনি যতক্ষণ না এটি একটি ভাল জিনিস ছিল।

এর সাথে যুক্ত আরেকটি বিষয় হল যে অনেক মুসলমান একে অপরকে ভালোভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যাকে সমর্থন করছে সে তাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। এই অবস্থা এমনকি পণ্ডিত এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করেছে। তারা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য না করার জন্য খোঁড়া অজুহাত তৈরি করে কারণ তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই এবং তারা ভয় করে যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ভুলে যাবে এবং তারা যাদের সাহায্য করবে তারা সমাজে আরও সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল কারণ সত্যকে পর্যবেক্ষণ করতে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয়, ততক্ষণ অন্যদের ভাল কাজে সহায়তা করা সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করবে। মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে আনবেন যদিও তাদের সমর্থন অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহজেই খিলাফতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এবং তাঁর পক্ষে প্রচুর সমর্থন পেতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, আবু বক্কর সিদ্দিককে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত করা। উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তিনি অন্য ব্যক্তিকে সমর্থন করলে সমাজের দ্বারা ভুলে যাওয়া নিয়ে চিন্তা করেননি। তিনি পরিবর্তে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের আদেশ পালন করেছেন এবং যা সঠিক তা সমর্থন করেছেন। সহীহ বুখারি নম্বর 3667 এবং 3668 তে পাওয়া হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্মান ও সম্মান শুধুমাত্র এই কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যারা সচেতন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট।

মুসলমানদের অবশ্যই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে এবং যারাই এটি করছে তা নির্বিশেষে অন্যদের ভালো করতে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং তাদের সমর্থন তাদের সমাজে বিস্মৃত হওয়ার ভয়ে পিছপা হবে না। যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো বিস্মৃত হবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় জগতেই তাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

রিদওয়ানের অঙ্গীকার

দাসত্বের অঙ্গীকার

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের পর, মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলার জন্য পাঠান, যাতে তার মক্কায় আসার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার অমুসলিম নেতাদের কাছে তাঁর দূত হিসেবে তাঁর শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বার্তাটি দেওয়ার পর তাকে মক্কার অমুসলিমরা আটক করে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তারা মক্কা ত্যাগ করবেন না, কারণ তিনি কেবল নিরস্ত্র অবস্থায়ই মক্কায় প্রবেশ করেননি বরং মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবেও প্রবেশ করেছিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাষ্ট্রদূতদের সবসময় সম্মানের সাথে আচরণ করা হয় এবং তাদের ক্ষতি করা যুদ্ধ ঘোষণা। এই

দিন এবং যুগেও এটি সত্য । অঙ্গীকারের সময় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক হাত অন্য হাতে রেখে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর হাতটি উসমান (রা.)-এর হাতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার। মহিমান্বিত, এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই বিষয়ে, মহান আল্লাহ অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন, যেমন অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 10:

"নিশ্চয়ই, যারা আপনার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করে, তারা আসলে আল্লাহর কাছে আনুগত্য করছে। তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত। সুতরাং যে তার কথা ভঙ্গ করে সে কেবল নিজেরই ক্ষতির জন্য তা ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, তিনি তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।

এবং অধ্যায় 48 আল ফাত, আয়াত 18:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল এবং তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জানতেন, তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়ের পুরস্কৃত করেছেন।"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 227-228 এবং সহীহ বুখারি, 4066 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর সাথে তারা যে অঙ্গীকার করেছিল তা পূরণ করা মানবতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা পবিত্র কুরআনের 7 অধ্যায় আল আরাফের 172 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"এবং [উল্লেখ করুন] যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের থেকে - তাদের কোমর থেকে - তাদের বংশধরদের নিয়েছিলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, [তাদেরকে বলেছিলেন], "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি। [এটি] - পাছে কেয়ামতের দিন আপনি বলতে না পারেন, "নিশ্চয়ই আমরা এ সম্পর্কে বেখবর ছিলাম।"

সমস্ত মানুষকে উদ্‌ভূত করা হয়েছিল যাতে তারা মহান আল্লাহর কাছে এই অঙ্গীকার নিতে পারে। এই ঘটনার পিছনে যে শিক্ষা রয়েছে তা হল, সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে মেনে নিয়েছিল। অর্থ, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদের টিকিয়ে রেখেছেন এবং যিনি বিচার দিবসে তাদের কর্মের বিচার করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এই অঙ্গীকার পূরণ করা সকল মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। .

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করেননি যে তারা তার বান্দা কিনা, বরং তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি তাদের প্রভু

কিনা। এটি একটি ইঙ্গিত যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা সর্বদা একজন ব্যক্তির ইচ্ছা ও ইচ্ছার আগে আসা উচিত। যদি একজন মুসলমানের আল্লাহ, মহান বা অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার মধ্যে একটি পছন্দ থাকে তবে এই অঙ্গীকারটি তাদের মনে করিয়ে দেবে যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি সবার আগে আসতে হবে।

এই প্রশ্নটিও মহান আল্লাহর অসীম রহমতের ইঙ্গিত, কারণ তিনি সৃষ্টির প্রতি উত্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন শব্দের মাধ্যমে। এটি মুসলমানদেরকে দেখায় যে যদিও আল্লাহ, মহান, প্রভু যিনি তাদের কাজের বিচার করবেন, তিনি অসীম দয়ালুও।

এই চুক্তির প্রভাব সমস্ত মানবজাতির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতিরই ইঙ্গিত সহীহ মুসলিমের ৬৭৫৫ নম্বর হাদিসে পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জন্য আগে থেকে মন স্থির করে সত্যের সন্ধান না করে প্রমাণের সন্ধান করা জরুরি। যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। শুধুমাত্র তারাই যারা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের মন খোলে তারা এই চুক্তিটি আনলক করবে যা তাদের হৃদয়ের গভীরে গেঁথে আছে। প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় সমস্ত বিষয়ে খোলা মন থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে সত্য এবং সর্বোত্তম পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে। এই মনোভাব সমাজকে শক্তিশালী করে এবং সর্বদা মানুষের মধ্যে শান্তিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যারা তাদের পছন্দগুলি পূর্বনির্ধারণ করে তাদের একগুঁয়েমি সর্বদা একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে কীলক তৈরি করবে যা জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। মুসলমানদের জন্য এটা জরুরী যে তারা সবসময় জাগতিক বিষয়ে সঠিক বলে বিশ্বাস না করা অন্যথায় তারা এই একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করবে। এটি তাদের অন্যের মতামত গ্রহণ করতে বাধা দেবে যা তর্ক, শত্রুতা এবং সম্পর্ক ভাঙার দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, এই মনোভাব যেকোন মূল্যে পরিহার করা উচিত।

পরিশেষে, এই চুক্তিটি যে একজন ব্যক্তির হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে আছে তা ইঙ্গিত করে যে এটি উন্মোচন করা মুসলমানদের কর্তব্য। এটি একজনকে বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যাবে যা শোনার অর্থের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, একজনের পরিবারের দ্বারা বলা হয় যে তারা একজন মুসলিম। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন মুসলমানকে তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব দায়িত্ব পালনের সময় এই পৃথিবীতে সফলভাবে সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে দেয়। একজন শুধুমাত্র তাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে পরীক্ষা এবং তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ হয়। ঈমানের নিশ্চিততা কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাপ্ত জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

দৃঢ় অবশিষ্ট

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, যাতে তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করা যায় তবে কিছু শর্ত স্থির করা হয়। যার মধ্যে একটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে বছর সফর (ওমরা) করবেন না এবং তার পরিবর্তে তিনি পরের বছর ফিরে আসবেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, অন্যান্য অনেক সাহাবীর মতো, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তারা বাহ্যিকভাবে মক্কার অমুসলিমদের পক্ষপাতী বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি এ বিষয়ে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বললেন এবং তিনি তাঁকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের উপর অটল থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তখন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেন এবং পরবর্তীতে ঘোষণা করেন যে তিনি মহান আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করবেন না এবং তিনি কখনও তাঁর মিশনে যেতে দেবেন না। ব্যর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমরকে ঠিক একই জবাব দিয়েছিলেন যেমনটি আবু বক্কর

রাদিয়াল্লাহু আনহু দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 228-229-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, তবুও তিনি একগুঁয়ে আচরণ করেননি এবং বরং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না।

সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

একটি পরিষ্কার বিজয়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপনের পর মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার জন্য এবং মক্কায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পাঠান। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন করার জন্য কিন্তু কিছু শর্ত স্থির করেন যার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে অ-মুসলিমদের পক্ষে ছিল বলে মনে হয়। মক্কার মুসলমান। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ, তাদের উপর সন্তুষ্ট, চুক্তির অংশ ছিল (ওমরা) না করেই মদিনায় ফিরে আসেন। দশ বছরের শান্তির এই চুক্তি বাস্তবে মুসলমানদের পক্ষে ছিল। এই চুক্তির আগে যখনই মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে মিলিত হতো তখন প্রায়ই কোনো না কোনো যুদ্ধ হতো কিন্তু চুক্তির কারণে যুদ্ধ শেষ হলে যখনই এই লোকেরা মিলিত হতো তারা কেবল কথা বলতো। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলে তারা তা গ্রহণ করতে শুরু করে। ইসলাম তার আগমনের পরের আগের বছরগুলোর তুলনায় পরবর্তী দুই বছরে অনেক বেশি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। এই সুস্পষ্ট বিজয় মহান আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত ছিল, যিনি চুক্তি স্বাক্ষরের পর অধ্যায় 48 আল-ফাত প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যায় 48 আল ফাতহ, আয়াত 1:

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়"

ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 231-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বহু বছর পর, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, ইসলামে হুদাইবিয়ার চুক্তির চেয়ে বড় কোন বিজয় নেই। যদিও মানুষ তখন এর সুফল উপলব্ধি করতে পারেনি, তবুও তাদের অদূরদর্শিতার কারণে মহান আল্লাহ ইসলামের জন্য পর্যায়ক্রমে বিজয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, বিদায়ী পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় তিনি সুহায়ল বিন আমর (রা.)-এর ভক্তি ও আনুগত্য দেখেছিলেন, যিনি শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যদিও হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় তিনি হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিরোধিতা করেছিলেন। তার উপর হতে আবু বক্কর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, তারপরে তার ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং মহান আল্লাহ, মহান আল্লাহ, ইসলাম দান করার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেন।

এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে দেওয়া হয়েছিল, কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেছিলেন। সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কমেছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে যে এটি তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লাভের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলিমরা যে দুর্বলতা ও শোক অনুভব করছে তা দূর করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

" সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উভয় জগতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন অন্যের জন্য ভালোবাসা, যা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামিক শিক্ষা ও আমল করতে হবে। শিক্ষা এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আর মুসলমানরা যদি তা অর্জন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করে তাদের উচিত এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা এবং এর উপর আমল করা।

মন্দ চক্রান্ত ব্যর্থ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর ষষ্ঠ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হন। সফর (ওমরা) করা এবং মক্কার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া। ভ্রমণের সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সতর্ক করা হয়েছিল যে মক্কার অমুসলিম নেতারা তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছে। হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপনের পর, মক্কার অমুসলিম নেতারা বিভিন্ন লোককে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলার জন্য পাঠান, যাতে তার মক্কায় আসার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের প্রত্যেককে বলেছিলেন যে তিনি কেবল শান্তিতে জিয়ারত (উমরা) করতে চান। কিছু ঘটনার পর, অবশেষে মক্কার অমুসলিম নেতারা সুহাইল বিন আমরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে প্রেরণ করেন, তাঁর সাথে সন্ধি করার জন্য কিন্তু কিছু শর্ত স্থির করেন, যার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে অনুগ্রহ করে বলে মনে হয়। মক্কার অমুসলিমরা। যার একটি ছিল মক্কা থেকে ইসলাম গ্রহণকারী কেউ মদিনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে গেলে তাদের মদিনায় ফেরত পাঠানো হবে না। এটা স্পষ্ট ছিল যে মক্কার অমুসলিমরা শুধুমাত্র এই দাবি করেছিল কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে এটি তাদের ঐক্য ভেঙে মুসলিম জাতিকে দুর্বল করবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মদিনায় ফিরে আসেন। একজন সাহাবী, আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার বন্দীদশা থেকে রক্ষা পেয়ে মদিনায় পালিয়ে যান। মক্কার অমুসলিম নেতারা মদিনা থেকে আবু বাসির (রাঃ) কে উদ্ধার করার জন্য দু'জন লোককে পাঠিয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিকে সম্মান জানিয়ে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর জন্য হস্তান্তর করেন। মক্কায় ফেরার পথে আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু পালিয়ে যান এবং অবশেষে মদীনা ও মক্কা থেকে দূরে অন্য এক

নির্জন এলাকায় পালিয়ে যান। এই ঘটনার পর, যখনই কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, মক্কায় তাদের কারাগার থেকে পালিয়ে যান, তখনই তারা আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যোগ দেন। তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে শেষ পর্যন্ত তারা মক্কার অমুসলিম নেতাদের বণিক কাফেলাকে লুটপাট করতে শুরু করে, কারণ শান্তি চুক্তিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, শুধুমাত্র মদিনার নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এতে মক্কাবাসীদের জন্য মারাত্মক আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়। তারা অবশেষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি বার্তা পাঠান, তাঁর কাছে আবূ বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর বাহিনীকে মদিনায় ডাকার জন্য অনুরোধ করেন যাতে অভিযান ও লুটপাট বন্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মত হন এবং এই ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণভাবে মদিনায় হিজরত করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 240-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজনের কখনই একটি মন্দ কাজ করার ষড়যন্ত্র করা উচিত নয় কারণ এটি সর্বদা, এক বা অন্যভাবে, তাদের উপর পাল্টা আঘাত করবে। এমনকি যদি এই পরিণতিগুলি পরবর্তী বিশ্বে বিলম্বিত হয় তবে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি হবে। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর ভালোবাসা, সম্মান ও স্নেহ কামনা করে তাঁর ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তাদের ষড়যন্ত্র তাদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 18:

“এবং তারা তার শার্টের উপর মিথ্যা রক্ত নিয়ে এসেছিল। [জ্যাকব] বললেন, "বরং, তোমার আত্মা তোমাকে কিছুতে প্ররোচিত করেছে, তাই ধৈর্য্য সবচেয়ে উপযুক্ত..."

একজন যত বেশি মন্দ ষড়যন্ত্র করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এমনকি যদি তারা বাহ্যিকভাবে তাদের ইচ্ছা অর্জন করে, মহান আল্লাহ, তারা যে জিনিসটি চেয়েছিলেন তা উভয় জগতে তাদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবেন যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

"...*কিন্তু মন্দ চক্রান্ত তার নিজের লোক ছাড়া ঘিরে রাখে না। তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে?*

মাইগ্রেশনের পর ৭ ম বছর

খায়বারের যুদ্ধ

আপনার উত্তরাধিকার

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে তাকে মদিনার নিকটবর্তী খায়বারে বসবাসকারী একটি অমুসলিম উপজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ক্রমাগত তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের যে শান্তিচুক্তি ছিল তা অবিরাম ভঙ্গ করার কারণে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাদের দুর্গে পৌঁছে তিনি ঘোষণা করলেন যে পরের দিন তিনি তার ব্যানারটি এমন একজনকে দিতে যাচ্ছেন যিনি মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসেন এবং এই লোকটিও আল্লাহর প্রিয়। মহান, এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে এই ব্যক্তি খায়বার জয় করবে। পরের দিন তিনি আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠান এবং তাকে পতাকার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং খায়বার বিজয় হয়। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 251-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বিজয় থেকে কিছু জমি পেয়েছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জানতে চাইলেন, কীভাবে তা ব্যবহার করা যায়। তিনি তাকে একটি দাতব্য এনডোমেন্ট হিসাবে এটি স্থাপন করার পরামর্শ দেন। সম্পত্তি থেকে ফলন ক্রমাগত দরিদ্রদের দান করা হয়. এটি সহীহ বুখারী, 2773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, পার্থিব উত্তরাধিকার আসা-যাওয়া বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। ইসলাম শুধু মুসলমানদেরকে সৎকর্মের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য আশীর্বাদ পাঠাতে শেখায় না বরং এটি তাদের পিছনে একটি সুন্দর উত্তরাধিকার রেখে যেতে শেখায় যা থেকে লোকেরা উপকৃত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন একজন মুসলমান মারা যায় এবং দরকারী কিছু রেখে যায়, যেমন একটি জলের কূপ আকারে চলমান দাতব্য তারা এর জন্য সওয়াব পাবে। এটি সহীহ মুসলিম, 4223 নম্বর হাদিস থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত নেক আমল করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব ভালো কিছু পাঠানোর চেষ্টা করা উচিত, তবে তাদের পিছনে একটি ভাল উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত যা তারা মারা যাওয়ার পরে তাদের উপকার করবে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান তাদের সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে এতটাই উদ্বিগ্ন যে তারা কেবল তাদের পিছনে ফেলে চলে যায় যা তাদের সামান্যতম উপকারে আসে না। প্রত্যেক মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের নিজের জন্য একটি উত্তরাধিকার তৈরি করার জন্য তাদের কাছে প্রচুর সময় আছে কারণ মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের উপর

আঘাত করে। আজ সেই দিনটি যেটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করা উচিত। যদি এই উত্তরাধিকারটি ভাল এবং উপকারী হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তিনি তাদের তা করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু যদি এমন কিছু হয় যা তাদের উপকারে আসে না, তবে তাদের এমন কিছু প্রস্তুত করা উচিত যা তারা কেবল আখেরাতের জন্য কল্যাণই প্রেরণ করে না বরং কল্যাণও রেখে যায়। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত তাদের উত্তরাধিকার কি?

সফর (ওমরা)

দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর সপ্তম বছরে, তিনি সফর (ওমরা) পালনের জন্য মক্কার দিকে রওনা হন, যেমনটি আগের বছর মক্কার অমুসলিম নেতাদের সাথে একমত হয়েছিল। তাঁর কাছে খবর পৌঁছল যে, মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ এই খবর প্রচার করছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত কষ্ট ও কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। অমুসলিমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে প্রত্যক্ষ করার জন্য মহান আল্লাহর ঘর, কাবাঘরের কাছে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপর যারা সেদিন শক্তি প্রদর্শন করেছিল তাদের উপর মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য, তারা আংশিকভাবে আল্লাহর ঘর, মহান, কাবা প্রদক্ষিণ করার সময় চারপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 308-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি কোন ঘাটতি অর্থ, দুর্বলতা ছাড়া নম্রতা অবলম্বন করে তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। নম্র ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহকে বশ্যতা স্বীকার করে, গ্রহণ করে এবং আমল করে এবং এর মাধ্যমে তার দাসত্ব প্রমাণ করে। সত্যকে যখন তাদের কাছে

পেশ করা হয় তখন তারা তা সহজেই গ্রহণ করে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং কে তাদের কাছে তা পৌঁছে দেয় তা নির্বিশেষে। অর্থ, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না এই বিশ্বাস করে যে তারা ভাল জানে। তারা অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে দেখে না যে তারা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কাছে কোন পার্থিব জিনিস রয়েছে বা তাদের আনুগত্যের কারণে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য রয়েছে, কারণ তারা বুঝতে পারে যে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি বা অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি তাদের অজানা। অর্থাৎ, তারা মারা যেতে পারে যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন। এই বাস্তবতা একজন ব্যক্তিকে অহংকারের মারাত্মক পাপ থেকে বিরত রাখতে হবে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি সতর্ক করা হয়েছে। দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার অর্থ হল একজন মুসলমান সর্বদা অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিন্তু প্রয়োজনে নিজেকে রক্ষা করতে ভয় পায় না বা তাদের নম্রতা তাদের অপমানিত এবং অসম্মানিত বলে মনে করে না।

মাইগ্রেশনের ৪ ম বছর

মক্কা বিজয়

প্রথমে ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় সম্পাদিত শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে অন্য একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে মিত্র ছিল এমন একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মক্কার অমুসলিম নেতৃবৃন্দ অবগত হওয়ার পর যে এই খবর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছেছে, তখন তারা তাদের একজন নেতা আবু সুফিয়ানকে মদিনায় প্রেরণ করে, যাতে তারা চুক্তিটি পুনঃনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি নিয়ে চিন্তিত। আবু সুফিয়ান উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ অনেক সিনিয়র সাহাবীর সাথে কথা বলেছিল এবং তাদের জন্য নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। তিনি উপজাতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে জয় করার জন্য তাদের সাথে তার বিভিন্ন অনুষঙ্গ তালিকাভুক্ত করেছিলেন কিন্তু তারা সবাই একইভাবে উত্তর দিয়েছিল। তারা তাকে খুশি করার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে অস্বীকার করেছিল এবং মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চুক্তিটি পুনর্নবীকরণ করতে বা এটি পুনর্নবীকরণ করতে রাজি হতে চায়নি। তারা পরিবর্তে সিদ্ধান্ত তাদের নেতার উপর ছেড়ে দিয়েছিল যে তার

ঐশ্বরিক নির্দেশিত পছন্দের উপর আস্থা রেখেছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 381-382-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন, অন্য কোন কারণে নয়, মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্যের ভিত্তিতে অন্যদের সমর্থন এবং তাদের সমর্থন বন্ধ রাখতেন।

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলমানের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা। এটি প্রতিটি আশীর্বাদকে বোঝায় যা একজন অন্যকে দিতে পারে, যেমন শারীরিক এবং মানসিক সমর্থন শুধুমাত্র সম্পদ নয়। যখন কেউ দেয় তখন তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তা করবে যার অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে, যেমন আন্তরিক পরামর্শ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কারও অনুগ্রহ গণনা না করে অন্যদের সাথে এই দোয়াগুলি দেওয়া এবং ভাগ করা অন্তর্ভুক্ত কারণ এটি প্রমাণ করে যে তারা গ্রহণ করার জন্য দিয়েছে। অন্যদের থেকে কিছু। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 9:

"[বলেছি], "আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখের [অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য]। আমরা তোমাদের কাছে পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা চাই না।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিরত থাকা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের কাছে থাকা নিয়ামত যেমন ধন-সম্পদ, মহান আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় বিষয়গুলিতে অন্যদের থেকে আটকে রাখা। কে তাদের কাছ থেকে কিছু অনুরোধ করছে এই মুসলমান তা পর্যবেক্ষণ করবে না বরং তারা কেবল অনুরোধের পিছনে কারণটি মূল্যায়ন করবে। যদি কারণটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তারা আশীর্বাদ বন্ধ করে দেবে এবং কার্যকলাপে অংশ নেবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

এর মধ্যে রয়েছে গীবত করা বা ক্রোধ প্রকাশের মতো মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় নয় এমন বিষয়ে কথাবার্তা ও কাজ বন্ধ রাখা। এই মুসলিম তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কথা বলবে না এবং কাজ করবে না এবং শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতে অগ্রসর হবে যখন এটি মহান আল্লাহকে খুশি করবে, অন্যথায়, তারা অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং বিরত থাকবে।

করুণার সাথে অন্যদের পর্যবেক্ষণ করা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল যারা পবিত্রতার সাথে মিত্র ছিল। নবী মুহাম্মদ সা. যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাতিব ইবনে আবু বালতা রাদিয়াল্লাহু আনহু, একজন মহিলা বার্তাবাহককে মক্কায় একটি চিঠি দিয়ে অমুসলিমদের জানিয়েছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় যাচ্ছেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই চিঠির বিষয়ে ঐশ্বরিকভাবে অবহিত করা হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ আলী ইবনে আবু তালিব, মিকদাদ বিন আমর এবং জুবায়ের বিন আওয়ামকে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা তাকে বাধা দেয় এবং তাকে ফিরিয়ে আনতে। মক্কায় পৌঁছানোর আগেই চিঠি। পরিকল্পনাটি সফল হয়েছিল এবং চিঠিটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, যিনি তখন হাতিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। হাতিব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ধর্মত্যাগ করেননি বা ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস পছন্দ করেননি তবে তিনি কেবল চিঠিটি লিখেছিলেন কারণ মক্কায় তাঁর এমন কেউ নেই যে সেখানে তাঁর পরিবার এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে এবং বিশ্বাস করেছিল যে চিঠির মাধ্যমে তিনি লাভ করবেন। তাদের অনুগ্রহ এবং ফলস্বরূপ তারা তার পরিবার ও সম্পত্তির ক্ষতি করবে না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত করেছেন যে তিনি সত্য বলেছেন। উমর ইবনে খাত্তাব, হাতিবকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, আল্লাহ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, কিন্তু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি বদর যুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং মহান আল্লাহ ইতিমধ্যেই যুদ্ধ করেছেন। বদর যুদ্ধের সকল অংশগ্রহণকারীকে ক্ষমা করে দেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর

জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 379 এবং সহীহ বুখারি, নম্বর 3007-এ পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ 60 মুমতাহানা, আয়াত 1 নাজিল করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর, অথচ তারা অবিশ্বাস করেছে যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে, নবীকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে বহিষ্কার করেছে [কেবল] কারণ তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। , তোমার প্রভু। আপনি যদি আমার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ/প্রয়াস এবং আমার অনুমোদনের উপায় খোঁজার জন্য বেরিয়ে আসেন, [তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবেন না]। আপনি তাদের প্রতি স্নেহ [অর্থাৎ, নির্দেশ] প্রকাশ করেন, কিন্তু আপনি যা গোপন করেছেন এবং যা প্রকাশ করেছেন তা আমি সবচেয়ে বেশি জানি। আর তোমাদের মধ্যে যে এটা করবে সে অবশ্যই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।"

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী'স, দ্য নোবেল লাইফ অফ দ্য নবী (সাঃ) এর ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 1684-1685-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও হাতিবের উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, মন্দ ছিল না, কারণ তিনি তাঁর পরিবার এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে জানতেন যে অমুসলিমদের কাছে তাঁর চিঠি মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনায় কোনও পার্থক্য করবে না, যেহেতু মক্কার অমুসলিমরা ইতিমধ্যেই এই ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল, তাই তার উচিত ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিক থাকা এবং নিজের পরিবার ও সম্পদ মহান আল্লাহর কাছে অর্পণ করা।

এই একক ভুলের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সমগ্র জীবন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে গেছেন এবং তাই এই একটি ভুলকে উপেক্ষা করেছেন।

সমস্ত মুসলমানরা আশা করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা

যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

সমবেদনা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে, মক্কার অমুসলিম নেতারা হুদাইবিয়ায় তাদের শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে একটি গোত্রকে সমর্থন করে যারা অন্য একটি গোত্রকে আক্রমণ করেছিল যারা পবিত্রতার সাথে মিত্র ছিল। নবী মুহাম্মদ সা. যুদ্ধবিরতি মাত্র 18 মাস স্থায়ী হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশাল মুসলিম বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিল, তখন সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে তারা সেদিন মক্কা জয় করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন যে, মক্কার অমুসলিমদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহে প্রবেশ করবে সে মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে কেউ নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রাখবে নিরাপদ থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত যে কেউ আল্লাহর ঘর, কাবা শরীফে আশ্রয় চাইবে, সে মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে নিরাপদ থাকবে। তিনি সেনাবাহিনীকে শুধুমাত্র তাদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু কয়েকজনকে তালিকাভুক্ত করেছিল যাদেরকে পাওয়া গেলে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে। এই লোকেদের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়নি কারণ তাদের অপরাধগুলি অত্যন্ত বড় ছিল, যেমন রাষ্ট্রদ্রোহ, যা এই দিন এবং যুগেও একটি মূলধনের অপরাধ। উদাহরণ স্বরূপ, কয়েক বছর আগে মিকিয়াস বিন সুবাবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদিনায় আসেন। তিনি তার মুসলিম ভাই হিশাম বিন সুবাবার পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যিনি একটি যুদ্ধের সময় ঘটনাক্রমে একজন মুসলিম দ্বারা নিহত হন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছ থেকে এই অর্থ পাওয়ার পর, তিনি সেই মুসলিম সৈনিককে হত্যা করেছিলেন যে ঘটনাক্রমে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। মিকিয়াস তখন মক্কায় পালিয়ে যান যেখানে তিনি ধর্মত্যাগ করেন। মিকিয়াসকে মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

করেছিলেন কারণ তিনি দুটি মূলধর্মী অপরাধ করেছিলেন, উভয়ের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। প্রথমটি ছিল মুসলিম সৈন্যকে হত্যা, বিশেষ করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পর এবং অন্যটি ছিল ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মত্যাগ করার জন্য। তাকে মক্কায় পাওয়া যায় এবং হত্যা করা হয়। তাঁর সম্পর্কে, মহান আল্লাহ, অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 93 নাজিল করেছেন:

"কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার প্রতিফল হল জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"

আব্দুল উজা বিন খাতাল নামে আরেক ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং যখন তাকে একটি গ্রাম থেকে বাধ্যতামূলক দান সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়, তখন তাদের মধ্যে বিবাদের কারণে সে একজন মুসলমানকে হত্যা করে। এরপর তিনি ধর্মত্যাগ করেন এবং অমুসলিমদের কাছে পালিয়ে যান এবং এমনকি দুই মহিলা গায়ককে নিযুক্ত করেন পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অবমাননাকর কবিতা রচনা করার জন্য।

উপরন্তু, যখন মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে, তখন ইসলাম থেকে ধর্মত্যাগ করার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের একজন আবদুল্লাহ ইবনে সাদ, একজন সাহাবী উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পালিয়ে যান এবং তার নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি পালাক্রমে লোকটিকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর পক্ষে আবেদন করলেন। যদিও তার অপরাধ গুরুতর ছিল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর

জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 212-213 এবং 402, ইমাম সাফি উর রহমানের, দ্য সিলড নেক্টার, পৃষ্ঠা 396-397 এবং ইমাম ওয়াহিদীর, আসবাব আল নুজুল, 4-এ আলোচনা করা হয়েছে: 93, পৃষ্ঠা 59।

পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস জুড়ে, মুসলমানদেরকে অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যারা সৃষ্টির প্রতি করুণা করে তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত করবেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, করুণা দেখানো শুধুমাত্র নিজের কাজের মাধ্যমে নয়, যেমন গরীবদের সম্পদ দান করা। এটি প্রকৃতপক্ষে একজনের জীবনের প্রতিটি দিক এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন একজনের কথা। এই কারণেই মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন যারা দাতব্য দান করে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে যে তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে করুণা দেখাতে ব্যর্থ হওয়া, যেমন অন্যদের প্রতি করা তাদের অনুগ্রহ গণনা করা, শুধুমাত্র তাদের পুরস্কার বাতিল করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

সত্যিকারের করুণা সব কিছুতে দেখানো হয়: একজনের মুখের অভিব্যক্তি, একজনের দৃষ্টি এবং তাদের কথার স্বর। এটি ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রদর্শিত সম্পূর্ণ করুণা, এবং তাই মুসলমানদের অবশ্যই কাজ করতে হবে।

উপরন্তু, করুণা প্রদর্শন করা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও অগণিত সুন্দর ও মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তবুও যা মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতি মানুষের হৃদয় ও ইসলাম ছিল রহমত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

“অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

এটা স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, করুণা ছাড়া মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পালিয়ে যেত। তার প্রতি যদি এমনই হয়, যদিও তার মধ্যে অগণিত সুন্দর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদিও মুসলমানরা, যাদের মধ্যে এমন মহৎ বৈশিষ্ট্য নেই, তারা সত্যিকারের করুণা না দেখিয়ে অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি করে?

সহজ কথায়, মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেমন তারা আল্লাহ, মহান এবং অন্যদের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা নিঃসন্দেহে সত্য এবং পূর্ণ করুণার সাথে।

হুনাইনের যুদ্ধ

অসুবিধায় অবিচল

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী অভিভূত হয় এবং কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাদের একজন যারা তার অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। অবশেষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে তাদের ডেকে আনার পর, তারা সবাই এগিয়ে গেল যতক্ষণ না মহান আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 451 এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 109-110 এ আলোচনা করা হয়েছে।

জীবনে একজন মুসলমান সর্বদাই হয় স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বা কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। কিছু অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে কেউই কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অনুভব করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যদিও সংজ্ঞা অনুসারে অসুবিধাগুলি মোকাবেলা করা কঠিন, তবে তারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও দাসত্ব অর্জন এবং প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। উপরন্তু,

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন তারা যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলির মুখোমুখি হয় তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ জীবনের পাঠ শিখে। এবং লোকেরা প্রায়শই স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ের চেয়ে অসুবিধার সময়গুলি অনুভব করার পরে আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল এটির প্রতি চিন্তা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে আলোচনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই অসুবিধা জড়িত। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সত্যিকারের মহত্ত্ব সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়গুলি অনুভব করার মধ্যে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থাকা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। এটা এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত প্রতিটি বড় কঠিন সমস্যাই তাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্যের সাথে শেষ হয় যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং একজন মুসলমানের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয় কারণ এইগুলি তাদের জন্য উজ্জ্বল হওয়ার মুহূর্ত এবং আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রকৃত দাসত্ব স্বীকার করে। এটি উভয় জগতে চূড়ান্ত সাফল্যের চাবিকাঠি।

তায়েফ অবরোধ

নম্রতা এবং দ্বিতীয় সম্ভাবনা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হুনাইনের বিজয়ের পর কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তায়েফের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। তায়েফের অমুসলিমরা প্রায় 30 দিন অবরুদ্ধ ছিল কিন্তু তারা পরাজিত হয়নি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর মুসলিম বাহিনীকে তায়েফ থেকে সরে যেতে নির্দেশ দেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য দোয়া করেন। সম্ভবত, মহান আল্লাহ তায়েফের মুসলমানদেরকে তায়েফ জয় করতে বাধা দিয়েছিলেন, কারণ মদিনায় হিজরতের আগে, যেখানে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়েফবাসীদের ধ্বংস করার বিকল্প দেওয়া হয়েছিল কারণ তার সাথে তাদের দুর্ব্যবহার। কিন্তু তিনি এই বিকল্পটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিবর্তে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তারা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করবে। এটি সহীহ বুখারি, 3231 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। সুরক্ষার এই পছন্দটি অব্যাহত ছিল এবং মুসলমানদের তায়েফ জয় করতে বাধা দেয়।

উপরন্তু, তায়েফের লোকেরা শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের দেওয়া এই দ্বিতীয় সুযোগটি গ্রহণ করে সত্যকে গ্রহণ করার জন্য এবং মদিনায় একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করতে এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। . ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 3, পৃষ্ঠা 476-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তার জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করেন না যে এটির যোগ্য নম্রতার কারণে। পরিবর্তে তিনি তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার এবং তাদের আচরণ সংশোধন করার সুযোগ দেন। যে মুসলমান এটি বুঝতে পারে সে কখনই মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়বে না, তবে সীমা অতিক্রম করবে না এবং মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা অবলম্বন করবে না, তাদেরকে কখনই শাস্তি দেবে না। তারা বুঝতে পারে যে শাস্তি কেবল বিলম্বিত হয় যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই এই ঐশী নাম একজন মুসলমানের মধ্যে আশা ও ভয়ের সৃষ্টি করে। একজন মুসলমানের উচিত এই বিলম্বকে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য এবং ভাল কাজের দিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহার করা।

একজন মুসলমানের উচিত এই স্বর্গীয় গুণাবলীর উপর কাজ করা উচিত মানুষের সাথে নম্র হয়ে বিশেষ করে যখন তারা খারাপ চরিত্র প্রদর্শন করে। তাদের উচিত অন্যদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা যেমন তারা মহান আল্লাহকে তাদের উদাসীনতার মুহুর্তে তাদের সাথে নম্র হতে চায়। কিন্তু একই সাথে তাদের নিজেদের খারাপ বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের নমনীয় হওয়া উচিত নয় যে পাপের শাস্তি বিলম্বিত হয় তা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা হয় না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দিয়ে তাদেরও নম্রতায় অবিচল থাকতে হবে। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 34:

“এবং ভাল কাজ এবং মন্দ সমান নয়। যা উত্তম তার দ্বারা [মন্দকে] প্রতিহত করুন; আর তখন যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে যেন একজন একনিষ্ঠ বন্ধু।”

মন্দের প্রতি আপত্তি

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর অষ্টম বছরে মক্কা নগরী বিজিত হয়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি অমুসলিম উপজাতি হাওয়াজিন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, যারা তাকে আক্রমণ করার জন্য জড়ো হয়েছিল। এটি শেষ পর্যন্ত হুনাইনের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। হুনাইনের বিজয়ের পর কিছু অমুসলিম শত্রু তায়েফ শহরে পশ্চাদপসরণ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর তায়েফের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানের পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ফিরে আসেন। যুদ্ধের গনীমতের মাল বন্টন করার সময় ধু আল খুওয়াইসিরা নামক একজন মুনাফিক মন্তব্য করেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ন্যায়পরায়ণতা করছেন না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উত্তর দিলেন যে, তিনি যদি ন্যায়বিচার না করেন তাহলে কে করবে? উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই সুস্পষ্ট মুনাফিককে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মন্তব্য করেন যে এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত একটি বিদ্রোহী দলকে নেতৃত্ব দেবে যারা প্রবেশ করবে এবং প্রস্থান করবে। ইসলামের ঈমান ঠিক যেমন একটি তীরের লক্ষ্য থেকে প্রবেশ করে এবং বের হয়। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 3, পৃষ্ঠা 492-493-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ধরনের স্পষ্ট ব্লাসফেমির শাস্তি মৃত্যু, যা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন। উপরন্তু তার প্রতিক্রিয়া মন্দের প্রতি আপত্তি করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সকল প্রকারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। তাদের শক্তি এবং উপায় অনুযায়ী মন্দ. এই হাদিসে বর্ণিত সর্বনিম্ন স্তর হল মন্দকে অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা।

এটি দেখায় যে অভ্যন্তরীণভাবে খারাপ কাজগুলিকে অনুমোদন করা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4345 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ সংঘটিত হলে উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে সে সেই ব্যক্তির মতো যে উপস্থিত ছিল না। . কিন্তু যে অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজটি অনুমোদন করেছে সে সেই ব্যক্তির মত যে এটি করার সময় উপস্থিত ছিল।

মন্দের প্রতি আপত্তি করার প্রথম দুটি দিক, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হল একজনের শারীরিক কাজ ও কথাবার্তা। এটি শুধুমাত্র একজন মুসলিমের উপর একটি কর্তব্য যার তা করার শক্তি আছে উদাহরণস্বরূপ, তারা তাদের কাজ বা কথার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নিজের হাত দিয়ে মন্দকে আপত্তি করা মানে লড়াই করা নয়। এটি অন্যের মন্দ কাজগুলিকে সংশোধন করাকে বোঝায়, যেমন বেআইনিভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে এমন কারো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি এখনও এটি করার অবস্থানে রয়েছে, সে তা করা থেকে বিরত থাকে তাকে একটি শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4338 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

মহানবী (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তারা যেন সৃষ্টিকে ভয় না করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সৃষ্টির ভয়কে তাদের মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করা থেকে বিরত রাখতে দেয় তাকে সেই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজেকে ঘৃণা করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা সমালোচিত হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4008 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি উল্লেখ্য যে, এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় না যে ক্ষতির ভয়ে চুপ থাকে কারণ এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত, তবে এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে নীরব থাকে কারণ মানুষ তাদের চোখে ধরে রাখে স্ট্যাটাস।

সুনানে আবু দাউদ, 4341 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি যখন অন্যরা তাদের লোভের আনুগত্য করে, তাদের ভুল মতামত ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে এবং যখন তারা পরকালের চেয়ে বস্তুগত দুনিয়াকে পছন্দ করে তখন তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে আপত্তি করা ছেড়ে দিতে পারে। এই সময়টা এসে গেছে বলে শেষ করতে পণ্ডিত লাগে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105।

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."

তবে এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা উচিত কারণ এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এবং তারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে যা অনুভব করে তাদের প্রতি এটি একটি কর্তব্য। থেকে নিরাপদ, কারণ এটি উচ্চতর মনোভাব।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্ট যে মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করাকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ, এটি মুসলমানদেরকে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না যাতে আপত্তি করার মতো খারাপ জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু নিষিদ্ধ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"ওহে যারা ঈমান এনেছ... গুপ্তচরবৃত্তি করো না..."

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে হবে, তাদের ইচ্ছার উপর নয়। একজন মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, যখন তারা নয়। এটা প্রমাণিত হয় যখন তারা মন্দের বিরুদ্ধে এমনভাবে আপত্তি করে যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যা ভাল কাজ বলে মনে করা হয় তা পাপ হয়ে যেতে পারে।

একজন মুসলমানকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মৃদু ও ন্যায্যভাবে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতটি কেবলমাত্র মানুষকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে দূরে ঠেলে দেবে এবং তাদের ক্রোধের ফলে আরও পাপ হতে পারে।

মাইগ্রেশনের পর 9 ম বছর

তাবুকের যুদ্ধ

সত্য ভক্তি

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রচণ্ড গরম ও অস্বস্তির সময়ে তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। উপরন্তু, যাত্রা দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠিন হবে. এই অভিযানে মোট 30,000 সৈন্য তার সাথে যোগ দেয় কিন্তু কেউ কেউ অবহেলা বা ভন্ডামি থেকে পিছিয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ তাদের সমালোচনা করে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত নাজিল করেছেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 1 এ আলোচনা করা হয়েছে।

এই মহান অভিযানে রওয়ানা হওয়ার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনাবাসীকে এতে আর্থিকভাবে অবদান রাখতে উৎসাহিত করেছিলেন। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অর্ধেক সম্পদ দান করেন। অথচ, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তার পরিবারের জন্য কী রেখে গেছেন , তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি মহান আল্লাহ এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের জন্য রেখে গেছেন। জামে আত তিরমিযী, ৩৬৭৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগের প্রতি তাদের উদ্যমের ইঙ্গিত দেয়। এই ঘটনাটি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92 এর সাথে যুক্ত:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারে না যার অর্থ, তারা তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি ধারণ করবে, যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক হয়। যদিও অনেকে বিশ্বাস করে যে এই আয়াতটি সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আরও অনেক বেশি। এটি প্রত্যেকটি দোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে যা একজন মুসলিম পছন্দ করে এবং ভালোবাসে। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানরা তাদের খুশির জিনিসগুলিতে তাদের মূল্যবান সময় উৎসর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের

বাইরে যা দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডে তাদের শারীরিক শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি, তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটি উৎসর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে, লোকেরা এমন জিনিসগুলিতে চেষ্টা করতে পেরে খুশি যা তারা কামনা করে যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যা তাদের প্রয়োজন হয় না যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত সময় করতে হবে এবং তাদের ঘুম ত্যাগ করতে হবে তবুও কতজন আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এইভাবে চেষ্টা করে। তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে উচুঁ? কতজন স্বেচ্ছায় নামাজ পড়ার জন্য তাদের মূল্যবান ঘুম ছেড়ে দেয়?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে উৎসর্গ করবে। কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব সত্যিই অদ্ভুত.

ধৈর্য এবং তৃপ্তি

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রচণ্ড গরম ও অস্বস্তির সময়ে তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। উপরন্তু, যাত্রা দীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠিন হবে. এই অভিযানে মোট 30,000 সৈন্য তার সাথে যোগ দেয় কিন্তু কেউ কেউ অবহেলা বা ভন্ডামি থেকে পিছিয়ে পড়ে। যাত্রাকালে সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছিল। সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তাদের জল-পরিবহন উট জবাই ও খাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তারা পারার আগেই উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এর ফলে পরিবহনের ঘাটতি হবে। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সমস্ত খাবার জোগাড় করে তাতে বরকতের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও এই পরামর্শে সম্মত হলেন এবং অলৌকিকভাবে অল্প পরিমাণ খাবার তাদের সমস্ত পাত্রে ভরে গেল এবং তারা সবাই তৃপ্তির সাথে খেয়ে ফেলল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 11-12 এ আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহজেই তাদের উট নিজে জবাই করার পরিবর্তে দোয়া করার পরামর্শ দিতে পারতেন। তার

আচরণের পিছনে একটি প্রজ্ঞা হল মহান আল্লাহর পছন্দ ও আদেশের সাথে সন্তুষ্টির গুরুত্ব শেখানো।

ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য হল যে ধৈর্যশীল সে পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করে না বরং পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং এমনকি প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে, যে সন্তুষ্ট সে তাদের নিজের পছন্দের চেয়ে মহান আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দেয় এবং তাই কিছু পরিবর্তন করতে চায় না। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট জবাই করার অনুমতি না দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে সহজে প্রার্থনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সম্ভাব্যভাবে মহান আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধিতা করতে চাননি, কারণ আল্লাহ হয়তো তাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছিলেন। যদিও একটি প্রার্থনা বৈধ হত তবুও তিনি মহান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ দাসত্ব করতে চেয়েছিলেন এবং তাই মহান আল্লাহর পছন্দের উপর আস্থা রেখে নীরব ছিলেন। অনুরোধ করার পরই তিনি দো‘আ করলেন। শেখার শিক্ষা হল যে, যদিও কিছু পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদে কষ্টদায়ক বোধ করে, যা ঘটে তা একজন মুসলমানের জন্য তাদের ইচ্ছার চেয়ে উত্তম, যদিও তারা তাদের পিছনের জ্ঞান অবিলম্বে লক্ষ্য না করে। একজন মুসলিমকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর কারণ হতে পারে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া। তাই মহান আল্লাহর হুকুম নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকলে অন্তত ধৈর্যধারণ করা জরুরি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ..."

একজন মুসলমানকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, যিনি তাদের জন্য পরিস্থিতি বেছে নিয়েছেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ, তিনিই একমাত্র তিনিই তাদের নিরাপদে সেখান থেকে বের করে আনতে পারেন। এটি কেবলমাত্র তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"... আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।"

একটি ধন্য কবর

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। অভিযানের সময় একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে আলো দেখতে পেলেন। যখন তিনি অনুসন্ধানের জন্য সেখানে যান তখন তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), আবু বক্কর এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পান, তিনি একজন সাহাবী যুল বিজাদায়েনের জন্য একটি কবর খনন করছেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, যিনি মারা গেছেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কবরে ছিলেন তখন আবু বক্কর ও উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যুল বিজাদায়েন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃতদেহকে কবরে নামিয়েছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দেহকে কবরে সঠিকভাবে স্থাপন করার পর তিনি মহান আল্লাহকে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যেভাবে তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই বলতেন যে, তিনি তাঁর কবর হতে চান। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 22-23-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন

করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তখন তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আমল। একজন মুসলমান যদি মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তাহলে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রয়োজনীয় কাজগুলো প্রস্তুত করবে। তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে দীর্ঘ সময় থাকা। এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

তাবুকের নবীর খুতবা

একটি ব্যাপক পরামর্শ

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর নবম বছরে মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, যেমন খবর পৌঁছায়। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। এর ফলে তাবুকের যুদ্ধ হয়। অভিযানটি যখন তাবুকে পৌঁছে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নোক্ত ভাষণ দেন: "হে মানুষ, সবচেয়ে সত্য কথা হল মহান আল্লাহর কিতাবের। বন্ধনের দৃঢ়তম হল শব্দ (বিশ্বাসের সাক্ষ্য)। সর্বোত্তম ধর্ম হলো হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। জীবনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। সর্বোত্তম বাণী হল মহান আল্লাহর স্মরণ। সর্বোত্তম বর্ণনা হল পবিত্র কুরআন। সর্বোত্তম অভ্যাস হল যেগুলো মহান আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত। অভ্যাস খারাপ যারা উদ্ভাবিত হয়. সর্বোত্তম পথনির্দেশ হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সবচেয়ে মহৎ মৃত্যু হচ্ছে শহীদ হিসেবে। সবচেয়ে অন্ধ হচ্ছে হেদায়েতের পর পথভ্রষ্ট হওয়া। সর্বোত্তম আমল হল সেই কাজ যা উপকারী। সর্বোত্তম নির্দেশনা হল যা অনুসরণ করা হয় (উদ্ভাবিত নয়)। সবচেয়ে খারাপ অন্ধত্ব (আধ্যাত্মিক) হৃদয়ের। উপরের হাত (দানকারী) নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (যে ব্যক্তি দান করে)। যা সামান্য হলেও যথেষ্ট তা তার চেয়ে উত্তম যা অনেক কিন্তু অপচয়কারী। মৃত্যু যখন সামনে থাকে তখন সবচেয়ে খারাপ ক্ষমা চাওয়া হয়। বিচার দিবসে এর চেয়ে খারাপ অনুতাপ। এমন লোক আছে যারা শুধুমাত্র জুমার নামাজের শেষে অংশ নেয়। এমন কিছু লোক আছে

যারা শুধু মহান আল্লাহকে অযথাই স্মরণ করে। গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিহ্বা হল মিথ্যা কথা বলা। সর্বোত্তম সম্পদ হল আত্মার (তৃপ্তি)। সর্বোত্তম গুণ হল তাকওয়া। জ্ঞানের পরাক্রম হল মহান আল্লাহকে ভয় করা। অন্তরের মধ্যে সর্বোত্তম গুণ হল নিশ্চিততা (বিশ্বাস)। সন্দেহ করা কুফর থেকে। শোকে বিলাপ করা জাহেলিয়াতের যুগ (প্রাক-ইসলামী যুগ) থেকে একটি কাজ। জালিয়াতি জাহান্নামে ছড়িয়ে মাটির হয়. (বেশিরভাগ) কবিতা শয়তান থেকে আসে। মদ পাপের সমষ্টি। নারী (পুরুষের জন্য এবং নারীর জন্য পুরুষ) শয়তানের ফাঁদ। যৌবন হল উন্মাদনার একটি শাখা (নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে)। সবচেয়ে খারাপ আয় সুদ থেকে। নিকৃষ্ট খাদ্য এতিমের সম্পদ গ্রাস করছে। সুখী মানুষ হল সেই ব্যক্তি যাকে অন্যের (কর্ম) দ্বারা সতর্ক করা হয়। তোমাদের একজনকে পরকালের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য (মৃত্যুর) জন্য চার হাত দূরে সরে যেতে হবে। একটি কর্মের মৌলিকতা তার ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত হয়। আখ্যানের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল অসত্য। যা আসতে হবে সবই হাতের কাছে। মুমিনের নামে শপথ করা একটি ক্ষোভ। মুমিনের সাথে যুদ্ধ করা কুফর। তার গোশত খাওয়া (গীবত) মহান আল্লাহর অবাধ্যতা। তার সম্পত্তির পবিত্রতা তার রক্তের পবিত্রতার মতো। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নামে (মিথ্যা) শপথ করে, সে তার প্রতি মিথ্যারোপ করে। যে তার ক্ষমা চাইবে তাকে ক্ষমা করা হবে। যে ক্ষমা করবে, মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি রাগকে দমন করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা পুরস্কার দেবেন। যে ব্যক্তি বিপদাপদে অটল থাকবে, মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষতিপূরণ দেবেন। যে ব্যক্তি খ্যাতি কামনা করে, মহান আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন। যে ব্যক্তি অটল থাকবে, মহান আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অমান্য করবে, মহান আল্লাহ পাক তিনি শাস্তি দেবেন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। হে মহান আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। আমি নিজের জন্য এবং আপনার জন্য ক্ষমা চাই।" ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 16-17 এ আলোচনা করা হয়েছে।

মাইগ্রেশনের **পর দশম বছর**

বিদায়ী পবিত্র তীর্থযাত্রা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 152-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারি, 1773 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, পবিত্র তীর্থযাত্রার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

পবিত্র তীর্থযাত্রার আসল উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে তাদের পরকালের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা। যেভাবে একজন মুসলমান পবিত্র তীর্থযাত্রা করার জন্য তাদের বাড়ি, ব্যবসা, সম্পদ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক মর্যাদা রেখে যায়, এটি তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে যখন তারা তাদের পরকালের শেষ যাত্রা করবে। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির পরিবার এবং সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল তাদের ভাল-মন্দ, তাদের সাথে থাকে।

যখন একজন মুসলমান তাদের পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় এটি মনে রাখে তখন তারা এই দায়িত্বের সমস্ত দিক সঠিকভাবে পালন করবে। এই মুসলিম একটি পরিবর্তিত ব্যক্তি হিসাবে দেশে ফিরে আসবে কারণ তারা এই জড় জগতের অতিরিক্ত দিকগুলিকে একত্রিত করার চেয়ে পরকালে তাদের চূড়ান্ত যাত্রার প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেবে। তারা মহান আল্লাহর হুকুম পালনে সচেষ্ট থাকবে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করবে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের পূর্ণ করার জন্য দুনিয়া থেকে নেয়া। প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন অপচয়, অত্যধিকতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়া।

মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রাকে ছুটির দিন এবং কেনাকাটা করার জায়গা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় কারণ এই মনোভাব এর উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয়। এটা অবশ্যই মুসলমানদের পরকালে তাদের শেষ যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেবে যে যাত্রার কোনো প্রত্যাবর্তন নেই এবং দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই। শুধুমাত্র এটিই একজনকে পবিত্র তীর্থযাত্রা সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে এবং পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

কোন ক্ষতি করোনা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। পবিত্র তীর্থযাত্রার (হজ)-এর একটি দিক হল কালো পাথরকে স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা যা আল্লাহর ঘর, কাবার সাথে সংযুক্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি একজন শক্তিশালী মানুষ ছিলেন তবুও কালো পাথরে পৌঁছানোর জন্য তার ধাক্কাধাক্কি করা উচিত নয় কারণ এটি ক্ষতির কারণ হতে পারে। অন্যান্য। মানুষের ভিড়ের কারণে যদি তিনি কালো পাথরে যাওয়ার পথ খুঁজে না পান তবে তাকে দূর থেকে সালাম দিতে হবে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 228-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও কালো পাথরে পৌঁছানো একটি উপাসনার কাজ তবুও একজন মুসলমানকে এই প্রক্রিয়ায় অন্যদের ক্ষতি করার অনুমতি দেওয়া হয় না। এটি অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে। সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে

তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত

বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

মাইগ্রেশনের 11 তম বছর

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শেষ অসুস্থতা

ব্যবহারিক রোল মডেল এস

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। তার অসুস্থতা তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি একজন সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে জামআ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আদেশ দেন যে, তিনি যেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জামাতের ইমামতি করতে বলেন। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন তিনি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে খুঁজে পেলেন না এবং সালাত দেরি করতে না চাইলে তিনি উমর ইবনে খাত্তাবকে বললেন তাকে, পরিবর্তে প্রার্থনা নেতৃত্ব. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন প্রার্থনা শুরু করেন তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্ঠস্বর শুনে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ, মহান এবং মুসলমানরা আবু বক্কর (রাঃ) ছাড়া অন্য কাউকে প্রত্যাখ্যান করেন না। তাকে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন উপস্থিত হলেন এবং লোকদের সাথে সালাত আদায় করলেন। পরবর্তীতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ বিন জামা'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমালোচনা করেন, যেহেতু তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিশ্বাস করতেন, তাঁকে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দেন, অন্যথায় তিনি কখনই নামায পড়তেন না। তাই করেছে আবদুল্লাহ, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ক্ষমা চেয়েছিলেন কিন্তু যোগ করেছিলেন যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সময় মসজিদ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন,

তিনি বিশ্বাস করতেন যে আবু বকরের পরে উমরের চেয়ে নামাজের ইমামতি করার যোগ্য আর কেউ নেই। , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন. ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 332-333-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, এই ঘটনাটি, অন্য অনেকের মতো, স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রথম খলিফা হওয়ার পছন্দের পছন্দ ছিলেন। উপরন্তু, এই বিশেষ ঘটনাটি এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে এটি এমনকি ইঙ্গিত দেয় যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হবে।

লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই ধার্মিক আত্মাদের নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল কারণ তারা একজন ভাল নেতার গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই গুণটি সকল মুসলমানেরই গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত কারণ প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমান এবং অমুসলিমদের জন্য ইসলামের প্রতিনিধি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামী জ্ঞানের সমাবেশে যোগদানের জন্য একজনকে কয়েকদিন ভ্রমণ করতে হতো কিন্তু এখন অনলাইনে অসংখ্য বক্তৃতা পাওয়া যায়। তথাপি, ধার্মিক পূর্বসূরিদের চলে যাওয়ার পর থেকে সঠিক পথ সম্পর্কে অজ্ঞতা বেড়েছে। এর কারণ হল, কেউ কেউ পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস মুখস্থ করে জ্ঞান অর্জন করেছেন, কিন্তু তাদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করতে ব্যবহার করেননি। অর্থ, তারা তাদের জ্ঞানের উপর আমল করেনি। যারা এরূপ কাজ করবে তারা তাদের উপদেশের মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ে প্রভাব ফেলার শক্তি হারাবে। কিছু লেকচারার হল নিউজ

বুলেটিনগুলির মতো যেগুলি অন্যদেরকে কাজ করার জন্য উদ্দীপিত না করে শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করে যার ফলে তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে অন্যদেরকে গাইড করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। অমুসলিমরা মূলত একজন সফল মুসলমানের বাস্তব উদাহরণ না দেখে ইসলামের নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করছে। যারা ইসলাম প্রচার করতে চায় তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

যখন কেউ এইভাবে কাজ করে তখন একটু সঠিক জ্ঞান নিজের এবং অন্যদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। যদিও, যারা এই সঠিক মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের কাছে আরও জ্ঞান থাকতে পারে তবে এটি কারও উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। পবিত্র কুরআনে এই ধরনের ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

সবচেয়ে জ্ঞানী

উমর ইবনে খাত্তাব, সমস্ত সাহাবীদের মতো, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং আমল করার জন্য নিবেদিত ছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তিনি এই এবং অন্যান্য অনেক বরকতময় জিনিসগুলিতে তাদের অনেককে ছাড়িয়ে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, আবু বক্কর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত অন্য কেউ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় আইনগত বিধান জারি করবেন না। তাকে। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 18-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না । তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

পারস্পরিক পরামর্শ

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে নিম্নলিখিত আয়াতটি বিশেষভাবে আবু বক্কর এবং উমর ইবনে খাত্তাবকে নির্দেশ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং সাধারণত অন্যদের জন্য। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

"সুতরাং আল্লাহর রহমতে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], আপনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন... এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করুন..."

ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৮ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

নবুওয়াতের হেফাজত করা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে আবু বকর এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সাধারণভাবে অন্যদের জন্য। অধ্যায় 66 তাহরীমে, আয়াত 4:

"...কিন্তু যদি তুমি তার [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বিরুদ্ধে সহযোগিতা কর - তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তার অভিভাবক, জিব্রাইল এবং মুমিনদের সৎকর্মশীল..."

ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৮-২৯ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করার সারমর্ম হল আন্তরিকতা।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি

আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাই] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যু

মহান আল্লাহর প্রতি ভক্তি

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। তাঁর অসুস্থতার আগে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে কোন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু দ্বারা গৃহীত হবে না যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর বিশ্রামের স্থান দেখতে পান এবং জীবনের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়। এবং মৃত্যু। সহীহ বুখারী, 4428 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইঙ্গিত করেছিলেন যে কয়েক বছর আগে খায়বারে তাকে যে বিষ দেওয়া হয়েছিল তা তাকে যন্ত্রণা দিয়েছিল এবং অনুভব করেছিল যে এটি থেকে তিনি মারা যাবেন। এটা ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। তার অন্তিম মুহুর্তে, তিনি আকাশের দিকে তার দৃষ্টি তুলে ধরেন এবং সর্বোচ্চ সঙ্গীর কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে, মহান আল্লাহর কাছে। তিনি মারা যাওয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল 63 বছর। তাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল একটি উঁচু জায়গায়, জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু এবং সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্তরে। ইমাম ইবনে কাসীরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 343-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর

ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে

এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। পরিস্থিতি

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষণস্থায়ী আবাস থেকে চিরতরে স্বস্তিতে নিয়ে গিয়েছিলেন জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু ও সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্তরে একটি উঁচু স্থানে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"... আশা করা যায় যে তোমার প্রভু তোমাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

এবং অধ্যায় 93 আদ দুহা, আয়াত 4-5:

" এবং পরকাল তোমাদের জন্য প্রথম জীবনের চেয়ে উত্তম। আর তোমার প্রতিপালক তোমাকে দিবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে।"

তিনি তার দায়িত্ব সম্পন্ন করার পর মহান আল্লাহ তাকে অর্পণ করেছিলেন। তিনি তার জাতিকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং উভয় জগতের সর্বোত্তম দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে ও আখেরাতে যা তাদের ক্ষতি করতে পারে তা থেকে তাদের বিরত রেখেছিলেন। সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক আল্লাহর শেষ রাসুল, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

সাঃ) এর মৃত্যুর পরের জীবন

আবু বক্কর (রাঃ) এর ভাষণ

বাধ্য থাকা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তাদের তীব্র দুঃখের কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুতে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং হযরত মুসার মতোই ফিরে আসবেন। তিনি মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁর সম্প্রদায়কে চল্লিশ দিনের জন্য রেখেছিলেন।

হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন সেখানে পৌঁছেন তখন তিনি মসজিদে নববীতে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 144 পাঠ করলেন:

“মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া নন। [অন্যান্য] রসূল তার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে আপনি কি ফিরে যাবেন [অবিশ্বাসের দিকে]? আর যে তার গোড়ালিতে ফিরে যায় সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না..."

অতঃপর নিম্নোক্ত কথাটি বললেন: “আল্লাহ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবন দান করেছেন এবং তাঁকে জীবিত রেখেছেন যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করেন। সুউচ্চ, সরল, তাঁর বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আপনাকে পথের উপর ছেড়ে দিলেন। এবং স্পষ্ট নিদর্শন এবং ব্যথা ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে না. যাদের রব আল্লাহ, পরাক্রমশালী তাদের জানা উচিত যে, মহান আল্লাহ জীবিত এবং কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। আর যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত করত, তাদের জানা উচিত যে তিনি মারা গেছেন। মহান আল্লাহকে ভয় কর হে মানুষ! তোমার দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমার প্রভুর উপর ভরসা কর। মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহর বাণী সম্পূর্ণ। মহান আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাকে সমর্থন করে এবং যারা তার ধর্মকে সম্মান করে। মহান আল্লাহর কিতাব আমাদের মাঝে রয়েছে। এটি আলো এবং নিরাময় উভয়ই। এর দ্বারা মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত দান করেছেন। এতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ কী হালাল মনে করেন আর কোনটি হারাম। সৃষ্টির মধ্য থেকে কে আমাদের উপর (আমাদের আক্রমণ করার জন্য) অবতীর্ণ হয় তা আমরা পরোয়া করব না। যারা আমাদের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা জোরালোভাবে লড়াই করব যেভাবে আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে লড়াই করেছি।

হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার পর তারা সবাই সত্যকে মেনে নিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথা ঘোরা বোধ করেন এবং মাটিতে পড়ে যান এবং অবশেষে স্বীকার করেন যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে মারা গেছেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, দ্য লাইফ অফ দ্যা প্রফেট, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 348-349 এবং ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 139-141-এ আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর (রা) কে খলিফা নির্বাচিত করা

সত্যকে সমর্থন করা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর একাদশ বছরে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী চরম উদ্বেগ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এ সময় মক্কা ও মদিনা থেকে আগত সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে সম্মত হন। সহীহ বুখারী, 3667 এবং 3668 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হল ভাল বিষয়ে অন্যদের সমর্থন করার গুরুত্ব। এটি এবং অন্যান্য হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে তাদের খলিফা হিসেবে অন্য কাউকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এমনকি উমর ইবনে খাতাব নামও রেখেছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। উমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্য এটি ছিল কোনো যুক্তি বা সমস্যা ছাড়াই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার উপযুক্ত সুযোগ। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সঠিক কাজটি করতে বেছে নেন এবং ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে নিয়োগ করে মুসলিম জাতিকে সাহায্য করেন। তিনি চিন্তা করেননি যে তিনি অন্য কাউকে সমর্থন করলে তার পদমর্যাদা এবং সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পাবে বা তাকে ভুলে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে, এই সঠিক পছন্দের পরেই তার সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলিম এমনকি ইসলামী প্রতিষ্ঠানও এইভাবে আচরণ করে না। যারা ভালো কিছু করে তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে তারা প্রায়শই শুধুমাত্র যাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সমর্থন করে। তারা এমন আচরণ করে যেন অন্যদের ভালো কাজে সহযোগিতা করলে তাদের সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। কেউ কেউ আরও নীচে নেমে গেছে এবং তাদের বন্ধু এবং আত্মীয়দের খারাপ কাজে সমর্থন করে এবং অপরিচিতদের যারা ভাল করছে তাদের সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ইসলামী সম্প্রদায় দুর্বল হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু অন্য কিছুর চিন্তা না করে সর্বদা কল্যাণের বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন করে তাদের দায়িত্ব পালন করতেন। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে যদি তারা উভয় জগতে শক্তি ও সম্মান চায়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

উপরন্তু, যদিও এটা স্পষ্ট ছিল যে আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, এমনকি মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দের পছন্দ ছিল, তবুও তিনি তাকে স্পষ্টভাবে মনোনীত করেননি। এর একটি কারণ হল, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু এবং নতুন নেতা মনোনীত করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা ছিল। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট,

নেতৃত্বের জন্য তর্ক করবেন এবং লড়াই করবেন নাকি মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করবেন এবং ভূমিকার জন্য সেরা ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন কিনা তা দেখার জন্য একটি পরীক্ষা। ইতিহাস পরিষ্কারভাবে দেখায়, তারা উড়ন্ত রঙের সাথে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। অতএব, এটি তাদের জন্য একটি পরীক্ষা ছিল এবং ভবিষ্যত মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষা ছিল যে তারা সর্বদা অন্যদের ভালো কাজে সাহায্য করার জন্য সচেষ্ট থাকে। উপরন্তু, যদি তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিযুক্ত হন, তবে ভবিষ্যতে কিছু লোক সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁর নিয়োগে সর্বসম্মতভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তারা কেবলমাত্র তারা এটা মেনে নিয়েছে কারণ তারা তা করতে আদেশ করেছিল। অতএব, একটি সুস্পষ্ট আদেশ এড়ানোর অনুমতি দেওয়া এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বাধা দেয় কারণ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, এই অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতগুলির অধীনে তাদের নেতা নির্বাচন করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের প্রথম খলিফা হতে হবে। . এটি খলিফা হিসাবে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অধিকারকে আরও বৃদ্ধি করেছিল, যেমনটি তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক স্বাধীনভাবে নিযুক্ত ছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। .

আরও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা

ইসলামের প্রথম খলিফা এবং উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে আবু বক্কর (রা.)-এর মনোনয়ন সর্বদাই অনেক বিতর্কের বিষয়। সুন্নি ও শিয়া এই দুই দলকে সত্যের উপর একত্রিত করার জন্য সঠিকভাবে পরিচালিত পণ্ডিতরা প্রায়শই ইসলামের প্রথম এবং দ্বিতীয় খলিফা হওয়ার তাদের অধিকারের অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও এটি একটি যোগ্য লক্ষ্য, তবুও গড়পড়তা মুসলমানদের এই আলোচনা বা অন্যান্য অনুরূপ আলোচনা যেমন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না, কারণ এই বিষয়গুলি মহান আল্লাহ তায়ালা চান। বিচার দিবসে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। এই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে রয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 141:

"এটি এমন একটি জাতি যা অতিক্রম করেছে। এটি যা অর্জন করেছে তার [পরিণাম] হবে এবং আপনি যা অর্জন করেছেন তা আপনার কাছে থাকবে। এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সঠিকভাবে পরিচালিত ছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এটি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 100:

“আর মুহাজিরগণ (মক্কা থেকে হিজরতকারী) এবং আনসার (মদিনার অধিবাসী) মধ্যে [ঈমানে] প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সদাচরণে তাদের অনুসরণ করেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে উদ্যান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই বড় প্রাপ্তি।"

যেহেতু বিচার দিবসে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই বিচার দিবসে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সেগুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে। একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার এবং তার উপর আমল করার পরেই কি তাদের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের অধিকার আছে? যেহেতু কার্যত কেউই এই স্তরে পৌঁছায়নি, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করবে, অর্থাত্ যে বিষয়গুলি নির্ধারণ করবে তারা জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে।

একটি সূক্ষ্ম উপদেশ

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পরের দিন, আবু বক্কর মিম্বরে বসেছিলেন যখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উপর খুতবা দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, “হে লোকসকল, গতকাল আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলেছিলাম যা যথাযথ ছিল না। আমি মহান আল্লাহর কিতাবে এটি পাইনি এবং এটি এমন কিছু ছিল না যা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নেতৃত্ব দিতে থাকবেন যতক্ষণ না তিনি আমাদের মধ্যে শেষ মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাঁর কিতাব রেখে গেছেন, যাতে রয়েছে মহান আল্লাহ ও তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা। যদি আপনি এটি মেনে চলেন, তাহলে মহান আল্লাহ আপনাকে সেই দিকে পরিচালিত করবেন যা তিনি তাকে পরিচালনা করেছেন। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তির নেতৃত্বে একত্রিত করেছেন, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী, যখন তারা গুহায় ছিলেন, তখন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়, তাই উঠুন এবং আপনার আনুগত্যের শপথ করুন। তাকে।"

উমর জনগণকে কোনো প্রকার হিংসা-বিদ্বেষের লক্ষণ না দেখিয়ে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করেছিলেন। তার ক্রিয়াকলাপ জনগণের জন্য বিভক্তি ও ক্লেশ এড়ায় এবং মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করেছিল যে আসন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 143-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদেরকে অবশ্যই তার অনুকরণ করতে হবে এমন বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবলম্বন করে যা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র

প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা , যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি

নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ

তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

ধর্মত্যাগী যুদ্ধ

জেদ ত্যাগ করা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর অনেক আরব উপজাতি ধর্মত্যাগ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যা নবীদের অনুসরণ করতে শুরু করে এবং অন্যরা বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে অস্বীকার করে। এই আরব উপজাতিরা তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল যখন এটি এই অঞ্চলে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং তাই তাদের বিশ্বাস সর্বদা দুর্বল ছিল এবং বিশ্বাসের নিশ্চিততার পরিবর্তে অন্ধ অনুকরণের উপর ভিত্তি করে ছিল। ভন্ড নবীরা ঈমানের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল এবং পার্থিব জিনিসের প্রতি মানুষের লোভ তাদের দুর্বল বিশ্বাসকে জয় করেছিল। উপরন্তু, যদিও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠরা প্রথমে আবু বক্করকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেমন উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আরব উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার জন্য যারা বাধ্যতামূলক দান করতে অস্বীকার করেছিল, তিনি তাদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসলামের সেই স্তম্ভটিকে প্রত্যাখ্যান করা কুফর এবং তাই যুদ্ধ করার একটি সুস্পষ্ট কারণ। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বকর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 314-317 এবং সহীহ বুখারীতে 1399-1400 নম্বরে পাওয়া হাদীসগুলিতে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বাস্তবে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যদি ফরজ দানের ব্যাপারে আপস করে থাকেন তাহলে শেষ সময় পর্যন্ত বিপথগামী ও অজ্ঞ মুসলমানরা তাকে ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে প্রকাশ্যে আপস করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করত। ইসলাম

তখন তার সারমর্ম হারিয়ে ফেলত এবং শুধুমাত্র একটি খালি খোসা থেকে যেত, যেখানে লোকেরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে কিন্তু এর কোন শিক্ষার উপর অনুশীলন করতে ব্যর্থ হয়। আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সুদূরপ্রসারী উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ ছিলেন এবং অন্যরা ব্যর্থ হলে এটি বুঝতে পেরেছিলেন। ইসলামের সারাংশের এই সুরক্ষার জন্যই তিনি তাদের সাথে লড়াই করেছিলেন যারা বাধ্যতামূলক দান করতে অস্বীকার করেছিল। এই উপলব্ধিটি প্রতিফলিত হয় তিনি তাদের কাছে যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়েছিলেন যারা বাধ্যতামূলক দাতব্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাদের সাথে লড়াই না করার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেন, "ওহীর অবতরণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং ধর্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি কি এখন জীবিত থাকাকালীন এটিকে হ্রাস করতে দেব (পরিবর্তন বা পরিবর্তিত হতে)? ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর জীবনী আবু বক্কর আস সিদ্দীক, ৩৬১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যান্য সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তখন বুঝতে পারলেন যুদ্ধই সঠিক পছন্দ। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, হঠকারী মনোভাব অবলম্বন করা এড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং সত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছিলেন যখন এটি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের বিষয়ে অটল থাকা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু অধিকাংশ পার্থিব বিষয়ে একে বলা হয় একগুঁয়েমি, যা দোষারোপযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে বা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা জেদীভাবে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে এই বিশ্বাস করে যে তারা যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ তারা হেরেছে এবং অন্যরা যারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে তারা জিতেছে। এটা নিছক শিশুসুলভ।

প্রকৃতপক্ষে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকবে তবে পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, যতক্ষণ না এটি পাপ নয়, তাদের জীবনকে সহজ করার জন্য। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় এটি আসলে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের জীবনে অন্যরা তাদের পরিবর্তন করতে চান, যেমন তাদের আত্মীয়রা। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হ'ল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের উচিত তার চেয়ে ভাল পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্কে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ ভালোর জন্য একজনের চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রকৃত শক্তি লাগে।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায় যা তাদের জীবন থেকে শান্তি সরিয়ে দেবে। এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে তারা সবসময় শান্তির এক স্টেশন থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে তবে অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলে তারা পরিবর্তন করেছে তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

উপসংহারে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পাপ সংঘটিত হয় না একজন ব্যক্তির উচিত মানিয়ে নিতে এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি পায়।

একজন যোগ্য নেতা

তাঁর অন্তিম অসুস্থতার সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আল বলকা ও ফিলিস্তিনে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে যখন তারা শুনল যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অসুস্থ। তিনি মারা গেলে তারা পরবর্তী নির্দেশের জন্য মদিনায় ফিরে আসেন।

আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সেনাবাহিনীকে তাদের মিশন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, উসামার প্রতি কিছু অপছন্দ দেখিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত অল্পবয়সী এবং অনভিজ্ঞ এবং এমনকি অনেক সিনিয়র সাহাবীর উপরে নেতা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট হন। তাঁর ইন্তেকালের আগে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এমনকি তাঁর পিতা যায়েদ বিন হারিথা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো তিনি নেতৃত্বের যোগ্য বলে ঘোষণা দিয়ে যারা এইভাবে অনুভব করেছিলেন তাদের সমালোচনা করেছিলেন। তার আগে নেতৃত্বের, যদিও লোকেরা তার নেতৃত্বে নিয়োগের সমালোচনা করেছিল। এটি সহীহ বুখারী, 4469 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর এবং আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পুনরায় প্রেরণ করেন, কিছু সাহাবী উমরকে উৎসাহিত করেন। ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাদের

উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যারা সেই সেনাবাহিনীর অংশ ছিলেন, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ করেছিলেন যে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব আবার বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ কাউকে দেওয়ার জন্য। এই অনুরোধ শুনে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রোধে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দাড়ি ধরে ফেললেন এবং মন্তব্য করলেন যে, তিনি কীভাবে তাঁকে বরখাস্ত করতে পারেন যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাকে, ব্যক্তিগতভাবে তাকে নিযুক্ত করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে তিনি নেতৃত্বের যোগ্য। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বক্কর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৩২৫-৩২৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যাদের উসামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিয়োগ নিয়ে সমস্যা ছিল, তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দে অসন্তুষ্ট হননি। তার উপর। তাদের কেবল তার নেতৃত্ব নিয়ে সমস্যা ছিল কারণ তিনি অত্যন্ত তরুণ এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন। একজন অভিজ্ঞ এবং আশ্চর্যজনক নেতা থাকা একটি যুদ্ধের সময় নেতৃত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। যে নেতার এই গুণাবলীর অভাব রয়েছে সে তার আদেশ জারি করার সময় সৈন্যদের হৃদয়ে দ্বিধা সৃষ্টি করতে পারে। এই দ্বিধা প্রায়শই যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করে। এই কারণেই কিছু সাহাবী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাঁর নেতা হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন।

উপরন্তু, উসামা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি নেতৃত্বের যোগ্য ছিলেন কারণ তিনি উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব

দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

অবশেষে, যদিও উসামা, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যদিও তিনি খুব অল্প বয়সী ছিলেন তবুও তিনি সঠিক উপায়ে বড় হয়েছিলেন যার অর্থ, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তিনি একজন মহীয়সী ব্যক্তি এবং নেতা হয়েছিলেন। মুসলমানদের অবশ্যই যুবসমাজকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গড়ে তোলার প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে যাতে তারা নিশ্চিত করতে পারে যে মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্ম মহৎ ও প্রশংসনীয় হয়ে উঠবে।

উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 1952 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে সবচেয়ে নেক উপহার দিতে পারেন তা হল তাদের উত্তম চরিত্র শেখানো।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন, যেমন তাদের সন্তানদের বিশ্বাস সম্পর্কে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন ও প্রদানের বিষয়ে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, পার্থিব উত্তরাধিকার আসে এবং যায়। কত ধনী এবং ক্ষমতাবান মানুষ বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র তাদের মৃত্যুর পর তাদের ছিন্নভিন্ন এবং ভুলে যাওয়ার জন্য? এই উত্তরাধিকারগুলির মধ্যে থেকে কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যা মানুষকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করার জন্যই স্থায়ী হয়। একটি উদাহরণ ফেরাউনের বিশাল সাম্রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান তাদের সন্তানদের শেখানোর বিষয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন যে কীভাবে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হয় এবং প্রচুর সম্পদ ও সম্পত্তি অর্জন করতে হয় যে তারা তাদের মহান আল্লাহর

আন্তরিক আনুগত্য শেখাতে অবহেলা করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। ধৈর্য এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তাদের কাছে তাদের সন্তানদের ভালো আচরণ শেখানোর জন্য প্রচুর সময় আছে কারণ তাদের মৃত্যুর মুহূর্তটি অজানা এবং প্রায়শই অপ্রত্যাশিতভাবে লোকেদের উপর আঘাত করে।

এছাড়াও, বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায় এবং তাদের পথে সেট হয়ে যায় তখন তাদের ভাল আচরণ শেখানো অত্যন্ত কঠিন। আজকের দিনটি একজন মুসলমানের সত্যিকার অর্থে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়-স্বজনকে যে উপহার দিতে চান তা নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এভাবেই একজন মুসলমান আখেরাতের জন্য কল্যাণ প্রেরণ করে কিন্তু একজন ধার্মিক সন্তান হিসাবে ভাল কিছু রেখে যায় যা তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তাদের উপকার করে। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে এইভাবে কল্যাণে পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

বিশ্বাসের উপর অধিষ্ঠিত

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পূর্বে ভন্ড নবী আসওয়াদ আল আনসি তার বাণী প্রচার করতে শুরু করেন এবং মানুষকে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করেন। আবু মুসলিম আল খাওলানী, আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, ইসলামের উপর অটল ছিলেন যার ফলে আসওয়াদ তাকে একটি বড় আগুনে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়। লোকদের বিস্ময়ের জন্য আগুন আবু মুসলিমের ক্ষতি করেনি, আল্লাহ তার উপর রহম করুন। আসওয়াদকে তখন তাকে নির্বাসিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল এই অলৌকিক ঘটনাটি লোকেদের তাকে প্রত্যাখ্যান করার একটি উপায় হয়ে উঠার আগেই। আবু মুসলিম, আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, অবশেষে আবু বকর (রা) এর খিলাফতের সময় মদিনায় পৌঁছেন। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে প্রবেশের পর উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। যেহেতু পরবর্তীটি উপলব্ধিশীল ছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনিই কি সেই ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। আবু মুসলিম, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ফলস্বরূপ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গর্বিতভাবে তাঁকে নিজের এবং আবু বকরের মাঝখানে বসালেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এমন একজন ব্যক্তি দেখানোর জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন যাকে তিনি আগুন থেকে রক্ষা করেছেন, যেমন তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে রক্ষা করেছিলেন। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 28-29:

"তারা বলল, "তাকে [হযরত ইব্রাহিম (আঃ)] পুড়িয়ে দাও এবং তোমার উপাস্যদের সমর্থন কর - যদি তুমি কাজ করতে চাও।" আমরা [আল্লাহ] বললাম, "হে অগ্নি, ইব্রাহীমের উপর শীতলতা ও নিরাপত্তা হও।"

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বক্কর আস সিদ্দিকের জীবনী , পৃষ্ঠা ৪২২-৪২৩-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি চরম সমস্যার সময়ে নিজের বিশ্বাসকে ধরে রাখার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ব্যাপক অশান্তি ও বিদ্রোহের সময় মহান আল্লাহর ইবাদত অব্যাহত রাখে সে সেই ব্যক্তির মতো যে পবিত্রে হিজরত করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সা.

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হিজরত করার সওয়াব ছিল একটি মহান কাজ। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 321 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি একজনের পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহকে মুছে ফেলে।

মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার অর্থ হল মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী নিয়তের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া।

স্পষ্টতই এ হাদীসে উল্লেখিত সময় এসে গেছে। মুসলিম জাতির জন্য জাগতিক কামনা-বাসনা উন্মুক্ত হওয়ায় ইসলামের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হওয়া খুবই সহজ হয়ে গেছে । তাই মুসলমানদের উচিত তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া এবং বিতর্কিত বিষয় ও লোকেদের এড়িয়ে চলা এবং এই হাদীসে বর্ণিত সওয়াব পেতে চাইলে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা উচিত।

বিচার

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে দু'জন মুসলমান তাঁকে এক টুকরো জলাভূমি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যা মোটেও ব্যবহার করা হচ্ছিল না। তারা জোর দিয়েছিল যে তারা জমি চাষ করতে পারে যাতে এটি থেকে কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাঁর সাথে থাকা মুসলমানদের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়ার পর সম্মত হন। যখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জানানো হয় যে, কী ঘটেছিল তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সেই দলিলটি নষ্ট করে দেন যেটিতে এই সিদ্ধান্তটি লিপিবদ্ধ ছিল এবং আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তাদের জমি দেওয়া ঠিক নয়। এটা জনসাধারণের অন্তর্গত ছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে একমত হন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে দেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 149-150-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্ত ভালো ছিল, কারণ জমিটি উপকারী উপায়ে ব্যবহার করা যেত কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশ্বাস করতেন যে, তাদের সরকারি জমি দেওয়া ঠিক নয়। এটি সমস্ত মুসলমানদের জন্য ছিল।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।

একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য।[1] *তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."*

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

কুরআন সংকলন

কুরআন সংগ্রহ করা

ইয়ামামার যুদ্ধের পর, যার ফলে অনেক মুসলিম হতাহত হয়েছিল, যাদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছিলেন, উমর ইবনে খাত্তাব আবু বক্করকে উৎসাহিত করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করতে এই ভয়ে যে আয়াতগুলি হারিয়ে যেতে পারে যদি পবিত্র কুরআনের মুখস্থকারীরা মারা যেতে থাকে বা যুদ্ধে শহীদ হতে থাকে। এর আগে, পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলি একটি একক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং সেগুলি হয় মুখস্থ বা বিভিন্ন বস্তুর উপর লেখা ছিল, যেমন পাথর, যা বিভিন্ন লোকের দখলে ছিল। প্রাথমিকভাবে, আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি এমন কিছু করতে চাননি যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন উমর অটল ছিলেন, তখন আবু বক্কর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য এটিই সর্বোত্তম পদক্ষেপ। আবু বক্কর জায়েদ বিন সাবিতকে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। পবিত্র কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কপিটি আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে থেকে যায়, যতক্ষণ না তিনি মারা যান, তারপর তা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এবং অবশেষে তাঁর কন্যা এবং মুমিনদের মা হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করা হয়। তার সাথে সন্তুষ্ট সহীহ বুখারীর ৭১৯১ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ভবিষ্যত মুসলমানদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের অধিকার পূরণের মাধ্যমে তাদের মহান উত্তরাধিকারকে সম্মান করতে হবে, কারণ এটিই ছিল তাদের ত্যাগের উদ্দেশ্য।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে,

তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

উমর ইবনে খাত্তাব (রা) কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করা

বৃহত্তর ভালোর জন্য

তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, ইসলামের পরবর্তী খলিফা মনোনীত করার ব্যাপারে সিনিয়র সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ চেয়েছিলেন। প্রত্যেক সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন, যাদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছিল যে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন, কারণ তিনি নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন, আবু বক্করের পরে দ্বিতীয়। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, আবু বক্কর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা ৭২৪-৭২৫।

সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় যে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু পার্থিব কারণ যেমন পারিবারিক বন্ধন, বন্ধুত্ব ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পরবর্তী খলিফাকে বিবেচনা করছিলেন না। তিনি তার পুত্রের মত কোন আত্মীয়কে নিয়োগ করেননি। তার নাম চালিয়ে যেতে। আজকের নেতাদের থেকে ভিন্ন, তার সিদ্ধান্ত ছিল একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এবং ভূমিকার জন্য কে সেরা তার উপর ভিত্তি করে।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিত তাদের ব্যাপারে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

নেতৃত্বের ভয়ে

আবু বক্কর যখন উমর ইবনে খাত্তাবকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন পরবর্তী খলিফা নেতৃত্বের ট্রায়াল নিয়ে আসার ভয়ে খালিভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাজি হতে বাধ্য করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর জীবনী আবু বকর আস সিদ্দীক, পৃষ্ঠা ৭২৮ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের বিশ্বাস নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্খা করে, ঠিক যেমন খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ভালো জিনিসে আনুগত্য করা

তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মদিনার জনগণকে প্রকাশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং তাঁকে ইসলামের পরবর্তী খলিফা হিসাবে উমর ইবনে খাত্তাবকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন। তারা সবাই ঘোষণা করলেন যে তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনবে এবং মান্য করবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর জীবনী আবু বকর আস সিদ্দীক, পৃষ্ঠা ৭২৮ এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি বর্ণনা অনুসারে, উমর ইবনে খাত্তাব নামকরণের আগে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি যাকে বেছে নিয়েছেন তাতে তারা সন্তুষ্ট হবে কিনা। আলী ইবনে আবু তালিব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, দাঁড়িয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু না হলে তারা খুশি হবে না। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ৭১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা । এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

এগিয়ে পাঠানো ভাল

তার চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তার পরিবারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি তার পরা জামাকাপড় ধুয়ে ফেলবেন এবং তাকে কাফন হিসাবে একটি নতুন পোশাক কেনার পরিবর্তে সেগুলি দিয়ে দেবেন। যখন তাকে একটি নতুন কাফন কেনার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে মৃতের চেয়ে জীবিতরা নতুন পোশাকের বেশি যোগ্য। যদিও আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাতির খলিফা ছিলেন, তবুও তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতোই একটি সরল জীবন, দারিদ্র্যের জীবনযাপন বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তার নিজের প্রয়োজনের চিন্তা করার জন্য মানুষের উপকার করার চেষ্টা করতে ব্যস্ত ছিলেন। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে তিনি তার জনগণের জীবনকে আরামদায়ক করার লক্ষ্য নিয়েছিলেন। খলিফা হিসাবে তিনি তার দুই বছরে কোষাগার থেকে যে সামান্য বেতন নিয়েছিলেন তাও সরকারী কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছিল যাতে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তিনি একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানদের সেবা করেছেন। তিনি এই দুনিয়া থেকে কিছুই নেননি এবং দুনিয়া তাঁর কাছ থেকে কিছুই নেয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, আবু বক্কর আস সিদ্দিকের জীবনী, ৭৩৪-৭৩৫ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবু বক্কর (রাঃ) তাঁর আখেরাতের শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুতির দিকে আরও মনোনিবেশ করেছিলেন, তারপর এই দুনিয়ার বিলাসিতা সঞ্চয়, মজুদ এবং উপভোগ করার জন্য। এই বরকতময় মনোভাব থেকে আজকের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মুসলমানরা কত দূরে!

সহীহ বুখারী, 6514 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে দুটি জিনিস মৃতকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং কেবল একটি জিনিস তাদের কাছে থাকে। যে দুটি জিনিস তাদের পরিত্যাগ করে তা হল তাদের পরিবার ও সম্পদ এবং তাদের কাছে অবশিষ্ট থাকে তা হল তাদের আমল।

ইতিহাস জুড়ে লোকেরা সর্বদা তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছে সম্পদ এবং একটি সুখী পরিবার অর্জনের জন্য। যদিও ইসলাম এই জিনিসগুলিকে নিষিদ্ধ করে না কারণ এগুলোর প্রয়োজন হতে পারে একজনের দায়িত্ব পালনের জন্য, উদাহরণস্বরূপ, একজনের নির্ভরশীলদের সমর্থন করার জন্য সম্পদের প্রয়োজন। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে তাদের প্রয়োজনের বাইরে তাদের জন্য প্রচেষ্টা করতে এবং সৎকর্ম সম্পাদনের মতো আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের উপর তাদের অগ্রাধিকার দিতে নিরুৎসাহিত করে।

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং এমন একটি পরিবার পেতে হবে যা তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে। এইভাবে ব্যবহার করা হলে এগুলি উভয়ই ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয়। এটি সহীহ বুখারী, 6373 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিহ্ন যিনি সেই জিনিসটিকে অগ্রাধিকার দেন যা তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে সহ্য করবে এবং সমর্থন করবে যথা, সৎ কাজ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহর হুকুম পালনে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যস্ত রাখতে দেয় তাকে পবিত্র কুরআনে ক্ষতিগ্রস্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 9:

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ না করে। আর যে এটা করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।”

কেউ কেউ ভুলভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, কারণ তিনি তাদের প্রচুর সম্পদ এবং পরিবার দান করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ ঘোষণা করে তাদের বিভ্রান্তি দূর করে দেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই তার প্রিয় ও নিকটবর্তী। অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 37:

"এবং আপনার সম্পদ বা আপনার সন্তান-সন্ততি আপনাকে অবস্থানে আমাদের নিকটবর্তী করে না, বরং এটি এমন একজন ব্যক্তি যে বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে..."

পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন যে, তাদের ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজন আখেরাতে তাদের কোনো উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না তারা সুস্থ চিত্তে পরকালে পৌঁছায়। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

সুস্থ হৃদয়ের সংজ্ঞাটি সহজভাবে বলতে গেলে কেউ তা অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর

নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি না হয়। তাকে।

একজনের সম্পদ কেবলমাত্র তাদের পরকালে উপকার করতে পারে যদি তারা এটিকে চলমান দাতব্য প্রকল্পে ব্যয় করে তাদের আগে পাঠায়। জামে আত তিরমিযী, 1376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একই হাদিস মানবজাতিকে জানায় যে একজন নেক সন্তান তাদের মৃত পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করলেও কবুল হবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে অনেক শিশু তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের উত্তরাধিকার খুঁজতে ব্যস্ত।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ধার্মিক সন্তানকে লালন-পালন করা যে তাদের মৃত পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করে তা অর্জন করা সম্ভব নয় যদি পিতামাতারা তাদের জীবনে সৎ কাজ না করেন। দ্বিতীয়ত, এটা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের পথ নয়, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, সৎকাজ করা থেকে বিরত থাকুন এবং আশা করি অন্যরা এ থেকে সরে যাওয়ার পর তাদের জন্য দোয়া করবেন। বিশ্ব একজনকে জীবিত অবস্থায় সৎকাজের জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং তারপর আশা করা উচিত যে তারা মারা যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র একজন যে সম্পদ পাঠাবে তা তাদের উপকার করবে। এটি তাদের সন্তানদের শিক্ষার মতো একজনের দায়িত্ব পালনে ব্যয় করে অর্জন করা যেতে পারে। ভুলভাবে ব্যয় করা সমস্ত সম্পদ মালিকের জন্য বোঝা হয়ে উঠবে এবং তাদের শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যারা লোভের বশবর্তী হয়ে ফরজ সদকা থেকে বিরত থাকে তাদের ভয়ানক শাস্তির

ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এই গুরুতর পাপ করবে বিচারের দিন তার সাথে একটি বিশাল বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা তাদের চারপাশে আবৃত করবে এবং অবিরাম দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

সুনানে আবু দাউদ, 1658 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, বিচারের দিন কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সোনা ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং যদি তারা বাধ্যতামূলক সদকা করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের শরীরে দাগ দেওয়া হবে। এটার উপর বকেয়া

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে যখন মৃত ব্যক্তি তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী থাকবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কোন ব্যক্তি জেনেশুনে এমন কোন ব্যক্তির কাছে সম্পদ ছেড়ে দেয় যে এটি অধিকার করার উপযুক্ত নয় এবং এভাবে তার অপব্যবহার করে তাহলে মৃত ব্যক্তিও এর জন্য দায়ী হতে পারে। বিপরীতে, যদি কেউ সঠিকভাবে ব্যয়কারী ব্যক্তির কাছে সম্পদ রেখে যায় তবে মৃত ব্যক্তিকে বিচারের দিন অনেক অনুশোচনা করতে হবে যখন তারা সঠিকভাবে ব্যয়কারীকে দেওয়া মহাপুরস্কার দেখবে।

সহীহ মুসলিমের ৭৪২০ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, বাস্তবে একজন ব্যক্তি তার সম্পদ শুধুমাত্র তিনটি উপায়ে ব্যবহার করতে পারে। প্রথমটি হল সম্পদ যা তাদের খাদ্যের জন্য ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয়টি হল তাদের পোশাকের জন্য ব্যয় করা সম্পদ এবং শেষ সম্পদ হল যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে। অন্যান্য সমস্ত সম্পদ অন্য লোকেদের ভোগ করার জন্য রেখে দেওয়া হয় যখন মৃত ব্যক্তিকে তা সংগ্রহ করার জন্য দায়ী করা হয়।

মজুদ করা এবং ভুলভাবে সম্পদ ব্যয় করা একজনকে বস্তুগত জগতকে ভালবাসতে এবং পরকালকে অপছন্দ করতে অনুপ্রাণিত করে কারণ তারা তাদের প্রিয় সম্পদকে পিছনে ফেলে যেতে অপছন্দ করে, যা তাদের মৃত্যুর সময় ঘটবে। যে আখেরাতকে অপছন্দ করে সে তার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেবে না।

উপরন্তু, কেউ যদি সত্যিকারের তাকওয়া অবলম্বন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."

প্রকৃতপক্ষে, সম্পদ একটি অদ্ভুত সঙ্গী কারণ এটি কেবল তখনই কাউকে উপকৃত করে যখন এটি তাদের অর্থ ছেড়ে দেয়, যখন এটি সঠিক উপায়ে ব্যয় করা হয়।

একজন ব্যক্তি যদি কোনো বিধান ছাড়াই দীর্ঘ ভ্রমণে যান তাহলে তাকে বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি তাদের আখেরাতের দীর্ঘ সফরের জন্য তাদের ধন-সম্পদ আগে থেকে পাঠায় না সেও মূর্খ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে একজন মানুষ মৃত্যুর সময় সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করে যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ পিছনে ফেলে খালি হাতে পরকালের দিকে যাত্রা করছে। একজন মুসলমানের উচিত যে কোনো মূল্যে এই পরিণতি এড়ানো।

সৎ কাজ করাই একমাত্র উপায় যা একজনের কবরের জন্য প্রস্তুত করা হয় কারণ সেখানে আর কোন সান্ত্বনা পাওয়া যাবে না। এটা আসলে পরকালে একজনের চিরস্থায়ী আবাস প্রস্তুত করার মাধ্যম। অতএব, এই প্রস্তুতিকে সাময়িক বস্তুগত জগতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তার দুটি ঘর থাকে এবং তার বেশিরভাগ প্রচেষ্টা ঘরকে সুন্দর করার জন্য উৎসর্গ করে যেটিতে তারা কম সময় ব্যয় করবে। একইভাবে, একজন মুসলিম যদি এই বিশ্বে তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য আরও বেশি সময় এবং প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে। পরকালের চিরস্থায়ী বাসস্থান তারাও নিছক নির্বোধ। এটা কারো কারো মনোভাব যদিও তারা স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত এবং একটি অজানা দৈর্ঘ্যের জন্য যেখানে তাদের আখেরাতে থাকবে চিরস্থায়ী।

এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাসের নিশ্চিততার অভাবকে নির্দেশ করে এবং তাই যে কেউ এই মানসিকতাকে ভাগ করে তার জন্য ইসলামের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করা অত্যাবশ্যকীয় যাতে তারা আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ ছাড়াই তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে পারে।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের সাথে তাদের কবরের জন্য প্রস্তুত করে, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে সে পাবে যে তাদের ভাল কাজগুলি তাদের জন্য স্বস্তি দেয় যেখানে তাদের পুঞ্জীভূত গুনাহগুলি কেবল তাদেরই হবে। অন্ধকার কবরে তাদের অবস্থান আরও খারাপ। তাই একজন মুসলমানের উচিত দুর্বলতার সময় আসার আগেই তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো কাজ করা। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত মূল হাদীসে নির্দেশিত বাস্তবতাকে চিনতে হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে সঠিকভাবে কাজ করা উচিত এমন একটি সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তাদের সৎকাজ করার জন্য আরও সময় দেওয়ার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হবে। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

“আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই কোন আত্মাকে বিলম্ব করবেন না যখন তার সময় এসে যাবে..."

তাদের এখনই তাদের কাজের প্রতি চিন্তা করা উচিত যাতে তারা আন্তরিকভাবে পাপ থেকে অনুতপ্ত হতে পারে এবং এমন একটি দিন আসার আগে সৎ কাজ

করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে পারে যখন চিন্তা করা তাদের উপকারে আসবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

প্রত্যেকে তাদের আগে যারা মারা গেছে এবং তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আরও সৎ কাজ করতে তাদের অক্ষমতা নিয়ে চিন্তা করা যাক। এই সময় আসার আগে তাড়াতাড়ি করুন এবং অনিবার্য জন্য প্রস্তুত করুন। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 99:

"আর তোমার প্রভুর ইবাদত কর যতক্ষণ না তোমার কাছে নিশ্চিত মৃত্যু আসে।"

একটি চূড়ান্ত পরামর্শ

তার চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, আবু বক্কর উমর ইবনে খাত্তাবকে ডেকে পাঠান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে কিছু চূড়ান্ত পরামর্শ দেন, যা ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 59 নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সর্বাবস্থায় সর্বপ্রথম মহান আল্লাহকে ভয় করার পরামর্শ দেন।

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা

ক্ষতিকর। অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা এমন বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেছেন যেগুলো দিনে পূরণ করতে হবে, যেগুলো রাতে সম্পন্ন হলে তিনি গ্রহণ করবেন না। এবং তিনি এমন বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করেছিলেন যেগুলি অবশ্যই রাতে পূরণ করতে হবে, যা দিনে করা হলে তিনি গ্রহণ করবেন না। আর তিনি স্বেচ্ছাকৃত কাজ কবুল করেন না যতক্ষণ না ফরয কাজগুলো আগে করা হয়।

এই উপদেশটি ইসলামের শিক্ষাগুলো মেনে চলার এবং নিজের জীবনের গতিপথ এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তির পাল্লা তাদের পক্ষে ভারী হবে যখন তারা এই পৃথিবীতে সত্য অনুসরণ করবে, যদিও এটি করা তাদের পক্ষে ভারী ছিল। এবং বিচার দিবসে একজন ব্যক্তির দাঁড়িপাল্লা তাদের পক্ষে হালকা হবে যখন তারা এই পৃথিবীতে মিথ্যার অনুসরণ করবে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

আবু বক্কর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তাকেও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে একজন বান্দাকে অবশ্যই ভয় এবং আশার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে: জাহান্নামের ভয় এবং জান্নাত লাভের আশা। বান্দার তাদের ভক্তিকে মূল্যবান মনে করা উচিত নয় এবং মহান আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদীসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর উপলব্ধি অনুসারে কাজ করেন এবং আচরণ করেন। এর অর্থ হল যদি একজন মুসলমানের ভাল চিন্তা থাকে এবং মহান আল্লাহর কাছে ভাল আশা করে, তবে তিনি তাদের নিরাশ করবেন না। একইভাবে, কেউ যদি মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ

করে, যেমন বিশ্বাস করা যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, যা এই হাদিসটি নির্দেশ করে এবং ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনার মধ্যে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর কাছে তাদের ক্ষমা করার প্রত্যাশা করে। এটা সত্য আশা নয় এটা নিছক ইচ্ছাপূরণ চিন্তা। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি কোনো বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হন, তাদের ফসলে জল দিতে ব্যর্থ হন এবং এখনও একটি বড় ফসল কাটার আশা করেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে এবং যখনই তারা পিছলে যায় তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি বীজ রোপণ করেন, তাদের ফসলে জল দেন, ফসলকে সুস্থ রাখার জন্য প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেন এবং তারপরে একটি বড় ফসলের আশা করেন। জামে আত তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের জীবনের সময় মহান আল্লাহকে আরও বেশি ভয় করা, কারণ এটি এমন পাপগুলিকে বাধা দেয় যা আশার চেয়ে উচ্চতর যা একজনকে সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। কিন্তু অসুস্থতা ও অসুবিধার সময় এবং বিশেষত মৃত্যুর সময় একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়, যদিও তারা তাদের জীবন তাঁর অবাধ্য হয়ে কাটিয়েছে, যেমনটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশেষভাবে আদেশ করেছেন। সহীহ মুসলিমের ২৮৭৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় শান্তি ও বরকত।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর খেলাফত

একজন নম্র খলিফা

তিনি যখন খলিফা হন, তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে আরোহণ করেন এবং আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একই স্তরে বসতেন, যা আসনের এক স্তর নিচে ছিল। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসতেন। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেমে গিয়ে মন্তব্য করেন যে তিনি মহান আল্লাহ তায়ালা চাননি যে তিনি নিজেকে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো একই স্তরে স্থাপন করতে দেখবেন। এরপর তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে স্তরে বসতেন, তার এক স্তর নিচে বসলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 172-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, আয়াত 63:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়,

সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

"আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একটি বিনীত উপদেশ

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত খুতবাটি ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৯৬ নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে তিনি রুক্ষ ছিলেন এবং তাঁকে নরম করতে বললেন।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের

পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মহান আল্লাহর কাছে মিনতি করলেন যে তিনি কৃপণ ছিলেন এবং তাঁকে উদার করতে বললেন। ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখায় যে, উমর রা.

কপটতার একটি দিক হল লোভ। তাদের চরম লোভ তাদেরকে মহান আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি রাখে। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যরা দান করাকে তারা অপছন্দ করে কারণ তাদের লোভ অন্যদের কাছে প্রকাশ পায়। তারা মানুষকে দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখে কারণ তারা সমাজে অন্যকে উদার হিসাবে লেবেল করা অপছন্দ করে। তাই তারা সর্বদা লোকেদের দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যেমন খারাপ কারণে দাতব্য সংস্থাকে কন আর্টিস্ট হিসাবে লেবেল করা। এই লোকদের উপেক্ষা করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে লোকদের বিচার করেন যা সহীহ বুখারির 1 নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। সুতরাং তাদের দান করা সম্পদ গরীবদের কাছে না পৌঁছালেও যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে দান করে। সুপরিচিত দাতব্য তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী তাদের পুরস্কার পাবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 67:

“মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের। তারা অন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত বন্ধ করে...”

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তারপর মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন যে তিনি দুর্বল এবং তাঁকে বলবান করতে বললেন।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4168 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, দুর্বল বিশ্বাসীর চেয়ে শক্তিশালী বিশ্বাসী মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

এটি অগত্যা শারীরিক শক্তিকে বোঝায় না যা একজন সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করে। তবে এটি জ্ঞান এবং তার উপর আমলকেও নির্দেশ করে। যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে তখন এটি বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যায়। দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে তার জ্ঞান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে এবং দুর্বল মুমিনের মত অন্ধ অনুকরণ করবে না। একটি দুর্বল বিশ্বাসী শোনার উপর ভিত্তি করে কিছু বিশ্বাস করে যেমন তাদের বলা হয় যে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির ভিতরে রয়েছে যেখানে শক্তিশালী বিশ্বাসী বিশ্বাস করে এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কাজ করে উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা একটি জানালা দিয়ে তাদের বাড়ির ভিতরে ব্যক্তিটিকে দেখে। যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে, আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের আনুগত্য তত বেশি হবে, তাঁর আদেশ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর ফলে উভয় জগতে তাদের সাফল্য বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

একটি সুন্দর উপদেশ - 1

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 172-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহান আল্লাহ তাঁকে খলিফা বানিয়ে জনগণের সাথে পরীক্ষা নিচ্ছেন।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে । উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখ হালাল জিনিসের দিকে তাকানোর জন্য এবং তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জন্য প্রদান করা এবং মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে কারণ এটিই শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর সাথে লোকদের পরীক্ষা করছেন।

সাহাবায়ে কেরামের জন্য পরীক্ষা ছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তারা তাদের নেতার আনুগত্য করবেন কি না ভালো বিষয়ে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সমাজের নেতাদের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে

থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন যে, তিনি নিজে কোনো বিষয় অন্য কাউকে অর্পণ করবেন না, যখন তিনি নিজে সরাসরি তা মোকাবেলা করতে পারবেন।

এটি স্বাধীন হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালবাসেন যে সৃষ্টির থেকে স্বাধীন। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের উচিত তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের শারীরিক শক্তি যেমন মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং মানুষের কাছ থেকে জিনিসগুলি চাওয়া উচিত নয় কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা কমিয়ে দেয়। একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যা কিছুই ঘটুক না কেন তাদের জন্য তাদের রিজিক বরাদ্দ করা হয়েছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি

হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রচেষ্টার উপর মনোনিবেশ করা এবং বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দেবেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেছিলেন যে তিনি তখনই অন্য কাউকে একটি বিষয় অর্পণ করবেন যখন তিনি নিজে সরাসরি এটি মোকাবেলা করতে পারবেন না। তিনি এমন কাউকে নির্বাচন করতেন যিনি যোগ্য ও বিশ্বস্ত ছিলেন।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী

ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেছিলেন যে তিনি তার গভর্নরদের পুরস্কৃত করবেন যদি তারা ভাল করে তবে তারা তাদের দায়িত্বে ব্যর্থ হলে তাদের শাস্তি দেবেন।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

একটি সুন্দর উপদেশ - 2

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। নিম্নলিখিত খুতবাটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবন আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 172-173-এ আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার এবং এর উপর আমল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তারা এর লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে ইসলাম হল পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতা। পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, বিচার দিবসে তাদের হিসাব নেওয়ার আগে লোকদের নিজেদেরকে হিসাব করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

“সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, লোকদেরকে সেই দিন মহান প্যারেডের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন যেদিন তারা মহান আল্লাহর সামনে বিচারের মুখোমুখি হবে এবং তাঁর কাছ থেকে একটি গোপন কথাও গোপন থাকবে না।

বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

কেউ সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা এই দোয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু

তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্ণতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহর অবাধ্যতার অর্থ হলে কোনো ব্যক্তির আনুগত্য নেই।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহূর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

একটি সুন্দর উপদেশ - 3

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 173-174-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে যেহেতু তিনি তাদের উপর খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন, তার কঠোরতা কেবলমাত্র অন্যায়কারী ও অত্যাচারীদের জন্যই প্রযোজ্য হবে। তিনি কাউকে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করতে দিতেন না এবং তিনি তাদের সত্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করতেন।

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলমানের ঈমানকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা উত্তম তা কামনা করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের

আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায়ে সমর্থন করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালবাসা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার একটি দিক।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল যে মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে

অন্যকে ঘৃণা করা উচিত কারণ মানুষ মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। বরং একজন মুসলমানের উচিত সেই গুনাহকে অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় তা পরিহার করা এবং অন্যদেরকেও এর বিরুদ্ধে সতর্ক করা। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া, কারণ এই সদয় আচরণ তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কিছু অপছন্দ না করা, যেমন একটি কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজনের অপছন্দের প্রমাণ এই যে, তারা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে তখন তা কখনই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। অর্থ, কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনোই কোনো গুনাহের কারণ হবে না কারণ এটি প্রমাণ করে যে কোনো কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজেদের স্বার্থে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যারা বিনয়ী ও বিনয়ী তাদের সামনে তিনি নিজেকে বিনীত করবেন।

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ের সাথে জীবনযাপন করবে তখন তাকে মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। এটি ঘটে কারণ নম্রতা মহান আল্লাহর দাসত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নম্রতার বিপরীত যা অহংকার শুধুমাত্র মালিকের জন্য, অর্থাৎ আল্লাহ, সর্বোত্তম, কারণ মানুষের যা কিছু আছে তা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং দান করা হয়েছে। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি অহংকার পরিহার করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের

মোকাবিলা করার মাধ্যমে নম্রতা প্রদর্শন করে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব এবং উভয় জগতেই প্রকৃত মহিমার দিকে নিয়ে যায়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের কাছ থেকে শুধু সেই সম্পদই নেবেন যা মহান আল্লাহ তাঁকে নিতে বলেছেন।

হারাম ব্যবহার করা একটি বড় গুনাহ। এর মধ্যে রয়েছে বেআইনি সম্পদ ব্যবহার, বেআইনি জিনিস ব্যবহার করা এবং বেআইনি খাবার খাওয়া। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে নির্দিষ্ট জিনিসগুলিকে ইসলাম হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে যেমন অ্যালকোহল শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিই হারাম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসগুলিও হারাম হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা হয়। যেমন, হালাল খাদ্য হারাম হয়ে যেতে পারে যদি তা হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয়। তাই, মুসলমানদের জন্য এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা শুধুমাত্র হালাল জিনিসের সাথে মোকাবিলা করে কারণ এটি কাউকে ধ্বংস করার জন্য হারামের একটি উপাদান লাগে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি হারাম ব্যবহার করবে তার সমস্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি তাদের দোয়া মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে কি তাদের কোনো ভালো কাজ কবুল হওয়ার আশা করা যায়? প্রকৃতপক্ষে এর উত্তর সহীহ বুখারি, 1410 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদীসে পাওয়া গেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহই কেবল হালালকে গ্রহণ করেন।

অতএব, অবৈধ সম্পদের সাথে পবিত্র তীর্থযাত্রা করার মতো যে কোনো কাজ যা হারামের ভিত্তি রয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 3118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন এই ধরনের ব্যক্তিকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

" এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষের মাধ্যমে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের কাছ থেকে শুধু সেই সম্পদই নেবেন যা মহান আল্লাহ তাঁকে নিতে বলেছেন। অতঃপর সে এই সম্পদ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করবে।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের দিন থেকে কীভাবে জিনিসগুলি এত পরিবর্তিত হয়েছে তা লজ্জাজনক। তখনকার দিনে তারা নেতা হয়ে আসলে জনগণের সেবক হয়ে উঠেছিল এবং জনগণের অর্থ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করে নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ জনগণের জন্য ব্যয় করত। অথচ আজকাল নেতা ও রাজপরিবাররা জনগণের সম্পদ ব্যয় করে এমন আচরণ করে যেন তারাই জাতির মালিক।

মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরিদেরকে তাদের আদর্শ হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সকলের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে যা একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে তাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং তারপরে তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাদেরকে প্রথমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এবং তারপর মানুষের অধিকার আদায় করতে হবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করতে।

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাদের ভালোর আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেন।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনই পরিত্যাগ করবে না। একজন মুসলমানকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদের 2928 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

উমর রা.

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের জন্য সঠিকভাবে এবং আন্তরিকভাবে পরামর্শ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে ইসলামের একটি দিক। তাদের নিজস্ব চরিত্রের উপর ভিত্তি না করে পরামর্শ চাওয়া একজনের চরিত্র। এটি প্রকৃতপক্ষে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, যিনি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে একই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা আলাদা এবং একজন ব্যক্তি যা সহনীয় মনে করেন তা অন্যজন নাও হতে পারে তাই প্রশ্নকর্তার চরিত্রের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ দেওয়া ভাল। এই মনোভাব একজনের পক্ষপাতদুষ্ট মতামত দেওয়ার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেবে যা তাদের নিজস্ব চরিত্র এবং জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত।

উপরন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আইনানুগ বিষয়ে লোকেদের সরাসরি পরামর্শ না দেওয়াই ভালো যে কি করতে হবে তার পরিবর্তে তাদের পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং প্রতিটি সম্ভাব্য পছন্দের সুবিধা-অসুবিধার একটি তালিকা একত্রিত করার জন্য সাহায্য করা উচিত এবং তারপর এই তালিকার উপর ভিত্তি করে একটি অবগত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। . এটি সম্ভবত একটি ভাল এবং সন্তোষজনক ফলাফলের দিকে পরিচালিত করবে এবং এটি ভবিষ্যতে একজন ব্যক্তিকে তাদের উপদেষ্টাকে দোষারোপ করতে বাধা দেয় কারণ তারা একটি নির্দিষ্ট বিকল্প বেছে নেওয়ার কথা বলে সরাসরি তাদের পরামর্শ দেয়নি।

পরিশেষে, একজন ব্যক্তির কখনই স্বীকার করতে লজ্জিত হওয়া উচিত নয় যে তারা একটি বিষয়ে অনিশ্চিত এবং প্রয়োজনে অন্যদেরকে আরও যোগ্য কারও কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

একটি সরল জীবন

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, খলিফা হওয়ার পর, জাতির বিষয়গুলি পরিচালনা করা তাকে নিজের এবং তার পরিবারের জন্য জীবিকা অর্জন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। তারপর তাকে একটি সামান্য বেতন বরাদ্দ করা হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে: একটি একক চড়ার পশু, শীতের জন্য একটি পোশাক, গ্রীষ্মের জন্য একটি পোশাক, তার নির্ভরশীলদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার এবং একই পরিমাণ যা মদিনার অন্য কোনো মুসলমানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 223-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আজকের রাজনীতিবিদদের মতো, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও তাঁর সাথে বিলাসবহুল মজুরি দাবি করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা থেকে বিরত ছিলেন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণে একটি সরল জীবনধারা গ্রহণ করেছিলেন।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক,

বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

বিশ্বস্ত সেনাপতি

প্রাথমিকভাবে, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফা (আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খলিফা হিসেবে উল্লেখ করতেন। এক সময় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের গভর্নরকে নির্দেশ দেন যে, তাঁর কাছে দু'জন মুসলিম পাঠাতে যারা তাঁকে ইরাকের জনগণের বিষয়ে অবহিত করতে পারে। তারা পৌঁছে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন এবং তাঁকে বিশ্বস্ত সেনাপতি হিসেবে উল্লেখ করেন। এর পরে তিনি এই উপাধিটি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তরাও তাই করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 228-229-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি এই উপাধিটিকে সত্যিকার অর্থে মূর্ত ও পরিপূর্ণ করেছিলেন যেমন তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে

মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

অন্যদের গাইডিং

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 174-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

করুণা ও করুণা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফত আমলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা হল ধর্মত্যাগী যুদ্ধের সময় বন্দী নারী বন্দীদের তাদের গোত্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যারা অনুতপ্ত হয়ে ইসলামের ধারায় ফিরে এসেছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 180-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এটা না করার অধিকার ছিল কিন্তু ধর্মত্যাগের পর অনুতপ্ত উপজাতিদের প্রতি দয়ার এই কাজটি প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ধর্মত্যাগী যুদ্ধের সময় ইসলামের উপর অটল থাকা মুসলমানদেরকে যারা ধর্মত্যাগ থেকে অনুতপ্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো খারাপ অনুভূতি ত্যাগ করার জন্য এটি ছিল তাঁর পথ।

সকল মুসলমান আশা করেন যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপগুলোকে একপাশে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই

প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

আশীর্বাদ বা অভিশাপ

পরিণতির ভয়ে, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি নিশ্চিত নন যে তিনি একজন খলিফা নাকি রাজা। কেউ একজন উত্তর দিল যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একজন খলিফা শুধুমাত্র জনসাধারণের অন্তর্গত জিনিসগুলি সঠিকভাবে গ্রহণ করেন এবং ব্যবহার করেন। অথচ, একজন রাজা জনগণের জিনিসের অপব্যবহার ও অপব্যবহার করেন। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে, উমর রা. ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 181-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বাস্তবে, সফলতা এবং ব্যর্থতা, আশীর্বাদ এবং অভিশাপের মধ্যে পার্থক্য হল কিভাবে একজন ব্যক্তি যে পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা ব্যবহার করে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের পার্থিব সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো পরিস্থিতিকে ভালো বা খারাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পার্থিব সংজ্ঞা অনুসারে ধনী হওয়া ভাল যেখানে দরিদ্র হওয়া খারাপ। পরিবর্তে, মুসলমানদের উচিত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ঘটনা ও জিনিসের জন্য ভালো-মন্দ উল্লেখ করা। অর্থ, যা কিছু মানুষকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, তা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে খারাপ হলেও ভালো। . আর যা কিছু মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তা ভালো দেখালেও খারাপ।

ইসলামের শিক্ষা জুড়ে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যা এটি প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, কারুন ছিলেন একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি যিনি হযরত মূসা (আঃ) এর সময়ে বসবাস করতেন। তখন এবং এখন অনেক লোক তার সম্পদকে একটি ভাল জিনিস বলে মনে করতে পারে তবে এটি তাকে অহংকারে নিয়ে যাওয়ার কারণে এটি তার ধ্বংসের একটি উপায় হয়ে উঠেছে। তাই তার ক্ষেত্রে ধনী হওয়াটা ছিল খারাপ ব্যাপার। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 79-81।

" অতএব সে তার লোকদের সামনে তার সাজসজ্জায় বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করে, তারা বলেছিল, "হায়, কারুনকে যা দেওয়া হয়েছিল, আমরাও যদি সেরকমই থাকতাম। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন মহান সৌভাগ্যবান। কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলেছিল, "হায় তোমাদের জন্য! যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য আল্লাহর পুরস্কার উত্তম। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত অন্য কাউকে তা দেওয়া হয় না।" এবং আমি তাকে এবং তার ঘরকে মাটিতে গ্রাস করে দিয়েছিলাম। এবং তার জন্য আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার জন্য কোন দল ছিল না এবং সে আত্মরক্ষা করতে পারে না।"

অন্যদিকে, ইসলামের তৃতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুও ধনী ছিলেন তবুও তিনি তার সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতেন। প্রকৃতপক্ষে, একবার বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান করার পর তাকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, সেদিনের পর কোনো কিছুই তার ঈমানের ক্ষতি করতে পারবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩৭০১ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সম্পদ ছিল উত্তম।

উপসংহারে, একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তাদের প্রতিটি অসুবিধার পিছনে প্রজ্ঞা রয়েছে যদিও তারা সেগুলি পালন না করে। তাই তাদের পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভাল বা খারাপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। অর্থ, যদি জিনিসটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে, তবে তা দেখতে খারাপ হলেও ভালো। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অন্যদের পরামর্শ

তাঁর পূর্বসূরিদের মতো, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা জনসাধারণের বিষয়ে অন্যদের সাথে পরামর্শ করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন যে আলোচনা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যে কোনও ভাল নেই। তিনি আরও একবার বলেছিলেন যে একটি পৃথক মতামত একটি একক সুতার মতো, দুটি মতামত দুটি পরস্পর বোনা সুতার মতো এবং তিনটিকে ভাঙা যায় না। তিনি অন্যদেরকে পরামর্শ দিতেন শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করতে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। এমনকি তিনি তার সামরিক কমান্ডারদেরকে তার সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন সদস্যদের, বিশেষ করে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার পরামর্শ দিতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 182-183-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র

আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

ভালো সঙ্গী

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভাল সাহচর্য খোঁজার পরামর্শ দিতেন কারণ খারাপ সাহচর্য উভয় জগতে অনেক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। তিনি একবার তাঁর একজন গভর্নর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, আন্তরিক বন্ধু গ্রহণ করুন এবং মিথ্যাবাদীদের এড়িয়ে চলুন কারণ তারা মাঝে মাঝে সত্য বললেও তারা তার উপকার করতে পারে না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 184-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত হবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে. অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়ায় আক্রান্ত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের অনুপ্রাণিত করবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে

বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। এই মনোভাব বিচারের দিনে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে উঠবে যদিও তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা বৈধ কিন্তু তাদের প্রয়োজনের বাইরে।

পরিশেষে, সহীহ বুখারী, 3688 নং হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সঙ্গ দিয়ে ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তবে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

কুরআনের লোকেরা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যারা পবিত্র কুরআন বুঝতেন এবং আমল করেন তাদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য তাদের কাছে রাখতেন। তিনি তাদের বয়স, সামাজিক অবস্থান বা অন্য কোন জাগতিক লেবেল পর্যবেক্ষণ করেননি। এ কারণে অনেক যুবক নিয়মিতভাবে জড়ো হতেন এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মানুষের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 185-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতে, পবিত্র কুরআনের লোকেরা তারা ছিলেন না যারা কেবল এটি তেলাওয়াত করেছিলেন, তবে যারা এর শিক্ষাগুলি বুঝতেন এবং বাস্তবায়ন করেছিলেন। মুসলমানদের অবশ্যই এই পদ্ধতিতে আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 30 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন বিচারের দিনে সুপারিশ করবে। যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটি অনুসরণ করে তাদের বিচারের দিন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে এটিকে অবহেলা করে তারা দেখতে পাবে যে এটি বিচারের দিন তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেবে।

পবিত্র কুরআন একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এটা নিছক আবৃত্তির বই নয়। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের সমস্ত দিক পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে এটি তাদের উভয় জগতের সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। প্রথম দিকটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করা। দ্বিতীয় দিকটি হল এটি বোঝা। আর চূড়ান্ত দিক হল এর শিক্ষার উপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা। যারা এরূপ আচরণ করে তাদেরকেই দুনিয়ার প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে সঠিক পথনির্দেশের সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বিচার দিবসে এর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এই হাদিস দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে পবিত্র কুরআন কেবলমাত্র তাদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিকভাবে এর দিকগুলোর উপর আমল করে। কিন্তু যারা এর অপব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব জিনিস যেমন খ্যাতি অর্জনের জন্য তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, তারা কিয়ামতের দিন এই সঠিক নির্দেশনা এবং এর সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃতপক্ষে, উভয় জগতে তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি কেবল ততক্ষণ বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য এটি ব্যবহার করা সঠিক নয়

কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। কোন সন্দেহ নেই যে এই ব্যক্তিটি কেবল বোকা।

জ্ঞানের স্তর

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর খিলাফতকালে সঠিক জ্ঞানের স্তর অনুযায়ী জাতির বিষয় পরিচালনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। অর্থ, পবিত্র কুরআন অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, বিদ্বানদের পারস্পরিক ঐকমত্য এবং বিরল ক্ষেত্রে স্বাধীন যুক্তি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 186-188-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রায়কেও পারস্পরিক ঐকমত্য ও স্বাধীন যুক্তির ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 20-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রক্রিয়াটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় একটি ঘটনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর দশম বছরে তিনি ইয়েমেনের একটি প্রদেশ শাসন করার জন্য মুআযত বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে চলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে যদি তাকে বিচারের জন্য মামলা করা হয় তবে তিনি কী করবেন? মুআযত রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যে তিনি পবিত্র কুরআন অনুযায়ী বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে, তিনি যদি পবিত্র কুরআনে মামলা ও তার

বিচার না পান তাহলে কি হবে। তিনি তখন উত্তর দিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস অনুসারে বিচার করবেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন যে, যদি তিনি তার রেওয়ায়েতে মামলা ও তার রায় না পান তাহলে কি হবে। মুআযত, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, অবশেষে উত্তর দিলেন যে তিনি স্বাধীন যুক্তির অর্থ ব্যবহার করবেন, এমন একটি রায় যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন প্রতিনিধি দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন যা তাকে খুশি করেছিল। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, খণ্ড 4, পৃষ্ঠা 140-141-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যখনই একজন পণ্ডিত ইসলামের বিভিন্ন বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন তখনই তারা স্বাধীন যুক্তি বলে একটি স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঐতিহ্যকে তাদের পেশাগত নিরপেক্ষ রায় দিয়ে ইসলামের মধ্যে একটি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করতে দেয়। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 4487 নম্বর, এই পণ্ডিত যখন একটি ভুল রায় দেন তখন তাদের প্রচেষ্টার জন্য এক বার পুরস্কৃত করা হবে। যদি তারা সঠিক রায় দেয় তবে তাদের দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হবে।

সব জন্য ন্যায়বিচার

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বদা সমুন্নত রেখেছিলেন, তা ছিল তাদের বিশ্বাস বা পটভূমি নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায়বিচার। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে একজন ইহুদির পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বিশ্বাসের পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেননি এবং প্রমাণ অনুসারে ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 191-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক

কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহুর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং

বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

সমতা

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা সমুন্নত রেখেছিলেন, তা ছিল তাদের বিশ্বাস বা পটভূমি নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায়বিচার। উদাহরণ স্বরূপ, মিশর থেকে এক ব্যক্তি একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে অভিযোগ করেন যে, তাঁর গভর্নরের ছেলে তাঁর নিজের আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করার সময় তাঁকে অন্যায়ভাবে মারধর করে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আসকে এবং তাঁর পুত্রকে মদিনায় ডেকে পাঠালেন। তারা পৌঁছে তিনি মিশরীয়কে নির্দেশ দিলেন গভর্নরের ছেলের কাছ থেকে তার প্রতিশোধ নিতে। তারপরে তিনি তাকে তার গভর্নরকে আঘাত করার নির্দেশ দেন কিন্তু মিশরীয় লোকটি প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ তাকে আঘাতকারী একমাত্র পুত্র ছিল পিতা নয়। উমর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, তারপর তার গভর্নর, আমর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হন, যিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে মিশরীয় ব্যক্তি তার কাছে অভিযোগ করেনি বলে তিনি এই মামলা সম্পর্কে অবগত নন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 191-192-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র

তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে

পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ছাইয়ের বছর (দুর্ভিক্ষ)

একটি দেহ

তার খিলাফতকালে মদিনা ও এর আশেপাশের অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে বছরটি ছাইয়ের বছর হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পায়। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যতক্ষণ না সমস্ত লোক এই জিনিসগুলি খাওয়ার সামর্থ্য না পায় ততক্ষণ ঘি, দই বা দুধ খাবেন না। এমনকি যখন একজন ব্যক্তি তার কাছে এই জিনিসগুলি উপস্থাপন করেছিলেন, তখন তিনি সেগুলি খেতে অস্বীকার করেছিলেন এবং উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি কীভাবে লোকদের জন্য উদ্বিগ্ন হতে পারেন যখন তিনি তাদের কষ্ট ভোগ করছেন না।

অন্য একটি অনুষ্ঠানে তাকে একটি জবাই করা উটের সেরা অংশগুলি আনা হয়েছিল কিন্তু তিনি তা খেতে অস্বীকার করেছিলেন এবং উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি একজন খারাপ শাসক হবেন যদি তিনি সেরা অংশগুলি খেয়ে থাকেন এবং তার লোকেরা খারাপ অংশগুলি খেয়ে থাকে। পরিবর্তে তিনি অলিভ অয়েলে ভিজিয়ে কিছু রুটি খেয়েছিলেন।

এমনকি তিনি তার গভর্নরদেরকে সাধারণ জনগণ যে মানের খাবার খেতেন সেই একই মানের খাবার খেতে আদেশ দেবেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 193-195-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি সর্বদা নিশ্চিত করেছেন যে তার পরিবার অন্য যে কোনও পরিবারের মতো একইভাবে বাস করে। ছাইয়ের বছরে, তিনি তার ছেলেকে তরমুজ খেতে বাধা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীরা অনাহারে ছিলেন তখন তিনি কীভাবে ফল খেতে পারেন। তিনি মুসলমানদের জন্য এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং নিজের উপর এমন বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন যে লোকেরা তার মৃত্যু হবে বলে আশঙ্কা করেছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 411-412-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারায় যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে যার ফলে তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সমর্থন করার দায়িত্ব ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য যেমন ভালো এবং আন্তরিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এড়াতে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম।

যদিও একজন মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

আভিজাত্য

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা সমুন্নত রেখেছিলেন, তা ছিল তাদের বিশ্বাস বা পটভূমি নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায়বিচার। তাঁর খিলাফতকালে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র তীর্থযাত্রার (হজ্জ) জন্য মক্কায় এসেছিলেন এবং মক্কার একজন বাসিন্দা সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। পরবর্তীদের কিছু চাকর ছিল যারা খাবার পরিবেশন করার পরেও দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের সাথে খেতেন না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন কেন তারা তাদের সাথে যোগ দেয়নি এবং সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিয়েছিলেন যে খাবারটি কেবল তাদের জন্য। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রোধান্বিতভাবে তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তিনি খাওয়া থেকে বিরত থাকা অবস্থায় বান্দাদের খেতে আদেশ করলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 194-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য একটি উপলক্ষ্যে, গাসসানের একজন উপজাতীয় নেতা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় যান, যেখানে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করেন। এই উপজাতীয় নেতা তখন মক্কার দিকে রওনা হন এবং আল্লাহর ঘর, কাবা প্রদক্ষিণ করার সময়, একজন দরিদ্র বেদুইন দুর্ঘটনাক্রমে তার নীচের পোশাকে পা ফেলে যার ফলে উপজাতীয় নেতা বেদুইনটির নাককে আঘাত করে এবং ভেঙে দেয়। আহত বেদুইন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ করলেন। যখন তিনি উপজাতীয় নেতাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে বেদুইনকে ক্ষতিপূরণ দিতে বা সমান প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন, তখন উপজাতীয় নেতা হতবাকভাবে উত্তর দেন যে তিনি একজন রাজা এবং বেদুইন একজন দরিদ্র সাধারণ মানুষ। উমর (রাঃ) তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ইসলামে তারা সমান। উপজাতীয় নেতা চিন্তা করার সময় অনুরোধ করেন এবং গোপনে মক্কা থেকে পালিয়ে যান এবং ধর্মত্যাগ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 197-198-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

আইন সবার জন্য প্রযোজ্য

মিশরের গভর্নর আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র আবদুর রহমানকে মদ পান করার আইনগত শাস্তি কার্যকর করেছিলেন। সাধারণত, এই ধরনের অপরাধ থেকে অন্যদের নিবৃত্ত করার জন্য এই আইনী শাস্তিগুলি প্রকাশ্যে করা হয়, তবে এই ক্ষেত্রে শাস্তি তার নিজের বাড়িতেই করা হয়েছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জানানো হলে তিনি তাঁর গভর্নরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে আইনগত শাস্তি সঠিকভাবে পালন না করার জন্য কঠোর সমালোচনা ও হুমকি দিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে মহান আল্লাহর আইনের ক্ষেত্রে তিনি কখনই লোকেদের প্রতি কোন পছন্দের আচরণ প্রদর্শন করবেন না। তারপর তিনি তাকে তার ছেলেকে মদিনায় পাঠানোর নির্দেশ দেন, যেখানে তিনি প্রকাশ্যে তাকে আবার আইনী শাস্তি দেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 196-197-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার

মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

খারাপ উপাদান অপসারণ

যদিও উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, ইসলামী ভূমিতে বসবাসকারী অমুসলিমদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন, তবুও তিনি কাউকে তাঁর সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করতে দেননি। খায়বার ও নাজরানে বসবাসকারী অমুসলিমরা যে শর্তে রাজি হয়েছিল তা মেনে চলেনি এবং তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) একবার খায়বারে তাঁর সম্পত্তি পরিদর্শন করার সময় আক্রমণ করে গুরুতর আহত হন। বাকি অমুসলিমরা যারা তাদের পরিকল্পনায় অংশ নেয়নি তাদের শান্তিতে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি যখন তিনি তাদের বহিষ্কার করেছিলেন তখন তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে তাদের সম্পদ এবং নতুন সম্পত্তি দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 206-208-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রদায় থেকে খারাপ উপাদানগুলি অপসারণ করা সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে

পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনই পরিত্যাগ করবে না। একজন মুসলমানকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদের 2928 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

শিক্ষার গুরুত্ব

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি জনগণের উপর গভর্নর নিয়োগ করেননি যাতে তারা তাদের ক্ষতি করে, তাদের সম্মানের অপবাদ দেয় বা তাদের সম্পদ দখল করে। বরং তিনি তাদেরকে নিযুক্ত করেছেন যাতে তারা মানুষকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিক্ষা দেয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 210-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে তবে স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। কেবলমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ে আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা বাস্তবে আমল না করলেও 1000 সাইকেল নামাজ পড়ার সওয়াব পাবে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে

তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠরা আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তাদের আচরণ এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম কারণ তারা মহান আল্লাহর উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা তারা বোঝে না। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

অন্যদের রক্ষা করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি জনগণের উপর গভর্নর নিয়োগ করেননি যাতে তারা তাদের ক্ষতি করে, তাদের সম্মানের অপবাদ দেয় বা তাদের সম্পদ দখল করে। বরং তিনি তাদেরকে নিযুক্ত করেছেন যাতে তারা মানুষকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিক্ষা দেয়। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে যদি তাদের গভর্নর দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রতি অবিচার করা হয় তবে তাদের তার কাছে আসা উচিত এবং তিনি বিষয়টি মিমাংসা করবেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 210-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণ, তাদের সম্পদ ও সম্মান রক্ষার গুরুত্ব বুঝতেন।

সহীহ বুখারির ৬৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামে একজন মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি ও সম্মান পবিত্র।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় যে, সফলতা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ আল্লাহর অধিকার, যেমন ফরজ নামাজ এবং মানুষের অধিকার পূরণ করে। একটি ছাড়া অন্যটি যথেষ্ট ভাল নয়।

একজন প্রকৃত মুমিন ও মুসলমান সেই ব্যক্তি যে নিজের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই, মুসলমানদের জন্য তাদের কাজ বা কথার মাধ্যমে অন্যদের ক্ষতি না করা জরুরী।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যের সম্পত্তিকে সম্মান করতে হবে এবং অন্যায়ভাবে সেগুলি অর্জন করার চেষ্টা করবেন না, উদাহরণস্বরূপ, একটি আইনি মামলায়। সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত একটি হাদিস, 353 নম্বরে সতর্ক করা হয়েছে যে যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে জাহান্নামে যাবে, যদিও তাদের অর্জিত জিনিসটি একটি গাছের ডালের মতো নগণ্য হয়। মুসলমানদের উচিত অন্যের সম্পত্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা এবং তাদের মালিককে খুশি করার উপায়ে ফিরিয়ে দেওয়া।

গীবত বা অপবাদের মতো কাজ বা কথার মাধ্যমে একজন মুসলমানের সম্মান লঙ্ঘন করা উচিত নয়। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্মান রক্ষা করা তাদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে, কারণ এটি তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জামে আত তিরমিযী, 1931 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, অন্যেরা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে অন্যের নিজের, সম্পত্তি বা সম্মানের প্রতি অন্যায় করা এড়াতে হবে। যেমন একজন নিজের জন্য এটি পছন্দ করে তাদের অন্যদের জন্য এটি পছন্দ করা উচিত এবং তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা উচিত। জামে আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত মুমিনের চিহ্ন।

উপযুক্ত চিকিৎসা

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, নিশ্চিত করতেন যে সমস্ত লোকের সাথে ন্যায্য আচরণ করা হয়েছে, এমনকি যারা কর্তৃপক্ষের দ্বারা অপরাধ করার জন্য সন্দেহ করা হয়েছিল। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে একজন ব্যক্তি ভালভাবে একটি অপরাধ স্বীকার করতে পারে যা তারা করেনি যদি তারা ভীত, আটক এবং ক্ষুধার্ত থাকে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 210-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা অন্য সকলের সাথে ন্যায্য আচরণ প্রসারিত করবে।

সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক

ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকেরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে তা নিশ্চিত করেছিলেন, তারা যেই হোক না কেন। তিনি এটিকে এতটাই জোর দিয়েছিলেন যে একবার তিনি জনগণের কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে যদি তারা তার থেকে কোনও বিচ্যুতি দেখেন তবে তারা তাকে কথা বলবেন এবং তাকে সোজা করবেন। একজন লোক দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল যে তারা তাদের তলোয়ার দিয়েও তাকে সোজা করবে। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তারপর এই ধরনের লোকদের দ্বারা বেষ্টিত থাকার জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

অন্য এক অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন যে, তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি যিনি তার দোষগুলো তুলে ধরেন।

তিনি একবার বলেছিলেন যে তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি বিচারে ভুল করবেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধার কারণে কেউ তাকে সংশোধন করবে না।

একবার এক ব্যক্তি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, মহান আল্লাহকে ভয় করতে। লোকেরা তাকে চুপ করতে চেয়েছিল তবুও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছিলেন যে, যারা ভাল কথা বলে না তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই এবং যারা ভাল কথা শোনে না তাদের মধ্যে কোন ভাল নেই। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 213-214-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদি কেউ ধার্মিক পূর্বসূরিদের জীবনাদর্শ অধ্যয়ন করে তবে তাদের এবং আজকের মুসলমানদের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একটি বড় পার্থক্য হ'ল লোকেরা তাদের প্রতি সাড়া দেওয়ার উপায় যারা ভাল আদেশ দেয় এবং মন্দ নিষেধ করে, যা তাদের জ্ঞান অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য একটি কর্তব্য। এই আচরণগত পরিবর্তন বোঝা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনেক তর্ক এবং শত্রুতা প্রতিরোধ করতে পারে। অতীতে মুসলমানরা তাদের ভালবাসত যারা তাদের ভাল কাজের পরামর্শ দিত এবং খারাপ কাজের বিরুদ্ধে সতর্ক করত। প্রকৃতপক্ষে, তারা কাউকে আন্তরিক বন্ধু মনে করে না যতক্ষণ না তারা তাদের সাথে এইভাবে আচরণ করে। তারা আসলে তাদেরকেও ভালোবাসত যারা তাদেরকে এমন বিষয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দিত যেগুলো ইসলামে পাপ হিসেবে বিবেচিত হয় না কিন্তু শুধুমাত্র অপছন্দনীয় বিষয় ছিল। এটিই প্রধান পরিবর্তন যা ঘটেছে। অনেক মুসলিম আজকাল এই পদ্ধতিতে গঠনমূলক সমালোচনা করা অপছন্দ করে। যেসব ক্ষেত্রে বেআইনি ঘটনা ঘটছে, সেক্ষেত্রে অন্যরা তাদের আচরণ অপছন্দ করলেও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এর বিরুদ্ধে নম্রভাবে এবং সদয়ভাবে সতর্ক করা একজন মুসলমানের কর্তব্য। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেখানে অন্যরা পাপ করছে না বরং নিছক অপছন্দনীয় কাজ করছে, একজন মুসলমানের জন্য তাদের জন্য তাদের সমালোচনা না করাই ভালো কারণ এটি কেবল শত্রুতা, তর্ক-বিতর্কের দিকে নিয়ে যাবে এবং এটি একজনকে উপদেশ ত্যাগ করার কারণও হতে পারে। অন্যরা কারণ তারা প্রাপ্ত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া. ব্যতিক্রম হল যখন একজনকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সে এমনভাবে উপদেশ দেওয়া পছন্দ করে। অতএব, একজন মুসলমান যে তাদের দায়িত্ব পালন করতে চায় এবং অন্যদের সাথে তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলতে চায়, তার উচিত ভাল আদেশ দেওয়া এবং হারামের বিরুদ্ধে সতর্ক করা তবে এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না এমন জিনিসগুলিকে বাদ দেওয়া।

সমান চিকিৎসা

খুতবা দেওয়ার সময়, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের (যারা কর্তৃত্বে আছেন) শুনতে এবং মানতে বলেছিলেন। একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিল যে তারা শুনবে না বা মানবে না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শান্তভাবে তাঁকে নিজের ব্যাখ্যা দিতে বললেন। লোকটি বলেছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দুইটি পোশাক পরিধান করছিলেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সরকারি কোষাগার থেকে একটি করে পোশাক দেওয়া হয়েছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে ডেকে পাঠালেন, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর পিতাকে তাঁর একক পোশাক উপহার হিসেবে দিয়েছেন। লোকেরা যখন সন্তুষ্ট হল, তখন লোকটি উত্তর দিল যে তারা তার কথা শুনবে এবং মান্য করবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 214-215-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, প্রত্যেকের সাথে সমান আচরণ করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যদি না কিছু সুস্পষ্ট কারণ না থাকে যে কেন কেউ কেউ অগ্রাধিকারমূলক আচরণ পাবেন, যেমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা।

অন্যদের সাথে তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় তাদের সাথে আচরণ করে কেউ এই মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে।

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত

প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান তাদের বিশ্বাস হারাবে যদি তারা এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলমান তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তার অন্তর হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভাল কামনা করা তাদের ভাল জিনিসগুলিকে হারিয়ে ফেলবে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলমান মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী উপদেশ দেয়, তখন তাদের উচিত এমনভাবে করা উচিত যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"... সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই উত্সাহ একজন মুসলমানকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেকে মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সত্যকে গ্রহণ করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন, তা কোথা থেকে বা কারা থেকে আসুক না কেন। তিনি একবার পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে লোকেরা কীভাবে তাদের কনেদের প্রচুর পরিমাণে যৌতুক দিচ্ছে এবং ভয় পেয়েছিল যে এটি লোকেদের বিয়ে করা কঠিন করে তুলবে। ফলস্বরূপ তিনি এটির উপর একটি সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। একটি খুতবার সময় তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেন এবং বলেছিলেন যে কেউ যদি তার নির্ধারিত সীমার উপরে দেয় তবে তিনি অতিরিক্ত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করে সরকারী কোষাগারে জমা দেবেন। তখন একজন মহিলা উঠে দাঁড়ালেন এবং পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান যেটি নির্দেশ করে যে কেউ যা ইচ্ছা যৌতুক দিতে পারে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 20:

"কিন্তু যদি আপনি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রীকে দিতে চান এবং আপনি তাদের একজনকে প্রচুর পরিমাণ [যৌতুকে] দিয়ে থাকেন, তবে তা থেকে কিছু [ফেরত] নেবেন না। তুমি কি একে অন্যায় ও প্রকাশ্য পাপে গ্রহণ করবে?"

যদিও এই আয়াতটি একজনকে বড় যৌতুক দিতে উত্সাহিত করে না, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে তিনি ভুল ছিলেন এবং মহিলাটি সঠিক ছিল এবং তাই প্রকাশ্যে তার প্রাথমিক রায়কে উল্টে দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 215-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জেদ থেকে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা অহংকারের লক্ষণ।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

" আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে

কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

ঘৃণা বনাম মত প্রকাশের স্বাধীনতা

আজকের অনেক লোকের বিপরীতে, উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সমাজের মধ্যে ঘৃণা ছড়ানোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছিলেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতা একজনকে নিপীড়নের ভয় ছাড়াই শান্তিপূর্ণ এবং সম্মানজনক উপায়ে তাদের গঠনমূলক সমালোচনা করতে দেয়। অন্যদিকে, ঘৃণা ছড়ানোর সাথে অগঠনমূলকভাবে মানুষ এবং তাদের বিশ্বাসের সমালোচনা এবং অপমান করা জড়িত। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার লক্ষ্য হল সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমানা ধ্বংস করা এবং পরিবর্তে তাদের মধ্যে বন্ধন জোরদার করা যাতে সবাই উপকৃত হয়। যেখানে, ঘৃণা ছড়ানোর অর্থ বিপরীত হয়, এটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে এবং অনৈক্যের দিকে নিয়ে যায়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ঘৃণা ছড়ানোর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ইসলামী নীতিগুলিকে সমুন্নত রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার একজন ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে এবং অবিরামভাবে একজন মুসলিমকে অপবাদ দেওয়ার জন্য কারারুদ্ধ করেছিলেন। সমাজের মধ্যে এই ধরনের বিদ্বেষ না ছড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবশেষে তিনি সেই ব্যক্তিকে মুক্তি দেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 217-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

বেশি প্রশংসা করা

এক ব্যক্তি একবার উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর দারিদ্র্য পর্যবেক্ষণের পর বললেন যে, তিনি খলিফা হওয়ার কারণে সর্বোত্তম খাবার, একটি সুন্দর পর্বত এবং সুন্দর পোশাকের সবচেয়ে বেশি অধিকারী ছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 224-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যের প্রশংসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

এটি একটি অপছন্দনীয় কাজ কারণ এটি প্রথমত পাপ হতে পারে যদি প্রশংসা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হয়। বিশেষ করে লোকেদের প্রশংসা করা সত্য হলেও, অজ্ঞরা তাদের গর্বিত হতে পারে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য কারণ একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রশংসা করা এমনকি প্রশংসিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করেছে, এবং তাই তাঁর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই।

একজন মুসলমানকে অন্যের প্রশংসায় প্রতারিত করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং অভ্যন্তরীণ লুকানো চরিত্র অন্য যেকোনো ব্যক্তির

চেয়ে ভালো জানে। মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্যবার মানুষের কাছ থেকে তাদের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা নিয়ে চিন্তা করলে তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। উপরন্তু, তাদের মনে রাখা উচিত যে তারা যে প্রশংসিত গুণের অধিকারী, তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন, তাই সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া, তাদের কাছে থাকা নেয়ামতগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। বরং তাদের উচিত অন্যদেরকে এই হাদিস সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের প্রশংসা না করার জন্য সতর্ক করা।

শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে অন্যের প্রশংসা গ্রহণযোগ্য এবং তাদের প্রশংসা করা উচিত নয়, সত্যের সাথে লেগে থাকা এবং এটি করা উচিত যাতে তাদের আরও ভাল কাজ করতে উত্সাহিত করা যায়। এটি বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন, তাদের স্কুলের কাজের সম্মানে তাদের প্রশংসা করা, ভালো আচরণ করা এবং ইসলামের দায়িত্ব পালন করা।

বিশ্বস্ত

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, একবার এক ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তাকে আরও বিলাসবহুল জীবন অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছিল যে লোকদের সাথে তার উদাহরণ ছিল একদল লোক যারা ভ্রমণে বের হয়েছিল। লোকেরা তাদের সম্পদ একক ব্যক্তিকে দিয়েছিল এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন তাকে ব্যয় করতে বলেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মন্তব্য করেন যে, এই ব্যক্তির পক্ষে ঐ সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা এবং অন্যদের অবহেলা করা ঠিক হবে না। এটি ছিল তাঁর এবং তাঁর সম্প্রদায়ের উদাহরণ। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 224-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

ইসলামিক ক্যালেন্ডার

একবার উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি দলিল পেয়েছিলেন যাতে শুধুমাত্র মাসটি লেখা ছিল। তাই, নথিতে উল্লেখিত বছর তিনি কাজ করতে পারেননি। তারপর তিনি একটি ইসলামী ক্যালেন্ডার তৈরি করার জন্য প্রবীণ সাহাবীগণকে একত্র করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাদের ক্যালেন্ডার শুরু হওয়া উচিত যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদিনায় হিজরত করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 225-227-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ছিল ঐক্যের আরেকটি কাজ, যা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, কারণ সেই সময়ের লোকেরা অতীতের ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে সময়ের বিচার করবে, যার মধ্যে কিছু প্রাক-ইসলামী জাহেলী যুগের সাথে যুক্ত ছিল। ইসলামিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন এটি এড়িয়ে যায় এবং পরিবর্তে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করে।

মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙঘন করা উচিত নয় । প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

শেষ দিনের ভয়

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কেয়ামতের প্রতি ক্রমাগত চিন্তা করতেন এবং বাস্তবিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। এক বেদুইন একবার তার কাছে কিছু সম্পদ চেয়েছিল এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে বিচারের দিন তাকে তার নেতৃত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, যেদিন জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়া আর কোন গন্তব্য ছিল না। এতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 230-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজনকে অবশ্যই উমর (রাঃ) এর মনোভাব অনুকরণ করতে হবে, যাতে তারা তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে কার্যত বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হয়।

তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে সাড়া দেবে সে চূড়ান্ত আহ্বান সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ পাবে। অথচ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ডাকে গাফিলতি করে জীবনযাপন করে, সে দুনিয়াতে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙ্গার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে, যা তাদের জন্য ধৈর্য্য ধরা ও সাড়া দেওয়া বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। . একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বানটি ঘটবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয় তবে এটি বোধগম্য হয় যে কেউ গাফিলতিতে বাস করার পরিবর্তে এখনই, আজকে এর প্রতিক্রিয়া জানাবে। যদি কেউ গাফিলতি করে শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায় তবে কোনো কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

নিজের স্টক নেওয়া

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর অভ্যাস ছিল ক্রমাগত তার কর্মের প্রতি চিন্তাভাবনা করা এবং সেগুলি সংশোধন করার। তিনি একবার বাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলেন এবং একজনকে তার পথ থেকে সরে যেতে বললেন এবং তার লাঠি দিয়ে তার পোশাকের প্রান্তটি প্রসারিত করলেন। পরের বছর তিনি একই ব্যক্তিকে দেখেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি পবিত্র তীর্থযাত্রা করতে যাচ্ছেন কিনা। লোকটি ইতিবাচক উত্তর দিলে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তাকে 600টি রৌপ্য মুদ্রা দেন এবং তাকে তার প্রয়োজনে ব্যয় করতে বলেন এবং মন্তব্য করেন যে এই সম্পদ আগের বছরের জন্য ছিল। বাজারে লোকটি উত্তর দিল যে সে যা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশেষে উত্তর দিলেন যে তিনি কখনও ভুলে যাননি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 231-232-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, সেই লোকটির কোনো ক্ষতি করেননি তবুও সুযোগ পেলেই তিনি তার কাজ সংশোধন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অবিশ্বাসের পরে সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজটি অন্যের প্রতি জুলুম করা।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া

হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু লোকেরা এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিন তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

দাঁড়িপাল্লা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কেয়ামতের দিন তার জবাবদিহির বিষয়ে সর্বদা ভীত থাকতেন। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে যদি একটি ভেড়ার বাচ্চা ফোরাতের তীরে (ইসলামী জাতির প্রান্তে) মারা যায় তবে তিনি ভয় পান যে মহান আল্লাহ তাকে এর জন্য জবাবদিহি করবেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 232-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে

আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

আগুন এড়িয়ে চলা

নিজেকে জাহান্নামের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং বাস্তবিকভাবে তা এড়াতে চেষ্টা করার জন্য, উমর ইবন আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি আগুন জ্বালাতেন এবং তার উপর হাত রাখতেন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করতেন যে তিনি এটি সহ্য করতে পারেন কিনা। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 234-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মনে রাখার বিষয় হল যে বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যারা জাহান্নামে শেষ হবে তারা তাদের পাপের আকারে এই দুনিয়া থেকে তাদের সাথে জাহান্নামে আগুনের মুখোমুখি হবে। যখন একজন মুসলমান এই বাস্তবতাকে তাদের মনের মধ্যে খোদাই করে, তখন তারা প্রতিটি পাপ, বড় বা ছোট, অসহনীয় আগুনের টুকরো হিসাবে পর্যবেক্ষণ করবে। একজন ব্যক্তি যেভাবে দুনিয়াতে আগুন এড়িয়ে চলে, সেভাবে তার পাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, কারণ প্রকৃতপক্ষে গুনাহ গুপ্ত আগুনের মতো যা তাকে পরকালে দেখানো হবে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের গাফিলতিতে জীবনযাপন করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তারা এই মৌখিক সমর্থন ছাড়াই কেবলমাত্র আল্লাহ, মহান, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা দাবি করতে পারে। কর্ম সহ ঘোষণা। যদি এটা সত্য হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য এতটা কঠোর পরিশ্রম করতেন না এবং তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম ও বিচার দিবসকে তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে ভালো বুঝতেন। সহজ কথায়, কর্ম ছাড়া প্রেমের ঘোষণা কাউকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, কিছু মুসলমান বিচার দিবসে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যে

মুসলিমরা ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করা ছেড়ে দেয় তাদের বোঝা উচিত যে তাদের মনোভাব তাদের মৃত্যুর আগে তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে যাতে তারা বিচার দিবসে অমুসলিম হিসাবে প্রবেশ করে , যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

একইভাবে বর্ম ও ঢাল ছাড়া যুদ্ধে প্রবেশ করা যাবে না একজন মুসলমানের সৎকর্মের বর্ম ও ঢাল ছাড়া বিচার দিবসে প্রবেশ করা উচিত নয়। অন্যথায়, যে সৈনিকের কোন সুরক্ষা নেই সে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, একইভাবে একজন মুসলমান যে বিচার দিবসে পৌঁছাবে, যিনি মহান আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষা ব্যতীত, যার মধ্যে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। তার নিষেধ এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করা। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে তারা যে বস্তুজগতের ভোগ-বিলাস ও ভোগ-বিলাস উপভোগ করেছে তা জাহান্নামে শেষ হলে তাদের ভালো লাগবে না। আসলে, এটা তাদের খারাপ বোধ করবে।

সঠিক উপলব্ধি

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার একটা আবর্জনার স্তূপের পাশ দিয়ে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন। যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে তার সঙ্গীরা যা করছে তা অপছন্দ করে সে মন্তব্য করেছিল যে এটি সেই বিশ্বের ফলাফল যা তারা খুব যত্ন করে এবং মজুত করতে পছন্দ করে। এটি ছিল তার ফলাফল যা তারা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল এবং তাদের প্রয়োজনের জন্য নির্ভর করেছিল। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৭২ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, শাশ্বত পরকাল এবং ক্ষণস্থায়ী জড় জগতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছিলেন কারণ তিনি সঠিক উপলব্ধি গ্রহণ করেছিলেন।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয় তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে

ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন।

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

অস্থায়ী বনাম চিরন্তন

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি প্রতিফলন করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে তিনি যদি এই পৃথিবীতে আরাম চান তবে তিনি পরবর্তী পৃথিবীতে তার স্থায়ী আরামের ক্ষতি করবেন। এবং যদি সে আখেরাত চায়, তবে তাকে এই দুনিয়ার (অতিরিক্ত) আরাম ত্যাগ করতে হবে। তাই তিনি অস্থায়ী আবাস পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে এই জীবনে (স্থায়ী পরকালের স্বার্থে) কিছুটা অস্বস্তি সহ্য করা অবশ্যই ভাল। এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ইমাম আল আসফাহানী, হিলিয়াত আল আউলিয়া, সংখ্যা 79।

যখন লোকেরা, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে, ছুটিতে যায় তারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি প্যাক করে এবং হয়ত একটু অতিরিক্ত কিন্তু তারা অতিরিক্ত প্যাকিং এড়াতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা যে পরিমাণ অর্থ তাদের সাথে নিয়ে যায় তা তারা বিদেশে থাকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে। যখন তারা পৌঁছায় তখন তারা প্রায়ই এমন একটি হোটেলে থাকে যেখানে সাধারণত কিছু অতিরিক্ত জিনিসের সাথে বসবাসের প্রধান প্রয়োজনীয়তা থাকে। যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে একই গন্তব্যে ফিরে আসবে না তারা কখনই একটি বাড়ি কিনবে না কারণ তারা দাবি করবে যে তাদের থাকার সময় কম এবং তারা ফিরে আসবে না। তারা তাদের ছুটির সময় চাকরি পায় না এই দাবি করে যে তারা ছোট থাকে তাই তাদের বেশি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নেই। তারা বিয়ে করে না বা বাচ্চাদের দাবি করে যে ছুটির গন্তব্য তাদের জন্মভূমি নয় যেখানে তারা বিয়ে করবে এবং সন্তান ধারণ করবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি হল ছুটির নির্মাতাদের মনোভাব এবং মানসিকতা।

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা শীঘ্রই এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে যার অর্থ, তারা ছুটিতে থাকার মতোই এই পৃথিবীতে থাকা অস্থায়ী, এবং তারা বিশ্বাস করে যে পরকালে তাদের থাকার স্থায়ী হবে, তারা এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয় না। তারা যদি সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের কাছে ছুটির মতোই স্বল্প সময় আছে, তবে তারা তাদের বাড়িতে খুব বেশি প্রচেষ্টা নিবেদন করবে না এবং পরিবর্তে একটি সাধারণ বাড়িতে সন্তুষ্ট থাকবে যেমন ভ্রমণকারী একটি সাধারণ হোটেলে সন্তুষ্ট। সুতরাং বাস্তবে, এই পৃথিবীটি উদাহরণে ছুটির গন্তব্যের মতো এখনও, মুসলমানরা এটিকে একের মতো বিবেচনা করে না। পরিবর্তে, তারা অনন্ত পরকালকে অবহেলা করে তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা তাদের দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য উৎসর্গ করে। কখনও কখনও বিশ্বাস করা কঠিন যে কিছু মুসলমান প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী পরকালে বিশ্বাস করে যখন কেউ দেখে যে তারা অস্থায়ী জগতের জন্য কতটা প্রচেষ্টা নিবেদন করে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং দুনিয়ার প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার উপদেশ দিয়েছেন সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা যেন এই পৃথিবীকে স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ না করে বরং এর মতো আচরণ করে। একটি ছুটির গন্তব্য।

একটি গাছের ছায়া

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করতে রওয়ানা হন। তার ভ্রমণের সময়, তার জন্য কোন তাঁবু স্থাপন করা হয়নি এবং তিনি পরিবর্তে একটি গাছের উপর একটি চাদর বা একটি মাদুর রেখেছিলেন এবং তার নীচে নিজেকে ছায়া দিতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 237-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি সত্যিই এই জড় জগতে একজন ভ্রমণকারী হিসাবে বাস করেছিলেন, ঠিক তার পূর্বসূরিদের মতোই।

জামে আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি নিয়ে চিন্তিত নন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর উদাহরণ হল একজন সওয়ারীর মতো যে একটি গাছের ছায়ায় সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম এবং তারপর এটিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তিই একজন ভ্রমণকারী যারা এই পৃথিবীতে খুব সীমিত সময়ের জন্য অবস্থান করে যেখানে তারা অর্থ, আত্মার জগত থেকে এসেছেন এবং তারা যেখানে যাচ্ছেন যা অনন্ত পরকাল। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবী তুলনামূলকভাবে বাস স্টপে অপেক্ষা করার মতো। এ হাদীসে এ পৃথিবীকে ছায়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হল একটি ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না

এবং লোকেরা এমনকি খেয়াল না করেও দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যায় যা একজন ব্যক্তির দিন এবং রাত ঠিক কীভাবে কেটে যায়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণকারীর হোটেল বা হোটেলের কথা উল্লেখ করেননি কারণ এগুলো শক্ত কাঠামো যা স্থায়ীত্ব নির্দেশ করে। একটি বিবর্ণ ছায়া এই বস্তুজগতকে আরও ভালভাবে বর্ণনা করে। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন তারা সর্বদা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি মুহুর্তের মতো ফ্ল্যাশ করেছে এবং অনুভব করেছে। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা এটা (বিচার দিবস) দেখবে, সেদিন এমন হবে যে, তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আরোহীকে ইঙ্গিত করেছেন যে কেউ হাঁটবে না কেননা যে হাঁটছে সে আরোহীর চেয়ে গাছের ছায়ায় বেশি বিশ্রাম নেবে। এটি আরও নির্দেশ করে যে মানুষ এই পৃথিবীতে কতটা সীমিত সময় ব্যয় করে।

ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া একজনের গুরুত্ব নির্দেশ করে বস্তুগত জগতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বিধানগুলি পাওয়ার জন্য ঠিক যেমন রাইডার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমন বিশ্রাম। তাই একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুত হয়ে এই দুনিয়া থেকে অবিলম্বে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে এই দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য একজনকে বস্তুগত জগতকে ব্যবহার করা উচিত। রাইডার বিশ্রাম নেয় এবং মুসলমানদের অবশ্যই অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে তাদের সময় উৎসর্গ করার পরিবর্তে এমন জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে যা তাদের আখেরাতের জন্য উপকারী হবে যা বিচারের দিনে তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, হায়!

কোম্পানী অফ দ্য গ্রেটস

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার আরও আরামদায়ক জীবনযাপন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তিনি পবিত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণের কঠিন ও সরল জীবনযাপনের কথা উল্লেখ করে উত্তর দেন, যারা ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন এবং তারপর মন্তব্য করেছেন যে তিনি মনে মনে বলেছেন যে তিনি যদি শেয়ার করতে পারেন। দুনিয়াতে তাদের কিছু কষ্ট, তারপর হয়তো তিনি আখেরাতে তাদের কিছু আরাম ভাগ করে নিতে পারেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৭৪ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি যদি তাদের পথ ছাড়া অন্য পথ বেছে নেন, তবে তিনি পরকালে তাদের সাথে শেষ করবেন না।

প্রত্যেক মুসলমান খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে, তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবী-রাসুল (সঃ) এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্‌ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি যে কিভাবে একজন সত্যিকারের ভালোবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, হাশরের দিনে তারা কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র ও শিক্ষার উপর অধ্যয়ন ও আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা

তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

সেরা

একজন প্রবীণ সাহাবী, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে যদিও উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় হিজরত করেন তাদের মধ্যে প্রথম নন (তিনিই প্রথম ছিলেন না) ইসলাম গ্রহণ করা) তবুও তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ তিনি ছিলেন জড়জগত থেকে সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 238-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটিকে আরও একজন সিনিয়র সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বারা সমর্থিত, যিনি একবার ইঙ্গিত করেছিলেন যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, মহানবী (সাঃ) এর পরে সর্বোত্তম দল ছিলেন। , কারণ তারা অন্য কারো চেয়ে জড় জগত থেকে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন এবং পরকালের জন্য অন্য কারো চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত। ইমাম আবু নাঈম আল-আসফাহানীর হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাত আল আসফিয়া, ২৭৮ নং বর্ণনায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর (রাঃ) এবং বাকি সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে সঠিক মানসিকতা গ্রহণ করেছিলেন। একটি মানসিকতা যা তাদেরকে বস্তুগত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে এবং তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে চিরন্তন পরকালের দিকে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে মনোনিবেশ করতে দেয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং

অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

ধার্মিক হওয়া

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য মুসলমানদের মতোই সরকারি কোষাগার থেকে খাওয়ার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজের সম্পদ থেকে খেতেন। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি ভীত ছিলেন যে, সরকারী কোষাগার থেকে আখেরাতের খাবার তার পেটে আগুন হয়ে যাবে।

আরেকবার এক ভৃত্য তাকে দুধ দিল। স্বাদ গ্রহণের পর তিনি এর উৎপত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ভৃত্য তাকে বলল যে তার উটের দুধ ফুরিয়ে যাওয়ায় সে সরকারী কোষাগারের একটি উট দোহন করে তাকে দিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং তখনই পান করেন যখন তিনি কয়েকজন সিনিয়র সাহাবীর কাছ থেকে অনুমতি পান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

আরেকবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মধু খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। কিছু মধু সরকারি কোষাগারে ছিল কিন্তু তিনি তা গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন যতক্ষণ না তিনি জনগণের কাছ থেকে তা ব্যবহারের অনুমতি পান।

ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 238-240-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

হালাল পরিহার করে হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন। এই মনোভাব তাকওয়ার দিকে নিয়ে যায়।

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর।

তাকওয়া বলতে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি অন্যদের সাথে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত করে যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

ধার্মিকতার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক শুধু হারাম নয়। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর যেটা বেআইনীর কাছাকাছি, তার মধ্যে পড়া তত সহজ। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করে এবং শুধুমাত্র হালাল জিনিস ব্যবহার করে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে।

সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা এক আকস্মিক পদক্ষেপে নয় ধীরে ধীরে ঘটেছে। অর্থ, ব্যক্তিটি

হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার অর্থ, যে কথার কোনো উপকার হয় না বা পাপও হয় না, তা প্রায়শই গীবত, মিথ্যা ও অপবাদের মতো খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক বক্তৃতা না করে প্রথম পদক্ষেপটি এড়িয়ে যায় তবে সে মন্দ কথা এড়িয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত পূর্বে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা, যার একটি শাখা হল নিরর্থক ও সন্দেহজনক বিষয়গুলিকে এড়িয়ে চলার ভয়ে যে তারা হারামের দিকে নিয়ে যাবে।

আল্লাহর বান্দা (সুবহানাহু ওয়া তায়ালার)

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সূর্যের তাপে হাঁটছিলেন এবং এক যুবক গাধায় চড়ে তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, লোকটির পিছনে আরোহণ করতে বলেছিলেন কিন্তু তিনি তার পরিবর্তে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সওয়ারীর প্রস্তাব দেন। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর জোর দিয়েছিলেন যে যুবকটি তার সাথে মাউন্টে আরোহণ করবে সামনের দিকে, উচ্চতর অবস্থানে যখন সে পিছনে চড়বে। লোকেরা তাকে এ অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 241-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে তখনকার দিনে গাধায় চড়া একটি আদর্শ অভ্যাস ছিল, তাই তিনি অন্য সবার মতো আচরণ করতে এবং তারা যা করতেন তা করতে লজ্জাবোধ করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এইভাবে আচরণ করা তার মর্যাদাকে কোনভাবেই হ্রাস করেনি। তিনি মহান আল্লাহর দাস ছিলেন, পার্থিব বিলাসের দাস ছিলেন না।

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে তাদের কামনা-বাসনা এবং অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এবং এটি তাদের জন্য নির্দেশিত যারা অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসগুলিকে এমনভাবে অনুসরণ করে যে এটি তাদের সঠিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে অবহেলা করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পরকাল এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা পায় না তখন তারা তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

মুসলমানদের বরং ধৈর্য্য ও সন্তুষ্ট থাকতে শেখা উচিত তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের ঐশ্বর্য। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি হল অভাবী অর্থ, দরিদ্র যদিও তার কাছে অনেক সম্পদ আছে। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে জানা, মহান, মানুষকে তাদের জন্য সর্বোত্তম কী দান করেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

"আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

জনগণের সেবা করা

গরমের দিনে ইরাক থেকে একটি প্রতিনিধি দল উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এর সাথে দেখা করেন। তারা তাকে পাবলিক কোষাগারের উটের যত্ন নিতে দেখেছিল, যা বিধবা, এতিম এবং অভাবীদের সেবা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। কেউ একজন মন্তব্য করলেন যে, তিনি উটের সাথে খাদেমদের লেনদেন করতে দেবেন কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে, তাঁর চেয়ে বড় সেবক কে হতে পারে। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে, যাকে মুসলমানদের বিষয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে সে একজন প্রভুর চাকরের পদে রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 241-242-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের দিন থেকে কীভাবে জিনিসগুলি এত পরিবর্তিত হয়েছে তা লজ্জাজনক। তখনকার দিনে তারা নেতা হয়ে আসলে জনগণের সেবক হয়ে উঠেছিল এবং জনগণের অর্থ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করে নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ জনগণের জন্য ব্যয় করত। অথচ আজকাল নেতা ও রাজপরিবাররা জনগণের সম্পদ ব্যয় করে এমন আচরণ করে যেন তারাই জাতির মালিক।

মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরিদেরকে তাদের আদর্শ হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সকলের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে যা একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে তাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং তারপরে তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা

উচিত নয়। তাদেরকে প্রথমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাঁর আদেশ- নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এবং তারপর মানুষের অধিকার আদায় করতে হবে।

আত্ম-প্রতিফলন

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই তাঁর অবস্থা ও কর্মের প্রতি চিন্তা করতেন। তাকে একবার নিজেকে তিরস্কার করতে এবং মহান আল্লাহকে ভয় করার জন্য স্মরণ করিয়ে দিতে শোনা গিয়েছিল, অন্যথায় তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই 56, হাদিস নম্বর 24-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

নিছক ইবাদত করলে কাউকে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা যাবে না। মুসলমানরা কেবল তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেই এই স্তরে পৌঁছাতে পারে। এটি তাদের কাছে থাকা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দিয়ে এবং তাদের ভাল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে অর্জন করা হয়। কিন্তু এটি শুধুমাত্র গুরুতর প্রতিফলন এবং স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

যখন কেউ তাদের নিজস্ব বাস্তবতাকে চিনতে পারে তখন এটি তাদের সেবকের মতো জীবনযাপন করতে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করবে। এটি তাদের মহান আল্লাহকে তাদের রব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পরিচালিত করবে, যা চূড়ান্ত লক্ষ্য। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া সৃষ্টি করিনি।"

এই আত্ম-মূল্যায়ন একজনকে তাদের চরিত্র এবং আত্মাকে মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে শুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য অত্যাবশ্যক, যা উভয় জগতের সাফল্যের পথ। কেউ কেউ বস্তুগত জগতে এতটাই হারিয়ে যায় যে তারা কখনই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে না এবং তাই তাদের এক বিট পরিবর্তন না করেই কয়েক দশক কেটে যায়। দুর্বলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে মুসলমানদের অবশ্যই আত্ম-মূল্যায়ন এবং আরও উন্নতির জন্য তাদের দেওয়া শক্তির সময় ব্যবহার করতে হবে। এই মুহুর্তে তারা পরিবর্তন করতে চাইবে কিন্তু তারা তা করার বুদ্ধি বা শক্তির অধিকারী হবে না। এটি সহীহ বুখারী, 6412 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে যাদেরকে প্রভূত ক্ষমতা ও সম্পদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু অবশেষে এমন একটি সময় এল যখন তাদের শক্তির মুহূর্ত ফুরিয়ে গেল এবং তাদের ক্রমাগত অবাধ্যতার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেল।

যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাদের শক্তির মুহূর্তগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন, তারা এমনভাবে আশীর্বাদ করবেন যে, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও তারা সমাজে সম্মানিত হবেন।

যেহেতু মুসলমানদের অধিকাংশই আরবি ভাষা বোঝে না, প্রচুর পরিমাণে ইবাদত এই অভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকে ট্রিগার করবে না। এই জড় জগৎ, মৃত্যু, কবর ও জাহান্নামকে চিন্তা করেই কেউ সেখানে পৌঁছাতে পারে। এ কারণে ষাট বছরের স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে এক মুহূর্তের প্রতিফলন উত্তম হয়ে উঠতে পারে।

যারা প্রজ্ঞা বা প্রতিফলন ছাড়াই জীবনযাপন করে তারা অভ্যাসগতভাবে ভুল করে যা শুধুমাত্র ক্রমাগত চাপের দিকে পরিচালিত করে। এই লোকেরাই কোন উচ্চ আকাঙ্খা ছাড়াই লক্ষ্যহীন জীবনযাপন করে এবং তাদের আসল উদ্দেশ্য না বুঝেই প্রতিটি দিন অতিক্রম করে।

ধার্মিকরা সর্বদা তাদের দিন থেকে সময় বের করে তাদের লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা করার জন্য, তারা কী কাজ করেছে এবং তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে কি না । এই মানসিকতা নিশ্চিত করবে যে একজন ব্যক্তি পাপ পরিহার করে, সৎ কাজ করে এবং যদি তারা পাপ করে তবে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। এই মানসিকতা ইসলামের দ্বিতীয় সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা ওমর বিন খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেওয়া উপদেশের সাথে খাপ খায়, যা ইমাম আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৯৮ নম্বরে লিপিবদ্ধ আছে। বিচার দিবসে অন্য কেউ তাদের বিচার করবে, নাম মহান আল্লাহ।

এই স্ব-মূল্যায়ন হল সেই চাবিকাঠি যা একজনকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে এবং আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করে। এই মঞ্চের তুলনায় এটি সর্বোত্তম পর্যায় যেখানে একজন তাদের ভুল বুঝতে পারে যখন অন্য একজন তাদের নির্দেশ করে। কিন্তু এই পর্যায়েও একজনের ভালো বন্ধু এবং আত্মীয়দের থাকা প্রয়োজন যারা জ্ঞানী এবং আন্তরিকভাবে তাদের চিরন্তন কল্যাণের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে শুধুমাত্র জড় জগতের সাথে উদ্বিগ্ন। একজন সত্যিকারের ধন্য মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কাছে এই ধরনের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব রয়েছে যারা তাদের তাকওয়া অবলম্বন করতে সাহায্য করে।

একজনের দিনের শুরুতে প্রতিফলিত হওয়া এটি নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সেই কাজগুলি এড়িয়ে সময় বাঁচায় যেগুলি বিলম্বিত হওয়া উচিত।

নিচের আয়াতে সফল মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ইসলামের শিক্ষার প্রতি চিন্তাভাবনা করে এবং গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং অহংকার প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ এইভাবে প্রভাবিত না হয় তবে তাদের অনুতপ্ত হতে হবে এবং অনেক দেরি হওয়ার আগেই পরিবর্তন করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 83:

"এবং যখন তারা শোনেন যা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে বলে তাদের চোখ অশ্রুতে উপচে পড়ছে..."

আত্ম-প্রতিফলনের অভাব মুসলমানদের বস্তুজগতে হারিয়ে যেতে বাধ্য করেছে যদিও ইসলামিক জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক সহজলভ্য। স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা শুধুমাত্র একজনকে এতদূর নিয়ে যাবে কিন্তু বিশ্বাসের উচ্চতায় পৌঁছতে তাদের অবশ্যই তাদের চরিত্রের প্রতিফলন এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এটি তাদের মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিত্যাগ করতে এবং তাদের প্রতিস্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই আত্ম-মূল্যায়ন এবং প্রতিফলনকে উদ্দীপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানটি হল ইসলামী জ্ঞান যা অবশ্যই একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত হতে হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে , এই ধরনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ।

অন্যদের স্বীকার

একদল লোক একবার মন্তব্য করেছিল যে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে তারা এমন কাউকে দেখেনি যে আরও ন্যায্যভাবে বিচার করেছে, সত্য কথা বলেছে এবং ভণ্ডামি মোকাবেলায় আরও কঠোর ছিল। তারা উপসংহারে পৌঁছেছিল যে তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে সর্বোত্তম মানুষ। একজন সাহাবী, আওফ ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাদের বিচারের ভুলের জন্য তাদের হস্তক্ষেপ ও সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে আবু বক্কর উমর (রাঃ) এর চেয়ে উত্তম এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে সবচেয়ে গুণী। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মন্তব্য করেন যে তিনি সত্য বলেছেন এবং আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু কস্তুরীর গন্ধের চেয়েও উত্তম ছিলেন যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের উটের চেয়েও বেশি পথভ্রষ্ট ছিলেন (তিনি গ্রহণ করার আগে) ইসলাম)। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 242-243-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সর্বদা তাদের সম্মান করতেন যারা মহান আল্লাহর ভয়ের অধিকারী ছিলেন এবং নিজেকে কখনই অন্যদের চেয়ে উত্তম মনে করতেন না, কারণ এটি গর্বের একটি দিক।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

" আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

প্রতিশোধ নেওয়া

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার একজন অজ্ঞ ব্যক্তি তার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ না করে কৃপণতা এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারে বিচার করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন। লোকটির ভাতিজা, যিনি পবিত্র কুরআনে শিক্ষিত ছিলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন: তওবাহের 7 অধ্যায়, আয়াত 199:

"ক্ষমা কর, ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের থেকে দূরে থাক।"

যদিও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকটির মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, একবার তিনি কুরআনের আয়াতটি শুনে এটির প্রতি চিন্তা করেছিলেন এবং শান্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি লোকটির সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকেন। এটি সহীহ বুখারী, 4642 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

"আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আন্তরিকতা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক মহান আল্লাহর কাছে সৎ (আন্তরিকভাবে আনুগত্য করবে) ততক্ষণ জনগণ তাদের শাসকের প্রতি সৎ থাকবে। শাসক মহান আল্লাহর সাথে বেঈমান হলে জনগণও বেঈমান হয়ে যেত।

উপরন্তু, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই লোকদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করতেন, তখনই তিনি তাঁর পরিবারকে মনে করিয়ে দিতেন যে যদি তারা সেই কাজটি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তবে তিনি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেবেন, কারণ তারা তাঁর পরিবার ছিল এবং তাই তাদের আরও বেশি কিছু ছিল। মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার দায়িত্ব। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 246-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর

নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

কোন সুবিধা নেই

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরিবারকে অগ্রাধিকারমূলক আচরণের ভয়ে প্রকাশ্যে উপলব্ধ সম্পদ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, একবার তাঁর উট চরানোর জন্য সরকারী জমি ব্যবহার করেছিলেন যা তিনি পরে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি তাকে উট বিক্রি করে মুনাফা সরকারি কোষাগারে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে খলিফার পুত্র হওয়ায় তার উটদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আরেকবার আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লাভের উদ্দেশ্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কিছু যুদ্ধের জিনিসপত্র কিনেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি তাকে বলেছিলেন যে তিনি তাকে তার লাভের একটি অংশ রাখার অনুমতি দেবেন কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে লুঠটি তার কাছে সস্তা মূল্যে বিক্রি হবে, কারণ তিনি ছিলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র। খলিফা। এটি বিক্রি করার পর, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে 80,000 রৌপ্য মুদ্রা রাখার অনুমতি দেন এবং অবশিষ্ট 320,000 রৌপ্য মুদ্রা গরীব ও অভাবীদের জন্য দান করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 246-247-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এমনকি তিনি তার স্ত্রীকে সুগন্ধি পরিমাপ করতে বাধা দিয়েছিলেন যাতে এটি লোকেদের মধ্যে ভাগ করা যায়, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে সে হয়তো নিজের উপর কিছু ঘষে ফেলবে, যার ফলে অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে বেশি

অংশ গ্রহণ করবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 250-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সাম্যের গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতিকে সমর্থন করেছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম

স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা

যদিও অনেক অজ্ঞ লোক উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, তবুও তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও আচরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাদের মধ্যে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া কিছুই ছিল না। তাদের মধ্যে যে কোনও খারাপ অনুভূতি শুধুমাত্র স্বার্থপরতা এবং লোভকে নির্দেশ করবে - নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে তারা মুক্ত ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অগ্রাধিকার দিতেন যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী ও অধিক প্রিয় ছিল এবং যারা ইসলামের জন্য অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেছে। যে বিষয়গুলি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী নয়। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একবার উসামা বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর নিজের পুত্র আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর তুলনায় সরকারি কোষাগার থেকে অধিক সম্পদ বরাদ্দ করেছিলেন। তাঁর ছেলে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করল তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, উসামার পিতা যায়েদ বিন হারিছা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন, তারপর তাঁর পিতা (অর্থাৎ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তাঁর সাথে) এবং উসামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাঁর (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকেও বেশি প্রিয় ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 248-249-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য এক অনুষ্ঠানে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলীর পুত্র এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি হুসাইন বিন আলীকে তাঁর সাথে সময় কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান। . যখন তিনি তার বাড়িতে পৌঁছেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, কীভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উমরকে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়নি, যিনি মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলেন, এবং তাই তিনি ফিরে গেলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে প্রবেশের অনুমতি ছাড়াই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ঘটনাটি জানতে পারলেন তখন তিনি হুসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন যে, তাঁর কাছে প্রবেশ করার অধিকতর অধিকার তাঁর নিজের পুত্র আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তার সাথে সন্তুষ্ট। এরপর তিনি মন্তব্য করেন যে, মানুষ যে আশীর্বাদ দান করেছে তা মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবারের কারণে দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 256-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এমনকি উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সরকারী কোষাগার থেকে জনগণকে কতটা নিয়মিত ধন-সম্পদ দেওয়া হবে, তখন তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের সম্পর্ক অনুসারে জনগণকে বরাদ্দ করেছিলেন। যদিও তাকে নিজেকে এবং তার নিজের পরিবার থেকে শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 257-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) সহ সকল সাহাবীকে ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এমনকি তাঁর কন্যা, উম্মে কুলতুমকে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাতনিকে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিবাহ করেছিলেন।

তার সাথে সন্তুষ্ট। আলী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এমনকি প্রথম তিন খলিফার নামে তাঁর সন্তানদের নাম রেখেছেন: আবু বক্কর, উমর এবং উসমান, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এমন আচরণ করবে যার সাথে তারা পছন্দ করে না বা তার সাথে চলতে পারে? ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 258-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর একবার আলী ইবনে আবু তালিবের মাথায় চুম্বন করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং প্রার্থনা করেন যে, মহান আল্লাহ যেন তাকে এমন দেশে না রাখেন যেখানে আলী (রা) অনুপস্থিত ছিলেন।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার নিদর্শন, মহান আল্লাহ তায়ালা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যারা ভালোবাসেন তাদের সকলকে ভালোবাসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যদিও এটি তাদের সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালবাসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালবাসা ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিগণ এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা সেই ব্যক্তির উপর কর্তব্য যে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। এটি অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যেমন সহীহ বুখারী, 17 নম্বরে পাওয়া একটি। এটি পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্যকারীদের প্রতি ভালবাসা, অর্থাত্ পবিত্র নগরী মদিনার বাসিন্দারা। ঈমানের একটি অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ভন্ডামীর লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ

(সাঃ) মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে তারা যেন কোন সাহাবীর সমালোচনা না করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের ভালবাসা একটি চিহ্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাদের ঘৃণা করা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 143 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

যদি একজন মুসলিম অন্যায়ভাবে এমন কোন মুসলিমের সমালোচনা করে যে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাবকে প্রমাণ করে। একজন মুসলমান যদি পাপ করে তবে অন্য মুসলমানের পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের উচিত, তবুও পাপী মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অন্যদের ভালবাসার লক্ষণ হল তাদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত সেই সমস্ত লোকদের অপছন্দ করা যারা আল্লাহ, মহান এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসেন তাদের প্রতি অপছন্দ দেখায়, সে ব্যক্তি আত্মীয় বা অপরিচিত নির্বিশেষে। একজন মুসলমানের অনুভূতি কখনই তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার এই নিদর্শন পূরণে বাধা দেবে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের ক্ষতি করবে বরং তাদের এটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে, যারা মহান আল্লাহ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে তাদের ঘৃণা

করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিপথগামী মনোভাবের উপর অটল থাকে তবে তাদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তাদের বয়স বা সামাজিক পটভূমি নির্বিশেষে যাদের কাছে ইসলামী জ্ঞান ছিল তাদের কাছে রাখতেন। এক সাহাবী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপস্থিতির সমালোচনা করেছিলেন, কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে তিনি বসার জন্য খুব ছোট। তাদের সাথে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার পবিত্র কুরআনের 110 নসর অধ্যায়ের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। সমাবেশ থেকে কয়েকজন তাদের মতামত দেন, অন্যরা নীরব ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন, যার সাথে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একমত হন। এটি সহীহ বুখারী, 4294 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞানী লোকদের প্রতি গভীর উপলব্ধি করতেন এবং সর্বদা তাদের সাহচর্য কামনা করতেন। মুসলমানদের অবশ্যই এই লোকদের একজন হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

এটি একটি ভৌত পথ নির্দেশ করে যে কেউ জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন বক্তৃতা এবং ক্লাসে অংশ নেওয়া এবং এমন একটি পথ যেখানে কেউ শারীরিক ভ্রমণ ছাড়াই জ্ঞানের সন্ধান করে। এটি জ্ঞানের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন জ্ঞান সম্পর্কে শোনা, পড়া, অধ্যয়ন করা এবং লেখা। জান্নাতে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা একজন মুসলিমকে সেখানে পৌঁছাতে বাধা দেয়। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই নিরাপদে জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যার কাছে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে এবং কীভাবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। উপরন্তু, এটি সহজেই বোঝা যায় যে একজন ব্যক্তি এই বিশ্বের একটি শহরে তার অবস্থান এবং এটির দিকে নিয়ে যাওয়া পথ না জেনে পৌঁছাতে পারে না। অনুরূপভাবে জান্নাত লাভ করা যায় না এ বিষয়গুলো সম্পর্কে না জেনে যেমন তার দিকে নিয়ে যাওয়া পথ।

কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, একজন মুসলমানের জ্ঞানের অন্বেষণ এবং কাজ করার উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে ব্যক্তি জাগতিক কারণে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে, যেমন প্রদর্শন, তারা যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে ব্যর্থ হয় তবে সে জাহান্নামে যাবে। সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন

গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"... অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

নারীদের সম্মান

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বদা নারীদের সম্মানের গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং সমাজের মধ্যে কখনও তাদের প্রতি অবিচার করা হয়নি। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি যদি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন তবে তিনি নিশ্চিত করবেন যে ইরাকে (তৎকালীন ইসলামী সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দূরবর্তী ভূমি) বসবাসকারী কোনও বিধবাকে অন্য কারও সমর্থনের প্রয়োজন হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 294-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আরেকটি অনুষ্ঠানে, একজন ব্যক্তি যে মারা যাওয়ার কাছাকাছি ছিল সে তার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছিল যাতে তারা তার সম্পদের কোনো অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে না পায়। যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জানানো হয় তখন তিনি লোকটিকে হুমকি দেন এবং তাকে সতর্ক করেন যে তিনি যদি তার স্ত্রীদের ফিরিয়ে না নেন তবে তিনি মারা যাওয়ার পর তার সম্পদ জোরপূর্বক নিয়ে নেবেন এবং তাদের প্রত্যেককে তাদের উত্তরাধিকারের অংশ দেবেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 531-532-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি সাধারণ নোটে, ইসলামের আগে, জাহেলিয়াতের যুগে, মহিলাদের জন্য গৃহস্থালির সামগ্রীর সাথে সমতুল্য হওয়া সাধারণ অভ্যাস ছিল। গবাদি পশুর মতো কেনা-বেচা হতো। বিবাহের ক্ষেত্রে একজন মহিলার কোন অধিকার ছিল না। তার আত্মীয়দের কাছ থেকে উত্তরাধিকারের কিছু অংশের অধিকারী হওয়া থেকে দূরে, তিনি নিজেও অন্যান্য গৃহস্থালীর জিনিসের মতো উত্তরাধিকারের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হন। তাকে পুরুষদের মালিকানাধীন কিছু হিসাবে

বিবেচনা করা হয়েছিল যখন তাকে কিছুই করার অনুমতি ছিল না। এবং তিনি শুধুমাত্র একজন পুরুষের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যয় করতে পারেন। অন্যদিকে, পুরুষটি তার ইচ্ছানুযায়ী মজুরির মতো যে কোনও সম্পদ তার সম্পত্তি ব্যয় করতে পারে। এই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকারও তার ছিল না। ইউরোপের কিছু গোষ্ঠী এমনকি নারীকে মানুষ না ভেবে তাকে পশুর সাথে সমতুল্য করে। ধর্মে নারীদের কোনো স্থান ছিল না। তারা পূজার অযোগ্য বলে বিবেচিত হত। কেউ কেউ এমনকি নারীদের আত্মা নেই বলেও ঘোষণা করেছেন। একজন পিতার পক্ষে তার নবজাতক বা অল্পবয়সী কন্যাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়েছিল কারণ তারা পরিবারের জন্য লজ্জা হিসাবে দেখা হত। কেউ কেউ এমনও বিশ্বাস করেছিলেন যে একজন মহিলাকে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে বিচারের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিছু প্রথা এমনকি মৃত স্বামীর স্ত্রীকেও হত্যা করেছিল কারণ তাকে ছাড়া বাঁচার মতো উপযুক্ত দেখা যায়নি। কেউ কেউ এমনকি ঘোষণা করেছিলেন যে নারীদের উদ্দেশ্য কেবল পুরুষদের সেবা করা।

কিন্তু মহান আল্লাহ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে মানুষকে সকল মানুষকে সম্মান করতে শিখিয়েছেন, ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা বিধান করেছেন এবং পুরুষদের তাদের উপর তাদের নিজস্ব অধিকারের সমানভাবে নারীর অধিকার পূরণের জন্য দায়ী করা হয়েছে। . নারীকে স্বাধীন ও স্বাধীন করা হয়েছে। তিনি পুরুষদের মতোই তার নিজের জীবন এবং সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কোন পুরুষ কোন নারীকে জোর করে কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। যদি তাকে তার সম্মতি ছাড়া বাধ্য করা হয় তাহলে বিয়ে চালিয়ে যাওয়া বা বাতিল করা তার পছন্দ হয়ে যায়। তার সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়া তার যা আছে তা থেকে কোনো কিছু ব্যয় করার অধিকার কোনো পুরুষের নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর সে স্বাধীন হয়ে যায় এবং তাকে কেউ কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাকে প্রদত্ত দায়িত্ব অনুসারে পুরুষদের মতো উত্তরাধিকারে অংশ পান। মহিলাদের জন্য ব্যয় করা এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করাকে মহান আল্লাহ তায়ালা ইবাদত বলে ঘোষণা করেছেন। এই সমস্ত অধিকার এবং আরও বেশি কিছু মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নারীদের দিয়েছেন। এটা আশ্চর্যজনক যে আজ যারা নারীর অধিকারের জন্য দাঁড়িয়েছে

তারা কিভাবে ইসলামের সমালোচনা করছে যদিও ইসলাম নারীদের অধিকার দিয়েছে বহু শতাব্দী আগে।

পরামর্শ ও সমালোচনা গ্রহণ করা

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জ্ঞানের স্তর বা সামাজিক পটভূমি নির্বিশেষে যে কারো থেকে গঠনমূলক সমালোচনা এবং পরামর্শ গ্রহণ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একবার এক বয়স্ক মহিলা খাওলা বিনতে তাহলাবাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে মসজিদুল হারামের বাইরে থামিয়েছিলেন। তিনি গঠনমূলকভাবে তাকে দীর্ঘ পরামর্শ দিয়েছেন। যখন কেউ তাকে কঠোর হওয়ার জন্য এবং তার বেশিরভাগ সময় নেওয়ার জন্য তাকে তিরস্কার করেছিল, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সমালোচনা করেছিলেন এবং যোগ করেছিলেন যে যতক্ষণ তিনি কথা বলতে থাকবেন ততক্ষণ তিনি তার কথা শুনতে থাকবেন, কারণ তিনিই তার অভিযোগ। মহান আল্লাহ তায়ালা শুনেছিলেন এবং সাড়া দিয়েছিলেন। অধ্যায় 58 আল মুজাদিলা, পবিত্র কুরআনের 1-4 আয়াত তার কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল:

"যারা তোমাদের মধ্যে তাদের স্ত্রীদের থেকে [বিচ্ছেদ করার জন্য] আহার উচ্চারণ করে - তারা তাদের মা নয়। তাদের মায়েরা কেউ নয় যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। এবং প্রকৃতপক্ষে, তারা একটি আপত্তিকর বক্তব্য এবং একটি মিথ্যা কথা বলছে। কিন্তু নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ক্ষমাশীল... আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 265-266-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ

করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

নারীর অধিকার রক্ষা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আবু বক্করের কন্যা উম্মে কুলতুমকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি একটি কঠিন জীবনযাপন করেছিলেন এবং তার কঠোরতাকে ভয় করেছিলেন। আমর ইবনে আল আস, সূক্ষ্মভাবে উমরকে বলেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তার প্রতিক্রিয়া এবং তিনি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অভিযোগ না করে বা তাকে গ্রহণ করার জন্য চাপ না দিয়ে, এমন একটি আচরণ যা প্রাক-ইসলামী যুগে খুব সাধারণ ছিল। উপরন্তু, উমর, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট, একবার লোকেদের সতর্ক করেছিলেন যে তারা তাদের মেয়েদেরকে অস্বাভাবিক পুরুষদের সাথে বিয়ে করতে বাধ্য করবে না, কারণ তারা তাদের স্ত্রীদের মধ্যে যা পছন্দ করে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের মধ্যে পছন্দ করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 268-269-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রদত্ত সতর্কবার্তা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি অন্যের অধিকার রক্ষা করতে পারে যদি তারা অন্যদের সাথে এমন আচরণ করার চেষ্টা করে যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান তাদের বিশ্বাস হারাবে যদি তারা এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানের ঈমান পূর্ণ হবে না । এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলমান তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তার অন্তর হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভাল কামনা করা তাদের ভাল জিনিসগুলিকে হারিয়ে ফেলবে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলমান মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী উপদেশ দেয়, তখন তাদের উচিত এমনভাবে করা উচিত যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা।

প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"... সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই উত্সাহ একজন মুসলমানকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেকে মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিয়ের কারণ

এক ব্যক্তি একবার উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন যে তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি তাকে ভালোবাসেন না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিয়েছিলেন যে সমস্ত ঘর ভালবাসার উপর নির্মিত হয় না এবং তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার আনুগত্য এবং প্রশংসা বিবেচনা করা উচিত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 270-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, তা ইঙ্গিত করেননি যে বিবাহে প্রেমের অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু প্রেম যেহেতু একটি চঞ্চল আবেগ, একজনের উচিত তাদের সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে এর উপর ভিত্তি করে নেওয়া উচিত নয়।

একজন মুক্তকৃত ক্রীতদাস একবার কুরাইশদের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত গোত্রের একজন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তার ভাই তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন ভাইয়ের সাথে কথা বলেন এবং তাকে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পরামর্শ দেন কারণ তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি যিনি উভয় জগতে তার পরিবারকে উপকৃত করবেন, যতক্ষণ না তার বোন গ্রহণ করতে সন্তুষ্ট হয়। তারা সবাই রাজি হল এবং বিয়ে হল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 281-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলামের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একজনের জীবনসঙ্গীর সন্ধান করা উচিত, এবং অস্থির আবেগ বা পার্থিব কারণে নয়, কারণ এটি একটি সফল বিবাহের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।

সহীহ বুখারী, 5090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়: তাদের সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য বা তাদের ধার্মিকতার জন্য। তিনি সতর্ক করে উপসংহারে বলেছিলেন যে একজন ব্যক্তিকে তাকওয়ার জন্য বিয়ে করা উচিত অন্যথায় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এই হাদিসে উল্লেখিত প্রথম তিনটি বিষয় খুবই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। তারা কাউকে সাময়িক সুখ দিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জিনিসগুলি তাদের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ তারা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত এবং সেই জিনিসের সাথে নয় যা চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য দেয়, বিশ্বাস। সম্পদ সুখ আনে না তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল ধনী এবং বিখ্যাতদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আসলে, ধনীরা পৃথিবীর সবচেয়ে অতৃপ্ত এবং অসুখী মানুষ। তাদের বংশের খাতিরে কাউকে বিয়ে করা বোকামি কেননা এটা গ্যারান্টি দেয় না যে একজন ভালো জীবনসঙ্গী হবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিয়েটি কার্যকর না হয় তবে এটি বিয়ের আগে দুটি পরিবারের আবদ্ধ পারিবারিক বন্ধনকে নষ্ট করে দেয়। শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য বিয়ে করা মানে, প্রেম বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ এটি একটি চঞ্চল আবেগ যা সময়ের সাথে সাথে এবং একজনের মেজাজের সাথে পরিবর্তিত হয়। কথিত প্রেমে ডুবে কত দম্পতি একে অপরকে ঘৃণা করে?

কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই হাদিসের অর্থ এই নয় যে একজন দরিদ্র জীবনসঙ্গী খুঁজে বের করা উচিত কারণ এটি এমন একজনকে বিয়ে করা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এর অর্থ এই নয়

যে একজনের তাদের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি সুস্থ বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু এই হাদিসের অর্থ হল এই বিষয়গুলো কারো বিয়ে করার মূল বা চূড়ান্ত কারণ হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমানের জীবনসঙ্গীর মধ্যে যে প্রধান এবং চূড়ান্ত গুণটি দেখা উচিত তা হল তাকওয়া। এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। সহজ কথায়, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারা সুখ ও কষ্ট উভয় সময়েই তাদের স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অন্যদিকে, যারা ধার্মিক তারা যখনই মন খারাপ করে তখনই তাদের স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিমদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এটি ।

পরিশেষে, একজন মুসলিম যদি বিয়ে করতে চায় তাহলে প্রথমে তাদের উচিত এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান যেমন তারা তাদের পত্নীর পাওনা কি অধিকার, তাদের জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে তাদের পাওনা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে তার স্ত্রীর সাথে সঠিকভাবে আচরণ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এই বিষয়ে অজ্ঞতা অনেক তর্ক এবং বিবাহবিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায় কারণ লোকেরা এমন কিছু দাবি করে যা তাদের সঙ্গী পূরণ করতে বাধ্য নয়। জ্ঞান একটি সুস্থ ও সফল বিবাহের ভিত্তি।

অন্যদের বিচার

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি যেন অন্যের রোজা বা নামাজের দ্বারা প্রতারিত না হয়। পরিবর্তে, তাদের যুক্তি এবং সততা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 272-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না।

এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

অন্যদের সম্মান করা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালা উওয়াইস ইবনে আমির (রাঃ) নামক এক ব্যক্তিকে বলুন যেন তারা কখনো তাঁর সাথে দেখা করে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে। . উওয়াইস, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে বসবাস করতেন, কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগ পাননি। বহু বছর পর, তাঁর খিলাফতের সময়, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু উয়াইসের সাথে দেখা করেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করেন এবং তাঁকে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন। সহীহ মুসলিমের ৬৪৯২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উওয়াইসের চেয়েও বেশি গুণী ছিলেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তবুও এটি তাঁকে তাঁর পক্ষ থেকে দো‘আ করতে বলতে বাধা দেয়নি। এটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মহান নম্রতার ইঙ্গিত।

এটি আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, আয়াত 63:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

"আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে । এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ভাল সাহচর্য খোঁজা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার মানুষকে ভালো সঙ্গী খোঁজার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের আন্তরিক সঙ্গীদের সন্ধান করতে বলেছিলেন, কারণ তারা অন্যদের খুশি রাখে এবং তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আনন্দের উত্স এবং অসুবিধার সময় সহায়তা করবে। তাদের সর্বদা অন্যদের সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তা করা উচিত যতক্ষণ না তারা এমন কিছু করে যা তাদের থেকে দূরে রাখাকে সমর্থন করে। তাদের উচিত তাদের শত্রুদের থেকে দূরে থাকা এবং অন্যদের থেকে সাবধান থাকা, যারা বিশ্বস্ত তারা ছাড়া। আর কেউ বিশ্বস্ত ছিল না যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহকে ভয় করত। তাদের কোন মন্দ কাজের লোকের সঙ্গ রাখা উচিত নয় অন্যথায় তারা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে। তাদের তাদের গোপন কথা বলা উচিত নয় এবং তারা কেবল তাদের সাথে পরামর্শ করবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 277-278-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালবাসার একটি প্রধান চিহ্ন হল যখন কেউ তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে না, তারা যা দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কীভাবে আচরণ করুক না কেন। একজন মানুষ যেমন খুশি হয় যখন তার প্রিয় পার্থিব সাফল্য লাভ করে, চাকরির মতো, তারাও তার প্রিয়জনের পরকালের সাফল্য কামনা করবে। যদি

একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরবর্তী জগতে, তাহলে তারা তাদের ভালোবাসে না।

একজন সত্যিকারের প্রেমিক তাদের প্রেয়সীকে ইহকাল বা পরকালে কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখে ও তা সহ্য করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে পরিহার করা যায়। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়তমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। কোন ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যকে তার নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলমানের মূল্যায়ন করা উচিত যে তাদের জীবনে যারা তাদেরকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে, নাকি না। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের সত্যিকারের ভালবাসে না। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

আভিজাত্য বিশ্বাসে নিহিত

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তাদের অগ্রাধিকার দিতেন যারা ইসলামের দীর্ঘকাল খেদমত করেছেন এবং এর জন্য আরও বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এমনকি যদি এর অর্থ তিনি সম্মানিত আরব পুরুষদের তুলনায় প্রাক্তন দাসদের সেবা করা এবং পূরণ করাকে অগ্রাধিকার দিতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 278-279-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতেন, যাতে কারো সঙ্গে দুর্ব্যবহার না হয়। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একবার তার একজন কর্মচারীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে কোন মুসলমানের ক্ষতি করবেন না এবং নিপীড়িতদের প্রার্থনাকে ভয় করবেন না, কারণ এটি সর্বদা গৃহীত হয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 284-285-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে দেউলিয়া মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে অনেক সৎ কাজ যেমন রোজা এবং নামাজ জমা করে, কিন্তু তারা মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের ভাল ব্যবহার করে। তাদের শিকারকে আমল দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে তাদের শিকারের পাপ বিচার দিবসে তাদের দেওয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সফলতা অর্জনের জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই ঈমানের দুটি দিক পূরণ করতে হবে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি কর্তব্য, যেমন ফরজ সালাত। দ্বিতীয় দিকটি হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না

যতক্ষণ না তারা তাদের শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে জীবন থেকে দূরে রাখে এবং অন্যদের সম্পত্তি।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল অর্থ, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সেসব পাপ ক্ষমা করবেন না যা অন্য লোকেদের সাথে জড়িত যতক্ষণ না শিকার প্রথমে ক্ষমা করে। যেহেতু লোকেরা এতটা ক্ষমাশীল নয় একজন মুসলমানের ভয় করা উচিত যে তারা যাদের প্রতি অন্যায় করেছে তারা বিচারের দিন তাদের মূল্যবান ভাল কাজগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে। এমনকি যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর অধিকার পূরণ করে, তবুও তারা জাহান্নামে যেতে পারে কারণ তারা অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই উভয় জগতে সফলতা লাভের জন্য মুসলমানদের জন্য তাদের কর্তব্যের উভয় দিক পালনে সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

অভাবীদের সাহায্য করা

একজন ক্রীতদাস একবার তার মালিককে ম্যান্যুমিশন (স্বাধীনতার) জন্য একটি চুক্তি তৈরি করতে বলেছিল কিন্তু মালিক অস্বীকার করেছিল। ক্রীতদাসটি উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ করল, যিনি মালিককে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে পবিত্র কুরআন মানতে এবং চুক্তি তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 33:

"...এবং যারা আপনার ডান হাতের অধিকারী যাদের মধ্য থেকে [পর্যন্ত মুক্তির জন্য] চুক্তি চায় - তাহলে তাদের সাথে চুক্তি করুন যদি আপনি জানেন যে তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে..."

ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 285-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মালিককে সম্মানিত করতে পারতেন এবং ক্রীতদাসকে বরখাস্ত করতে পারতেন কিন্তু পবিত্র কুরআনের প্রতি তাঁর আনুগত্য তাকে ন্যায়পরায়ণতা করতে পরিচালিত করেছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করে , মহান আল্লাহ তায়ালা শেষ বিচারের দিন তাদের কষ্ট দূর করবেন। .

এটি দেখায় যে একজন মুসলমানের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা সেইভাবে আচরণ করেন যেভাবে তারা আচরণ করে। ইসলামের শিক্ষার মধ্যে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 152:

"সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব..."

আরেকটি উদাহরণ জামি আত তিরমিযী, 1924 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত লাভ করবে।

একটি দুর্দশা এমন কিছু যা কাউকে উদ্বেগ এবং অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেয়। অতএব, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব বা ধার্মিক যা-ই হোক না কেন অন্যের জন্য এ ধরনের কষ্ট লাঘব করেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তায়ালা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। অনেক হাদিসে বিভিন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, জামে আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ

(সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একজন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানীয় পান করাবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে পান করাবেন।

যেহেতু আখেরাতের কষ্টগুলো দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি, এই পুরস্কার একজন মুসলমানের জন্য আটকে থাকে যতক্ষণ না তারা পরকালে পৌঁছায়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মহান আল্লাহ একজন মুসলমানকে ততক্ষণ সাহায্য করতে থাকবেন যতক্ষণ তারা অন্যকে সাহায্য করছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে যখন তারা কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করে বা কোনো বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি সাহায্য করে তখন ফলাফল সফল হতে পারে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করেন তখন তার সফল পরিণতি নিশ্চিত হয়। তাই, মুসলমানদের উচিত নিজেদের স্বার্থে, অন্যদেরকে সকল ভালো কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করা যাতে তারা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহর সাহায্য পায়।

সুষম খাদ্য

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, একবার অন্যদেরকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে অতিরিক্ত খাওয়া থেকে সাবধান থাকতে বলেছিলেন, কারণ এটি প্রার্থনায় অলসতা সৃষ্টি করে এবং অসুস্থতার দিকে নিয়ে যায়। তিনি তাদের সতর্ক করেছিলেন যে, মহান আল্লাহ অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। তাদের আহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত কারণ এটি ধার্মিকতার কাছাকাছি এবং অযথা বাড়াবাড়ি থেকে দূরে সরে যায় এবং ইবাদতের জন্য শক্তি তৈরি করে। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ধ্বংস হবে যখন তারা তাদের ধর্মীয় প্রতিশ্রুতির উপর তাদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 288-289-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুষম খাদ্যের গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি পরামর্শ দেন যে একজনের পেটকে তিন ভাগে ভাগ করা উচিত। প্রথম অংশটি খাবারের জন্য, দ্বিতীয়টি পানীয়ের জন্য এবং শেষ অংশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখতে হবে।

এটি অর্জন করা যেতে পারে যখন কেউ তাদের পেটে পৌঁছানোর আগে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের আচরণ।

মানুষ যদি এই পরামর্শে কাজ করে তাহলে তারা শারীরিক ও মানসিক উভয় রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। আসলে, অনেক জ্ঞানী মানুষের মতে অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হল বদহজম।

হৃদয়ের প্রতি সামান্য খাবারই কোমল হৃদয়, নম্রতা এবং কামনা-বাসনার দুর্বলতা ও ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়। ভরা পেটের ফলে অলসতা সৃষ্টি হয় যা ইবাদত ও অন্যান্য সৎকর্মে বাধা দেয়। এটি ঘুমকে প্ররোচিত করে যার ফলে কেউ স্বেচ্ছায় এবং এমনকি বাধ্যতামূলক রাতের নামাজও মিস করে। এটি প্রতিফলনকে বাধা দেয় যা একজনের কাজের মূল্যায়নের চাবিকাঠি এবং সেইজন্য একজনের চরিত্রকে আরও ভাল করার জন্য পরিবর্তন করে। যার পেট ভরা সে দরিদ্রদের ভুলে যায় এবং তাই তাদের সাহায্য করার সম্ভাবনা কম। এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব একটি কঠিন হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করে। কঠিন হৃদয়ের অধিকারী কেয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে না। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

যে ব্যক্তি কেবল তাদের পেটের জন্য উদ্বিগ্ন সে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যেমন ধর্মীয় জ্ঞান শেখা এবং আমল করা। মুসলমানদের জানা উচিত যে, কিয়ামতের দিন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হবে সে। এটি জামে আত তিরমিযী, 2478 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই, মুসলমানদের উচিত সুষম খাদ্য গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা যাতে তারা আলোচিত নেতিবাচক প্রভাবগুলি এড়াতে পারে যা নিঃসন্দেহে তাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যকে বাধাগ্রস্ত করবে।

ব্যায়াম উত্সাহিত

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অন্যদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি তাদের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি অন্যদের তাদের সন্তানদের সাঁতার, তীরন্দাজ এবং ঘোড়া চালানো শেখানোর পরামর্শ দিতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 289-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে সেসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যা প্রদান করে ইহকাল ও পরকালে কোন লাভ নেই । কিন্তু অন্যান্য সমস্ত কাজ, এমনকি যদি তারা জাগতিক দেখায়, যেমন ব্যায়াম হালাল। উদাহরণস্বরূপ, সাহাবীগণ , আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা ঘোড়ায় চড়া এবং তীরন্দাজ অনুশীলন করতে উত্সাহিত করেছিলেন । এবং আশীর্বাদ সুনানে আন নাসাই, 3608 নম্বরে একটি হাদিসে পাওয়া যায় , কারণ এগুলো এক ধরনের ব্যায়াম এবং আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ইমাম আসফাহানীর , হিলিয়াত আল আউলিয়া , 420 নম্বরে পাওয়া গেছে যেটি সর্বোত্তম শারীরিক কার্যকলাপের একটি সাঁতার যা আধুনিক বিজ্ঞানও সাক্ষ্য দেয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং আশীর্বাদ এমনকি তিনি একজন সাহাবীকে অনুমতি দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, সহীহ মুসলিমের 4678 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় এমন একটি হাদিসে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করার , যার ফলে ইসলামে এই ধরনের খেলা হালাল প্রমাণিত হয়। স্ত্রীর মতে মহানবী সা এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর বরকত বর্ষিত হোক , এমনকি তারা দুইবার একে অপরের সাথে দৌড়ঝাঁপ করেছিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম দৌড়ে বিজয়ী হন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তার উপর আশীর্বাদ, দ্বিতীয় জিতেছে. এটি সুনানে

আবু দাউদের 2578 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সবশেষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং আশীর্বাদ এমনকি তিনি একটি কুস্তি খেলায় অংশ নিয়েছিলেন যখন তিনি স্থানীয় কুস্তিগীর দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জিতেছিলেন । এই ঘটনাটি সুনানে আবু দাউদের 4078 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এমন সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যা কারও শারীরিক, মানসিক উপকার করে বা সামাজিক রাষ্ট্র ইসলামে বৈধ যতক্ষণ ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূর্ণ হয় এই মানসিকতাটি সহীহ বুখারী, 43 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদীসে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, যেখানে মহানবী সা . এবং আশীর্বাদ তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি এমন একজনকে অপছন্দ করতেন যে তাদের স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের ক্ষেত্রে খুব কঠোর ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ ভুলভাবে দাবি করে যে ইসলাম একটি কঠিন ধর্ম। এটি ঘটতে পারে যখন অশিক্ষিত লোকেরা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্যের অপব্যাখ্যা করে । একটি হাদিস অনুযায়ী ইমাম বুখারীর মধ্যে পাওয়া যায় , আদাব আল মুফরাদ, 287 নম্বর , আল্লাহ , দ মহিমান্বিত, একটি সরল ধর্ম ভালবাসে। পবিত্র কুরআনেও এই বিবৃতি লক্ষ্য করা যায় যেখানে এটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে আল্লাহ , দ মহিমান্বিত, কষ্ট কামনা করে না মানবজাতির জন্য অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

ইসলাম মুসলমানদেরকে এমনভাবে বাঁচতে পরামর্শ দেয় যাতে এই জড় জগৎ এবং তাদের বিশ্বাস একসাথে চলতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ এই দর্শনকে টুইস্ট করেছেন তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী. তারা অনেক অর্থহীন কাজে অংশ নেয় এবং দাবি করে যে তারা এই মানসিকতার সাথে বেঁচে আছে। তারা চিনতে ব্যর্থ হয় যে শুধুমাত্র বস্তুজগতের সেই জিনিসগুলি যা এই বিবৃতির মধ্যে পরের পতনে এই জগতে প্রকৃত সুবিধা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, খেলাধুলা এবং ব্যায়ামের একটি ফর্ম যা উপকারী শরীরের জন্য হালাল রিজিক অর্জনের জন্য কাজ করা দরকারী কারণ এর মাধ্যমে কেউ তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে । নিজের বাচ্চাদের সাথে খেলা তাদের সাথে ভালবাসার বন্ধনকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। এগুলি সমস্ত পার্থিব কাজ যা কিছু সুবিধা প্রদান করে এবং এইভাবে পূর্বে উল্লিখিত বক্তব্যের আওতায় পড়ে যতক্ষণ না সেগুলি পরিমিত অর্থে, ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে করা হয়। কিন্তু যে কাজগুলো ইহকাল বা পরকালের কোনো উপকারে আসে না সেগুলো এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে , শান্তি ও তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, তাদের এই দুনিয়ায় যে ভারসাম্য অবলম্বন করা উচিত তা নির্ধারণ করার জন্য যাতে তারা উভয় জগতেই সাফল্য লাভ করতে পারে।

সকল বিষয়ে ভদ্রতা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার এমন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন যাকে তিনি কিছুদিন দেখেননি। তাকে বলা হয়েছিল যে সে অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাই তার থেকে দূরে ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে একটি চিঠি লিখে নিচের আয়াতগুলো উদ্‌ধৃত করেন এবং তাঁর অনুশোচনার জন্য প্রার্থনা করেন। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 1-3:

“হা, মীম। কিতাব [কুরআন] অবতীর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তি, প্রাচুর্যের মালিক। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তাঁর কাছেই গন্তব্য।"

তার চিঠি পাওয়ার পর, লোকটি বারবার আয়াত পাঠ করল এবং অবশেষে তার পাপ থেকে অনুতপ্ত হল। যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবহিত করা হয়েছিল, তখন তিনি অন্যদের বলেছিলেন যে অন্যদের সংশোধন করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করা এড়িয়ে চলার মাধ্যমে তাদের কঠোরতার মাধ্যমে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দিয়ে তাদের সাথে নরম হওয়া উচিত। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 289-290-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

“অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

অনৈক্য এড়িয়ে চলা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার লোকেদের নিয়মিত ব্যক্তিগত সভা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ এর ফলে লোকেরা দল এবং উপদল গঠন করতে পারে। এতে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের জমায়েত সবার জন্য উন্মুক্ত করা যাতে সমাজের মধ্যে ভালবাসা ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 291-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের অবশ্যই সমাজের মধ্যে অনৈক্য এড়াতে পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, নম্বর 6541, সমাজের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বপ্রথম মুসলমানদের একে অপরকে হিংসা না করার উপদেশ দিয়েছেন।

এটি হল যখন একজন ব্যক্তি অর্থের অধিকারী অন্য কারো আশীর্বাদ পেতে চায়, তখন তারা মালিকের আশীর্বাদ হারাতে চায়। এবং এর সাথে এই বিষয়টিকে অপছন্দ করা জড়িত যে তাদের পরিবর্তে মালিককে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন। কেউ কেউ কেবল তাদের কাজ বা কথাবার্তার মাধ্যমে এটি না দেখিয়ে তাদের হৃদয়ে এটি ঘটতে চায়। যদি তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং

অনুভূতি অপছন্দ করে তবে আশা করা যায় যে তাদের হিংসার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে না। কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে খারাপ প্রকার হল যখন একজন ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এমনকি যদি ঈর্ষাকারী আশীর্বাদ না পায়।

হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং যদি তারা মালিকের কাছে থাকা আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই ধরনের পাপ নয় তবুও এটি অপছন্দনীয় যদি হিংসা জাগতিক আশীর্বাদের উপর হয় এবং শুধুমাত্র প্রশংসনীয় যদি এটি একটি ধর্মীয় আশীর্বাদ জড়িত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হল যখন একজন ব্যক্তি হিংসা করে যে ব্যক্তি বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং উপায়ে ব্যয় করে। মহান আল্লাহর কাছে খুশি। দ্বিতীয়টি হল যখন একজন ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে হিংসা করে যে তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং অন্যকে তা শেখায়।

মন্দ ধরনের হিংসা, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর পছন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমন আচরণ করে যেন মহান আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিশেষ আশীর্বাদ দিয়ে ভুল করেছেন। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সতর্ক করেছেন, সুনানে আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, হিংসা ভালো কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানকে অবশ্যই জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া হাদিসটির উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্য পছন্দ করে। তাই একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত, তারা যাকে ঈর্ষা করে তার প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

শুরুতে উদ্ধৃত মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের একে অপরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল যে কোন কিছুকে অপছন্দ করা উচিত যদি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। এটিকে সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই একজন মুসলমানের উচিত, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জিনিস বা মানুষকে অপছন্দ করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্যকে অপছন্দ করে তবে তাদের কথাবার্তা বা কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি পাপ। একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করার মাধ্যমে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যার অর্থ সম্মান ও দয়া। একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে অন্য লোকেরা যেমন নিখুঁত নয় তেমনি তারা নিখুঁত নয়। আর অন্যদের মধ্যে খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকলে তারাও নিঃসন্দেহে ভালো গুণের অধিকারী হবে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া তবে তাদের মধ্যে থাকা ভাল গুণগুলিকে ভালবাসা অব্যাহত রাখা।

এই বিষয়ে আরেকটি পয়েন্ট করা আবশ্যক. একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তার উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের

পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মুসলমানদের একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের পার্থিব বিষয় নিয়ে অন্য মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যার ফলে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমর্থন করতে অস্বীকার করা। সহীহ বুখারী, 6077 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, একজন মুসলমানের জন্য পার্থিব বিষয়ে অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি একটি পার্থিব সমস্যায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে করা হয় যে অন্য মুসলমানকে হত্যা করেছে। সুনানে আবু দাউদ, 4915 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা শুধুমাত্র ঈমানের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু তারপরও একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত যদি তারা ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। তাদের এখনও বৈধ জিনিসগুলিতে তাদের সমর্থন করা উচিত যখন তাদের এটি করার জন্য অনুরোধ করা হয় কারণ এই সদয় কাজ তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে একে অপরের ভাইয়ের মতো হতে আদেশ করা হয়েছে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা এই হাদিসে প্রদত্ত পূর্ববর্তী উপদেশ মেনে চলে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন

করার জন্য সচেষ্ট হয়, যেমন ভালো বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করা এবং মন্দ বিষয়ে সতর্ক করা। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

সহীহ বুখারি, 1240 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানদের নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পূরণ করা উচিত: তারা হল শান্তির ইসলামী অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তাদের জানাযার নামাজে অংশ নেওয়া এবং উত্তর দেওয়া। হাঁচি যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই শিখতে হবে এবং তাদের উপর অন্যান্য মানুষের, বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সমস্ত অধিকার পূরণ করতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে অন্যায় করা, ত্যাগ করা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি যে পাপ করে তা ঘৃণা করা উচিত কিন্তু পাপী এমন হওয়া উচিত নয় যে তারা যেকোনো সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 4884 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে কেউ অন্য মুসলিমকে অপমান করবে, মহান আল্লাহ তাদের অপমান করবেন। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে অপমান থেকে রক্ষা করবে, মহান আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

শুরুতে উদ্‌ধৃত মূল হাদিসে উল্লেখিত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো তখন বিকশিত হতে পারে যখন কেউ অহংকার গ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিস অনুসারে, অহংকার হল যখন কেউ অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। গর্বিত ব্যক্তি নিজেকে নিখুঁত হিসাবে দেখে এবং অন্যকে অপূর্ণ হিসাবে দেখে। এটি তাদের অন্যের অধিকার পূরণে বাধা দেয় এবং অন্যদের অপছন্দ করতে উৎসাহিত করে।

মূল হাদিসে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়া কারো শারীরিক গঠনের মধ্যে নয়, যেমন সুন্দর পোশাক পরা, বরং এটি একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য। এই অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় মহান আল্লাহর হুকুম পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নম্বর হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক অন্তর পরিশুদ্ধ হলে সমগ্র দেহ পবিত্র হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক হৃদয় যখন কলুষিত হয় তখন সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ বাহ্যিক চেহারা যেমন সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, তবে তিনি মানুষের উদ্দেশ্য এবং কাজ বিবেচনা করেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6542 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষাগুলি শেখার এবং আমল করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা যেভাবে মহান আল্লাহর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাতে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়। সৃষ্টি।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানকে ঘৃণা করা গুনাহ। এই বিদ্বেষ জাগতিক জিনিসের জন্য প্রযোজ্য এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে অপছন্দ না

করা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা করা হলো ঈমানকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। এটি সুনান আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও একজন মুসলিমকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে ঘৃণা না করে শুধুমাত্র তাদের পাপগুলিকে অপছন্দ করতে হবে। উপরন্তু, তাদের অপছন্দ তাদের কখনই ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করবে না কারণ এটি প্রমাণ করবে তাদের ঘৃণা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। পার্থিব কারণে অন্যকে তুচ্ছ করার মূল কারণ হল অহংকার। এটা বোঝা অতীব জরুরী যে একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরমাণুর গর্ব যথেষ্ট। এটি সহীহ মুসলিম, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল হাদিসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, একজন মুসলমানের জান-মাল ও সম্মান সবই পবিত্র। একজন মুসলমানকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এই অধিকারগুলির কোনটি লঙ্ঘন করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে অমুসলিমসহ অন্যান্য লোকদেরকে তাদের থেকে রক্ষা না করে। ক্ষতিকারক বক্তৃতা এবং কর্ম। আর প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জান-মাল থেকে নিজেদের মন্দ কাজ দূরে রাখে। যে ব্যক্তি এই অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে নির্যাতকের নেক আমল শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতকের পাপগুলি জালিমকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে ঠিক সেভাবে আচরণ করা যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। এটি একজন ব্যক্তির জন্য অনেক আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করবে।

ইসলামের পবিত্রতা রক্ষা করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয় এড়িয়ে চলার জন্য মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, যখন কিছু অ-সাহাবী সেই গাছটির উপাসনা করতে লাগলেন, তারা ধরে নিলেন যে সেই গাছটির নিচে রিদওয়ানের অঙ্গীকার হয়েছিল, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে এটি করতে নিষেধ করেন এবং সেই গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নিচে ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 296-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য এক অনুষ্ঠানে তিনি এক খুতবায় বলেছেন, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত মতের অনুসরণ করে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের শত্রু। তারা এই ঐতিহ্যগুলি মুখস্ত করতে এবং আমল করতে এবং তাদের নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। তারা পথভ্রষ্ট হয়ে অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে সাহাবীগণ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বদা এই ঐতিহ্যগুলি মেনে চলেন। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলবে ততদিন তারা বিপথগামী হবে না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 298-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ইসলামের উপর ভিত্তি করে নয় এমন যেকোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হবে।

মুসলমানরা যদি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। যদিও, কিছু কিছু কাজ যা সরাসরি নির্দেশনার এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া হয় না তা এখনও একটি সৎ কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে, এই দুটি উৎসকে অন্য সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাস্তবতা হল এই যে, এই দুটি উৎস থেকে নেওয়া নয় এমন বিষয়ের উপর যত বেশি আমল করবে, যদিও তা একটি সৎ কাজ হলেও সে হেদায়েতের এই দুটি উৎসের উপর তত কম আমল করবে। একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হল কত মুসলমান তাদের জীবনে সাংস্কৃতিক চর্চা গ্রহণ করেছে যার ভিত্তি এই দুটি নির্দেশনার সূত্রে নেই। এমনকি যদি এই সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি পাপ নাও হয় তবে তারা মুসলিমদেরকে তাদের আচরণে সন্তুষ্ট বোধ করার কারণে নির্দেশনার এই দুটি উত্স শিখতে এবং কাজ করতে ব্যস্ত রেখেছে। এটি পথনির্দেশের দুটি উত্স সম্পর্কে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিবর্তে কেবল বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

এই কারণেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই দুটি পথ নির্দেশনার সূত্রগুলি শিখতে হবে এবং কাজ করতে হবে যা হেদায়েতের নেতাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনই অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সৎকর্মের উপর কাজ করতে হবে যদি তারা তা করার সময় এবং শক্তি থাকে। কিন্তু যদি তারা অজ্ঞতাকে বেছে নেয় এবং অভ্যাস তৈরি করে, যদিও তারা এই দুটি পথনির্দেশনার উৎস শেখা এবং কাজ করার জন্য পাপ না হয় তবে তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার একদল লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যারা তাকে বলেছিল যে তারা তারা যারা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মন্তব্য করে তাদের তিরস্কার করেছিলেন যে তারা আসলে অলস লোক যারা তাদের জন্য অন্যরা কিছু করবে বলে আশা করেছিল। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে যারা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তারা মাটিতে বীজ বপন করে এবং তারপর মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 297-298-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2344 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সত্যই মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে, তবে তিনি পাখিদের যেমন রিজিক দেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দেবেন। সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ছেড়ে সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল এমন একটি বিষয় যা অন্তরে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে একমাত্র মহান আল্লাহই একজনকে উপকারী জিনিস প্রদান করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে দিতে, আটকাতে, ক্ষতি করতে বা উপকার করতে পারে না।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ যে উপায়গুলো দিয়েছেন, যেমন ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করে। যখন কেউ মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় ব্যবহার করে, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা নিঃসন্দেহে তাঁর আনুগত্য করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। বহু আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাবধান হও..."

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই হলো মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভ্যন্তরীণ আস্থার অধিকারী হলেও বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

কর্ম এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, ক্রিয়াগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল সেই সমস্ত আনুগত্যের কাজ যা মহান আল্লাহ মুসলমানদের করতে আদেশ করেন যাতে তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাত লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এই বিশ্বাস দাবী করার সময় এগুলো পরিত্যাগ করা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা এবং তাই দোষারোপযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম হল সে সকল মাধ্যম যা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণা পেলে পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম কাপড় পরিধান করা। যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। যাইহোক, কিছু লোক আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনব্যাপী রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে সেই কাজ করতে নিষেধ করতেন, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি প্রদান করেন। এটি সহীহ বুখারি, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী বিন আবু তালিবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট না হন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ অনুভব করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 117 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, যদি একজন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় এটা দোষারোপযোগ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকারের কর্ম হল সেসব কাজ যা একটি প্রথাগত অভ্যাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেই সব মানুষ যারা ওষুধের প্রয়োজন ছাড়াই রোগ নিরাময় করে। এটি বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে বেশ সাধারণ যেখানে ওষুধ পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2144 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে যুক্ত , যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে ছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করেন তিনি সক্রিয়ভাবে এই জেনেও ব্যবস্থা নাও পেতে পারেন যে এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা তাদের মিস করতে পারে না। সুতরাং এই ব্যক্তির জন্য রিযিক প্রাপ্তির প্রথাগত উপায় যেমন চাকরির মাধ্যমে তা অর্জন করা মহান আল্লাহ তায়ালা ভেঙে দিয়েছেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদ। অভিযোগ না করে বা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে যে এমন আচরণ করতে পারে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যদি এই পথ বেছে নেয় তবে দোষমুক্ত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া একটি পাপ। তারা এই উচ্চ পদে থাকতে পারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলে নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকে। অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু বেছে নেন তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করেন কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহই তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপসংহারে বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা সর্বোত্তম, বৈধ উপায় ব্যবহার করে একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধুমাত্র আল্লাহ, উচ্চতর, সিদ্ধান্ত নেবে ঘটবে, যেটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ যে তারা এটি পালন করে বা না করে।

ধর্মান্ধতা এড়িয়ে চলা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন তারা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের সাথে তাদের যোগসূত্র বজায় রাখে এবং অন্যান্য জিনিসের সাথে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে অতীতের জাতিগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ তারা তাদের পণ্ডিত এবং পুরোহিতদের বইকে তৌরাত এবং বাইবেলের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, যতক্ষণ না তারা তাদের অবহেলা করেছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 298-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও সঠিকভাবে পরিচালিত পণ্ডিতদের শিক্ষা অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, তবুও একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের সাথে সক্রিয় এবং সরাসরি যোগসূত্র রাখতে হবে, যেমন অনেক পন্ডিতদের শিক্ষা আলোচনা করে। দিকনির্দেশনার দুটি সূত্রে পার্শ্ব সমস্যাগুলি সমাধান করা হয়নি। যে বিষয়গুলোকে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে না।

উপরন্তু, একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট পণ্ডিতকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে থাকে তাদের উচিত একজন ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের পণ্ডিত সর্বদা সঠিক তাই তাদের পণ্ডিতদের মতামতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করে। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা

উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

ফরয নামায কায়েম করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইসলামের স্তম্ভ পূর্ণ হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করেছিলেন, যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ফরজ নামাজ। তিনি একবার তাঁর গভর্নরদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন যাতে মুসলমানরা বাধ্যতামূলক নামায মেনে চলেন তা নিশ্চিত করতে তাদের সতর্ক করেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে প্রার্থনা তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি। যারা তাদের নামাজ কায়েম করেছে তারা তাদের ধর্মীয় অঙ্গীকার রক্ষা করেছে এবং ভাল করছে। কিন্তু যে এটি অবহেলা করবে সে অন্যান্য ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাকে অবহেলা করার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 300-301-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

এই দিন এবং যুগে এটি অনেক বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকে তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে যা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার জন্য যদি নামাযের ফরজ বাদ না দেওয়া হয় তবে তা অন্য কারো থেকে কিভাবে সরানো যাবে? অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 102:

“এবং যখন আপনি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর কমান্ডার] তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের নামাযে নেতৃত্ব দেবেন, তখন তাদের একটি দল আপনার সাথে [প্রার্থনায়] দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্র বহন করুক। এবং যখন তারা সেজদা করে, তখন তাদের আপনার পিছনে [অবস্থানে] থাকতে দিন এবং অন্য দলটিকে এগিয়ে আসতে দিন যারা [এখনও] নামায পড়েনি এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে আপনার সাথে সালাত আদায় করুক..."

মুসাফির বা অসুস্থ কেউই তাদের ফরয নামায পড়া থেকে রেহাই পায় না। মুসাফিরকে তাদের জন্য বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেগুলি নামায থেকে রেহাই পায়নি। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 101:

"এবং যখন আপনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যদি পানির সংস্পর্শে তাদের ক্ষতি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 6:

"...তবে যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্বস্তির স্থান থেকে আসে বা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পেয়ে, তাহলে পরিষ্কার মাটির সন্ধান করো এবং তা দিয়ে তোমার মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা ফরজ সালাত এমনভাবে আদায় করতে পারে যা তাদের পক্ষে সহজ। অর্থ দাঁড়াতে না পারলে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং বসতে না পারলে শুয়ে ফরজ নামাজ পড়তে পারবে। জামে আত তিরমিযী, 372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আবার, অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাযের বাধ্যবাধকতা বুঝতে বাধা দেয়।

অন্য প্রধান সমস্যা হল যে কিছু মুসলমান তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং তাদের সঠিক সময়ের বাইরে নামাজ আদায় করে। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে কারণ বিশ্বাসীদেরকে তাদের ফরজ নামাজ যথাসময়ে আদায়কারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"... অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের নির্দেশ করে যারা অকারণে তাদের ফরজ নামাজে বিলম্ব করে। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড 10, পৃষ্ঠা 603-604-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 107 আল মাউন, আয়াত 4-5:

"অতএব যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য দুর্ভোগ। [কিন্তু] যারা তাদের নামাযের প্রতি উদাসীন।"

এখানে যারা এই মন্দ স্বভাব অবলম্বন করেছে তাদের উপর মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকলে দুনিয়া বা পরকালে সফলতা কিভাবে পাওয়া যাবে?

সুনানে আন নাসাই নং 512-এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, ফরয নামায অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হল ফরজ নামাজ আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। অধ্যায় 74 আল মুদ্দাথ্থির, আয়াত 42-43:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা], "কি আপনাকে সাকারে ফেলেছে?" তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

ফরয নামায ত্যাগ করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যে, জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যে এ পাপ করবে সে ইসলামে কাফের।

উপরন্তু, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলমানকে উপকৃত করবে না যতক্ষণ না তার ফরজ নামাজ কায়েম না হয়। সহীহ বুখারি, 553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ সালাত মিস করে তাহলে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যদি একটি ফরজ নামায পরিত্যাগ

করার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে কি সবগুলো পরিত্যাগের শাস্তি কল্পনা করা যায়?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরয নামায পড়াকে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে নির্ণয় করা যায় যে, ফরয নামাযকে সময় অতিক্রম করতে বিলম্ব করা বা ফরয নামায আদায় করা। তাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মহান আল্লাহ দ্বারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ এক.

তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা সকল প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে তারা তাদের উপর আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং বাচ্চাদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে। যে শিশুদের শুধুমাত্র ফরয নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন এটি তাদের উপর ফরয হয়ে যায় তারা খুব কমই তাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কয়েক বছর লেগে যায়। আর দোষটা পড়ে পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ওপর। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উত্সাহিত করে।

আরেকটি প্রধান সমস্যা অনেক মুসলমানের মুখোমুখি হয় যে তারা বাধ্যতামূলক নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সঠিকভাবে তা করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং এর পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 757 নম্বরে পাওয়া

একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে আদৌ নামাজ পড়েনি। অর্থ, তারা তাদের সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং তাই তাদের বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হয়নি। জামে আত তিরমিযী, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার দোয়া কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি নামাজে সঠিকভাবে রুকু বা সেজদা করে না তাকে নিকৃষ্ট চোর বলে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই নম্বর 9, হাদিস নম্বর 75- এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান যারা তাদের ফরয এবং অনেক স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করেছে তারা দেখতে পাবে যে তাদের কেউই গণনা করেনি এবং এইভাবে তারা হবে। যারা তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি তাকে হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1313 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"... আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদে

পাওয়া একটি হাদিস, 550 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের এই দাবি করা উচিত নয় যে তারা অন্য ধার্মিক কাজ করছে যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এটি করে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে না তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করছে যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

ধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের রাতে পরপর তিন রাত জামাতে নামায আদায় করতেন। কিন্তু চতুর্থ রাতের পর তিনি তাদের নামাযের ইমামতি করেননি এবং মন্তব্য করেন যে তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে এই সালাত (তারাবীহ) তাদের উপর ফরয হয়ে যাবে। তাই, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, রমজান মাসে পৃথকভাবে বা ছোট দলে এই নামাজ পড়তেন। তাঁর খিলাফতকালে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং পুনরায় জামাতে এই সালাত আদায়ের জন্য মুসলমানদের একত্রিত করেছিলেন। এটি সহীহ বুখারী, সংখ্যা 2012 এবং 2010 তে পাওয়া হাদীসগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যেমন মুসলমানদেরকে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ঐতিহ্যের প্রতি নির্দেশনা দিয়েছেন, তিনি প্রত্যেকের জন্য সওয়াব লাভ করবেন যে এটি অনুসরণ করবে।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

পরিত্রাণ মানে

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সময় কাটাতে পরামর্শ দিতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 309-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কীভাবে নাজাত অর্জন করতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

এই হাদিসে উল্লেখিত একটি বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি যেন অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হয়। এইভাবে আচরণ করা সময় নষ্ট করে এবং মৌখিক ও শারীরিক উভয় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যদি কেউ সত্যিই আন্তরিকভাবে প্রতিফলিত করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের বেশিরভাগ পাপ এবং তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতার কারণে হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে এটি সর্বদা অন্যের দোষ ছিল তবে এর অর্থ যদি কেউ অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এড়িয়ে যায় তবে তারা কম পাপ করবে এবং কম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এটি তাদের ইসলামিক শিক্ষাগুলিকে আরও শিখতে এবং তার উপর কাজ করার সময়কে খালি করবে যা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উপকারী।

সুদ পরিহার করা

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোকেরা বাজারে বেআইনিভাবে ব্যবসা না করে তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঘোষণা করবেন যে সুদ সম্পর্কে জানে না সে তাদের বাজারে ব্যবসা করবে না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 312-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আর্থিক সুদ সেই পরিমাণকে বোঝায় যা একজন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদের একটি নির্দিষ্ট হারে গ্রহণ করে। পবিত্র কুরআন নাযিলের সময় অনেক ধরনের সুদের লেনদেন প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল যে বিক্রেতা একটি নিবন্ধ বিক্রি করেছিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল, এই শর্তে যে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু নিবন্ধের দাম বাড়িয়ে দেবে। আরেকটি হল যে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে একটি পরিমাণ অর্থ ধার দেন এবং শর্ত দেন যে ঋণগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের পরিমাণের বেশি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। সুদের লেনদেনের তৃতীয় রূপটি ছিল যে ঋণগ্রহীতা এবং বিক্রেতা সম্মত হন যে পূর্ববর্তী একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সুদের হারে ঋণ পরিশোধ করবে এবং যদি তারা সীমার মধ্যে তা করতে ব্যর্থ হয় তবে ঋণদাতা সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে কিন্তু একই সময়ে সুদের হার বাড়বে। এখানে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য এই ধরনের লেনদেন।

যারা এটি বিশ্বাস করে তারা বৈধ বিনিয়োগ এবং আর্থিক স্বার্থ থেকে অর্জিত লাভের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়। এই বিভ্রান্তির ফলে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যদি ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থের লাভ হালাল হয় তবে ঋণ থেকে অর্জিত মুনাফা কেন হারাম বলে গণ্য হবে? তারা যুক্তি দেয় যে একজন ব্যক্তি তাদের

সম্পদ বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা এমন কাউকে ঋণ দেয় যে এর থেকে লাভ করে। এমন পরিস্থিতিতে কেন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে লাভের একটি অংশ পরিশোধ করবেন না? তারা চিনতে ব্যর্থ হয় যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। কোনো উদ্যোগই লাভের পরম গ্যারান্টি বহন করে না। অতএব, এটা ঠিক নয় যে একা অর্থদাতাকে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের অধিকারী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং ক্ষতির যে কোনও সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা উচিত। এটা ন্যায়ের অংশ নয় যে যারা তাদের সম্পদ উৎসর্গ করে তাদের কোনো নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না যেখানে তাদের সম্পদ ধার দেয় তারা ক্ষতির সমস্ত ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে লাভের নিশ্চয়তা পায়।

একটি স্বাভাবিক বৈধ লেনদেনে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করা আইটেম থেকে লাভবান হন। বিক্রেতা আইটেম তৈরিতে ব্যয় করা প্রচেষ্টা এবং সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ পান। অন্যদিকে সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনে, সুবিধার বিনিময় ন্যায়সঙ্গতভাবে ঘটে না। সুদ গ্রহণকারী পক্ষ তাদের দেওয়া ঋণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে এবং এইভাবে তাদের লাভ সুরক্ষিত হয়। অন্য পক্ষ ধার করা তহবিল ব্যবহার করতে পারে তবে এটি সর্বদা লাভ নাও হতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি যদি ধার করা তহবিল প্রয়োজনে ব্যয় করে তবে কোন লাভ হবে না। এমনকি যদি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তবে একজনের লাভ বা ক্ষতি উভয়েরই সুযোগ থাকে। তাই একটি সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন একদিকে ক্ষতি এবং অন্যদিকে লাভ বা একদিকে নিশ্চিত এবং স্থির লাভ এবং অন্যদিকে অনিশ্চিত লাভের কারণ হয়। অতএব, বৈধ ব্যবসা আর্থিক সুদের সমান নয়।

উপরন্তু, সুদের বোঝা ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এমনকি মূল ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য তাদের অন্য উৎস থেকে ঋণ নিতে হতে পারে। সুদ যেভাবে কাজ করে তার কারণে ঋণ পরিশোধ করার পরেও তাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পরিমাণ প্রায়ই থেকে যায়। এই আর্থিক

চাপ মানুষকে নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে বাধা দিতে পারে । এই মানসিক চাপ অনেক শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

পরিশেষে, এই ধরনের ব্যবস্থায় কেবল ধনীরা আরও ধনী হয় যখন দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়।

যদিও বাহ্যিকভাবে আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করলে একজন ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি তাদের সামগ্রিক ক্ষতির কারণ হয়। এই ক্ষতি অনেক রূপ নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটি তাদের ভাল এবং বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হারাতে পারে যা তারা অর্জন করতে পারত যদি তারা আর্থিক স্বার্থ নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ তাদের সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন যা তাদের সন্তুষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে পারে যার কারণে তারা তাদের মূল্যবান বেআইনি সম্পদ ব্যয় করতে পারে যার ফলে তাদের আনন্দদায়ক উপায়ে এটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক ক্ষতির একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। তারা যত বেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে লেনদেন করে ততই তাদের লোভ অর্থে পরিণত হয়, তাদের পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ কখনও তৃপ্ত হয় না যা সংজ্ঞা অনুসারে তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারা দিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য বিষয়ে যাবে এবং তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে কারণ তারা হালাল ব্যবসা এবং সম্পদের সাথে থাকা অনুগ্রহ হারিয়েছে। এমনকি এটি তাদের আর্থিক স্বার্থ এবং অন্যান্য উপায়ে আরও বেআইনি সম্পদ অর্জনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আখেরাতের ক্ষতি আরো সুস্পষ্ট। হাশরের দিন তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ হারামের মধ্যে নিহিত কোনো ভালো কাজ যেমন হারাম সম্পদ দিয়ে দান করা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। বিচার দিবসে এই ব্যক্তির কোথায় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিত লাগে না।

বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন এবং সুদ-সম্পর্কিত লেনদেনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পূর্বেরটি সমাজে একটি উপকারী ভূমিকা পালন করে যেখানে পরেরটি তার পতনের দিকে নিয়ে যায়। স্বভাবগতভাবে স্বার্থ লোভ, স্বার্থপরতা, উদাসীনতা এবং অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। এটি সম্পদের পূজার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে সহানুভূতি ও ঐক্য বিনষ্ট করে। সুতরাং এটি অর্থনৈতিক এবং নৈতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে ধ্বংস করতে পারে।

অন্যদিকে, দাতব্য হল উদারতা এবং করুণার ফলাফল। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার কারণে সমাজের ইতিবাচক বিকাশ ঘটবে যার ফলে সবাই উপকৃত হবে। এটা স্পষ্ট যে, যদি এমন একটি সমাজ থাকে যার ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে তাদের লেনদেনে স্বার্থপর হয়, যেখানে ধনীদের স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সরাসরি বিরোধী হয়, সেই সমাজ স্থিতিশীল ভিত্তির উপর নির্ভর করে না। এমন সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবর্তে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাড়তে বাধ্য।

উপসংহারে বলা যায়, মানুষ যখন তাদের নিজেদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করবে এবং তারপর তাদের উদ্‌বৃত্ত সম্পদ দিয়ে দাতব্য উপায়ে ব্যয় করবে বা পারস্পরিকভাবে বৈধ ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নেবে তখন এমন সমাজে ব্যবসা, শিল্প ও কৃষির উন্নতি হবে। সমাজের মধ্যে জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং সেখানে উৎপাদন অনেক বেশি হবে সেই সমাজের তুলনায় যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আর্থিক স্বার্থ দ্বারা সংকুচিত হয়।

উপার্জনের বিধান

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে অলসতা পরিহার করতে এবং হালাল রিজিক অর্জনের চেষ্টা করে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে উত্সাহিত করতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার বলেছিলেন যে এটি ব্যবসায়ের জন্য না হলে লোকেরা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তিনি আরও বলেন, মানুষের কাছে ভিক্ষা পাওয়ার চেয়ে কায়িক শ্রম দিয়ে উপার্জন করা উত্তম। অন্য একটি অনুষ্ঠানে, তিনি লোকেদের বাণিজ্য করতে এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল না হওয়ার জন্য উত্সাহিত করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 314-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দাবি করে, তাদের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল,

তাঁর সৃষ্ট উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে এবং মহান আল্লাহ্ অকার্যকর জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা। একজন মুসলিম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান যার মধ্যে রয়েছে সম্পদও বরাদ্দ করা হয়েছিল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তাই একজন মুসলমানের উচিত হবে আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা দাবী করার সময়, যখন তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় আছে, তখন সামাজিক সুবিধা নিয়ে চলার মাধ্যমে অলস হওয়া উচিত নয়।

মদিনা টহল

অন্যদের জন্য উদ্বেগ

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর জনগণের একটি আরামদায়ক এবং নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মদিনার রাতের টহলে অংশগ্রহণ করতেন।

তিনি একবার একটি শিশুর সাথে দেখা করলেন যে দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদছিল। তিনি শিশুটির মাকে ধমক দিয়েছিলেন, যিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি কার সাথে কথা বলছেন তা জানেন না যে তিনি শিশুটিকে তার দুধ ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন। যখন তিনি কারণটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধুমাত্র মায়ের দুধ ছাড়ানো শিশুদের নিয়মিত আর্থিক সুবিধা প্রদান করবেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, তারপর নিজেকে তিরস্কার করলেন এবং প্রকাশ্যে আদেশ দিলেন যে সমস্ত শিশুকে নিয়মিত আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে এবং তিনি অন্যান্য সমস্ত ইসলামিক অঞ্চলে সেই নির্দেশনা লিখেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 317-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজনকে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার এই মনোভাব গ্রহণ করতে হবে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারায় যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে যার ফলে তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সমর্থন করার দায়িত্ব ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য যেমন ভালো এবং আন্তরিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এড়াতে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম।

যদিও একজন মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

পারিবারিক বন্ধন

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর জনগণের একটি আরামদায়ক এবং নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মদিনার রাতের টহলে অংশগ্রহণ করতেন।

এক অনুষ্ঠানে, তিনি কবিতায় একজন মহিলাকে তার স্বামীকে হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ প্রকাশ করতে শুনেছিলেন। তার স্বামী একটি সামরিক অভিযানে দূরে ছিলেন। তার কন্যা, মুমিনদের মা, হাফসাহ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হতে পরামর্শ করার পর, তিনি একটি সীমা নির্ধারণ করেছিলেন যে একজন সৈনিক তার স্ত্রীর কাছ থেকে চার মাস দূরে থাকতে পারে। যে সৈন্যরা এই সময়ের পরে তাদের পরিবারের কাছে ফিরে আসেনি তাদের হয় ফিরে যেতে, তাদের পরিবারের আর্থিক ভরণপোষণ পাঠাতে বা তাদের স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার বিকল্প দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যদি তারা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তারা বিগত সময়ের জন্য তাদের কাছে আর্থিক রক্ষণাবেক্ষণ পাঠাতে বাধ্য ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 318-319-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই আচরণ একজনের পরিবারের সাথে ভাল সম্পর্ককে উৎসাহিত করেছিল।

জামে আত তিরমিযী, 2612 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে আচার-আচরণে সর্বোত্তম এবং তাদের পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ তাদের নিজের পরিবারের সাথে খারাপ ব্যবহার করার সময় অ-আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণ করার খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা নিজের পরিবারের সাথে সদয় আচরণ করার গুরুত্ব বোঝে না এবং তারা তাদের পরিবারের প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমান কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা ঈমানের উভয় দিক পূর্ণ করে। প্রথমটি হল মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করা। দ্বিতীয়টি হল মানুষের অধিকার পূরণ করা যার মধ্যে রয়েছে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। নিজের পরিবারের চেয়ে এই ধরনের আচরণের অধিকার আর কারো নেই। একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের পরিবারকে ভালো সব বিষয়ে সাহায্য করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মন্দ জিনিস ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করতে হবে। তাদের খারাপ কাজে তাদের অন্ধভাবে সমর্থন করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের আত্মীয় এবং তাদের প্রতি কিছু খারাপ অনুভূতির কারণে তাদের ভাল বিষয়ে সাহায্য করতে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয় কারণ এটি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

অন্যদের পথ দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হল একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে, কারণ এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং কেবল মৌখিক নির্দেশনার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

পরিশেষে, একজনকে সাধারণত সব বিষয়ে নম্রতা বেছে নেওয়া উচিত, বিশেষ করে, যখন তাদের পরিবারের সাথে আচরণ করা হয়। এমনকি যদি তারা পাপ করেও তবে তাদের সতর্ক করা উচিত নম্রভাবে এবং তারপরও তাদের সাহায্য করা উচিত যেগুলি ভাল বিষয়গুলিতে সাহায্য করা উচিত কারণ এই দয়া তাদের সাথে কঠোর আচরণ করার চেয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

অন্যদের সাহায্য করা

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর জনগণের একটি আরামদায়ক এবং নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মদিনার রাতের টহলে অংশগ্রহণ করতেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মদীনার বাইরে শিবির স্থাপনকারী এক মহিলা ও তার সন্তানদের সাথে দেখা করলেন। তাদের কাছে খাওয়ার কিছু ছিল না এবং তাই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সরকারি কোষাগারে ফিরে যান এবং কিছু উপাদান ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের জন্য রান্না করেন। পরিবার খাওয়ার পর, তিনি মহিলাকে পরের দিন খলিফার সাথে দেখা করার পরামর্শ দেন যাতে তিনি তাকে কিছু আর্থিক ভরণপোষণ দিতে পারেন। এরপর তিনি তার বাচ্চাদের খেলা দেখার সময় চলে যান। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 321-323-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মহান আল্লাহ মানুষকে তারা যা করে সে অনুযায়ী দান করেন। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেউ যদি মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তবে তিনি তাদের স্মরণ করবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি আপনাকে মনে রাখব…"

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ানো ঠিক একই রকম। যে ব্যক্তি এই নেক আমল করবে তাকে জান্নাতের খাবার খাওয়ানো হবে এবং যে অন্যকে পান করাবে তাকে বিচারের দিন জান্নাত থেকে পান করানো হবে। জামি আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামের সর্বোত্তম ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 6236 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, অন্যকে খাওয়ানো এবং অন্যদেরকে সদয় কথা বলে অভিবাদন করা ইসলামের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

মুসলমানদের উচিত এই সৎ কাজের উপর কাজ করাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এবং অন্যদের বিশেষ করে দরিদ্রদের নিয়মিত খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এটি একটি আশ্চর্যজনক কাজ যার জন্য খুব বেশি সম্পদের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকে খাওয়ানো, যদিও তা অর্ধেক খেজুর ফলই হয়, কারণ সহীহ বুখারি, 1417 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে এটি তাদের থেকে রক্ষা করবে। বিচার দিবসে জাহান্নামের আগুন। এটি মানুষকে এই সৎ কাজ থেকে বিরত থাকার কোন অজুহাত দেয় না।

দুর্নীতির প্রতিকার

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর জনগণের একটি আরামদায়ক এবং নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মদিনার রাতের টহলে অংশগ্রহণ করতেন।

এক অনুষ্ঠানে, তিনি শুনেছেন একজন মা তার মেয়েকে দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য তার মেয়েকে পানিতে মিশ্রিত করার নির্দেশ দিচ্ছেন যার ফলে এর বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। কন্যা মাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে এটা করতে নিষেধ করেছেন। মা উত্তরে বললেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বা তাঁর কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনি যেভাবে আদেশ করেন তাই করা উচিত। কন্যা অবশেষে উত্তর দিল যে সে প্রকাশ্যে তার আনুগত্য করবে না এবং গোপনে তাকে অমান্য করবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তারপর চলে গেলেন এবং পরদিন সকালে মেয়ের খোঁজ খবর নিলেন। তিনি তার পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাদের মধ্যে একজন তাকে তার ধার্মিকতার কারণে বিয়ে করবে। অবশেষে তিনি তার পুত্র আসিমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। তাদের পৌত্র ছিলেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ, ইসলামের পঞ্চম সঠিক নির্দেশিত খলিফা, আল্লাহ তার উপর রহম করুন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 324-325-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে এই ঘটনা থেকে একটা শিক্ষা নেওয়া যায় যে, সমাজে দুর্নীতি শুরু হয় সাধারণ মানুষ থেকে। কন্যা নিয়ম মেনে তার সমাজের দুর্নীতি দূর করতে তার ভূমিকা পালন করেছে।

দুর্নীতি হল যখন একজন ব্যক্তি তার কাছে থাকা আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, বিশেষ করে তাদের সামাজিক প্রভাব, পার্থিব জিনিস, যেমন ক্ষমতা এবং সম্পদ লাভের জন্য। এটি মহান আল্লাহর প্রতি একজন মুসলমানের কর্তব্যকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের বিরুদ্ধে অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন নিপীড়ন।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে যখন সাধারণ জনগণ একে অপরের সাথে আর্থিকভাবে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচারী নেতা নিয়োগ করে তাদের শাস্তি দেন। এই নিপীড়নের একটি দিক হলো দুর্নীতি যা সাধারণ জনগণকে চরম দুর্ভোগের কারণ। একই হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হবে যারা তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। আবার, এটি দুর্নীতির একটি দিক যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, যেমন সরকারি কর্মকর্তারা পরিণতির ভয় ছাড়াই অন্যের জিনিসপত্র অবাধে নিয়ে যায়। যখন সাধারণ জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তখন তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা এই আচরণকে সাধারণ জনগণ গ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করে একইভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। এটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ করার সাহস করবে না এবং সাধারণ জনগণ এর পক্ষে দাঁড়াতে পারবে না। এবং

পূর্বে উদ্ধৃত হাদিস অনুসারে, সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের প্রভাবশালী পদে লোক নিয়োগ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবেন যারা ন্যায়বিচারে রয়েছেন।

বিশ্বে পরিলক্ষিত ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অন্যকে দোষারোপ করার অপরিপক্ক পথ গ্রহণ না করে মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের আচরণের প্রতি সত্যিকারভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তাদের মনোভাব সামঞ্জস্য করা। তা না হলে সময়ের সাথে সাথে সমাজে দুর্নীতি বাড়বে। কেউ বিশ্বাস করবেন না যে তারা প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে না থাকায় সমাজে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত দুর্নীতি সাধারণ জনগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে ঘটে এবং তাই সাধারণ জনগণের ভালো আচরণের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."

সকল প্রাণীর প্রতি সমবেদনা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, সমস্ত প্রাণীর প্রতি করুণা ও সহানুভূতির সাথে আচরণ করার গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি প্রায়শই এমন লোকদের তিরস্কার করতেন যারা তাদের পশুদের সঠিকভাবে যত্ন নেয় না। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রাণীদের তাদের উপর অধিকার রয়েছে যা অবহেলা করা যায় না। এমনকি তিনি একবার একটি ক্লান্ত উট দেখার পর মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি ভীত ছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাকে বিচারের দিন এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 326-327-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র।

সহীহ বুখারি, 3318 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারণ সে একটি বিড়ালের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিল যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সুনানে আবু দাউদ, 2550 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস পরামর্শ

দেয় যে একজন মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে খাওয়ায়। এটা যদি ভালো চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় এবং পশুদের প্রতি খারাপ চরিত্র দেখানোর পরিণতি হয় তাহলে আল্লাহ, মহান ও মানুষের প্রতি ভালো চরিত্র দেখানোর গুরুত্ব কি কেউ কল্পনা করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী সে মুসলিমের মতো পুরস্কৃত হবে যে অবিরতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং নিয়মিত রোজা রাখে।

তথ্য যাচাই করা হচ্ছে

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, মানুষ যাতে ইসলামী জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং তার উপর আমল করে তা নিশ্চিত করার জন্য মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর একটি শাখা ছিল অর্জিত জ্ঞান সঠিক ও নির্ভুল তা নিশ্চিত করা। এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি মানুষকে শেখানোর জন্য তিনি যখনই কেউ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস উল্লেখ করতেন, যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে শোনেননি, তখনই তিনি সাক্ষী আকারে প্রমাণের জন্য অনুরোধ করতেন। তিনি এমন আচরণ করেননি যেভাবে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সততা নিয়ে সন্দেহ করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, বরং তিনি অন্যদের এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তারা যে জ্ঞান শিখেছেন এবং তার উপর আমল করেছেন তা নিশ্চিত করার গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য তিনি এটি করেছিলেন। সঠিক এবং নির্ভুল।

উদাহরণ স্বরূপ, আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখার জন্য তিনবার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু অনুমতি পাননি। অতঃপর তিনি চলে গেলেন যতক্ষণ না উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি তাকে ব্যস্ত রেখেছিলেন এমন ব্যবসা শেষ করার পরে তাকে ফেরত ডাকলেন। তিনি যখন আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কেন চলে গেলেন, তিনি তাঁকে বললেন যে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তির কাছে তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায় কিন্তু যদি তাদের অনুমতি দেওয়া হয় না তাদের জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এই কথার প্রমাণ আনতে বললেন। আবু মূসা, তারপর অন্য একজন সাহাবী, আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) কে নিয়ে আসলেন, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনিও মহানবী

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই বক্তব্য শুনেছেন। এটি সহীহ বুখারী, 6245 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি থেকে একজনকে তথ্যের উপর কাজ করার আগে বা অন্যদের সাথে শেয়ার করার আগে তথ্য যাচাই করার গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি শিখতে হবে।

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এই সময়ে অসত্য খবরের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা কতটা কঠিন তা কেউ কল্পনা করতে পারেন। তাই মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর কাজ করা এবং অন্যদের কাছে তথ্য না ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তারা বিশ্বাস করে যে তারা প্রথমে তথ্য যাচাই না করে এটি করে অন্যদের উপকার করছে। অর্থ, তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে এসেছে এবং সঠিক। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 6:

" হে ঈমানদারগণ, যদি তোমাদের কাছে কোন অবাধ্য ব্যক্তি তথ্য নিয়ে আসে, তবে অনুসন্ধান করো, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি না কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।"

যদিও, এই শ্লোকটি একটি দুষ্ট ব্যক্তিকে সংবাদ ছড়ানোর ইঙ্গিত দেয় যা এখনও অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে এমন সমস্ত লোকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। এই আয়াতে উল্লিখিত হিসাবে একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে যে তারা অন্যদের

সাহায্য করছে কিন্তু অযাচাইকৃত তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা অন্যদের ক্ষতি করতে পারে, যেমন মানসিক ক্ষতি। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান এই বিষয়ে অমনোযোগী এবং এটি যাচাই না করেই টেক্সট মেসেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তথ্য ফরোয়ার্ড করার অভ্যাস রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে তথ্যটি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে তথ্যটি ছড়িয়ে দেওয়ার আগে যাচাই করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তারা তাদের দেওয়া ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদের কাজের জন্য শাস্তি পেতে পারে। এটি সহীহ মুসলিমের 2351 নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, বিশ্বে যা কিছু চলছে এবং এটি মুসলমানদের কীভাবে প্রভাবিত করছে তার সাথে তথ্য যাচাই করা আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ঘটেনি সে বিষয়ে অন্যদের সতর্ক করা শুধুমাত্র সমাজে দুর্দশা সৃষ্টি করে এবং মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল বাড়িয়ে দেয়। এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

একজন মুসলমানকে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন না কেন তারা বিচারের দিন অন্যদের সাথে যাচাই করা তথ্য শেয়ার করেননি। তবে তিনি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যদি তারা অন্যদের সাথে তথ্য ভাগ করে, তা যাচাই করা হোক বা না হোক। অতএব, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান কেবলমাত্র যাচাইকৃত তথ্য শেয়ার করবে এবং যা যাচাই করা হয় না তা জেনেও তারা ত্যাগ করবে যে তারা এর জন্য দায়ী হবে না।

জ্ঞান অর্জন

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ক্রমাগত সমস্ত লোককে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং প্রায়শই এর গুণাবলী তুলে ধরতেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে একজন ব্যক্তি যদি তাদের বাড়ি থেকে পাপের বিশাল বোঝা নিয়ে বের হয় তখন কিছু ইসলামিক জ্ঞান শুনতে পায় যা তাকে আন্তরিকভাবে তাওবা করতে উত্সাহিত করে, তাহলে তারা নির্দোষ হয়ে ঘরে ফিরে আসবে। তাই আলেমদের সমাবেশ ত্যাগ করা উচিত নয়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 332-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ কী হারাম ও হারাম করেছেন তা জানেন এমন একজন আলেমের মৃত্যুর চেয়ে এক হাজার উপাসকের মৃত্যু সহ্য করা সহজ। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 330-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞানের তৃষ্ণা যে ছিল, তা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্য দ্বারা নির্দেশিত হয়। তিনি একবার বলেছিলেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞান পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সম্মিলিত জ্ঞানের চেয়ে বেশি হবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 360-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর (রাঃ) তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ইসলামী সাম্রাজ্যের মধ্যে ইসলামের সমস্ত শিক্ষকদের আর্থিক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে তারা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা ও শিক্ষাদানে নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 369-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্য জুড়ে স্কুল তৈরি করেছিলেন এবং সাধারণ জনগণের জ্ঞান অর্জনের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 371-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 219 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শেখা স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 100 চক্রের চেয়ে উত্তম। এবং ইসলামিক জ্ঞানের একটি বিষয় শেখা এমনকি যদি কেউ এটির উপর আমল না করে তবে স্বেচ্ছায় প্রার্থনার 1000 চক্রের চেয়ে উত্তম।

একটি শ্লোক শেখার মধ্যে অধ্যয়ন করা এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একজনের জীবনে এর শিক্ষাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমান তখনই এই পুরস্কার লাভ করবে যখন তারা যে জ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখেছে তার উপর কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবে

এবং সুযোগটি উপস্থিত হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। কেবলমাত্র যখন কেউ তাদের ইসলামিক জ্ঞানের বিষয়ে আমল করার সুযোগ পায় না তখন তারা বাস্তবে আমল না করলেও 1000 সাইকেল নামাজ পড়ার সওয়াব পাবে। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে বিচার ও পুরস্কার দেন এবং তাই সুযোগ পেলে যারা আন্তরিকভাবে কাজ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিস দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা স্বেচ্ছাসেবী ইবাদতের চেয়ে অনেক উন্নত। এর কারণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠরা আরবি ভাষা বোঝে না এবং তাই তাদের আচরণ এবং মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম কারণ তারা মহান আল্লাহর উপাসনা করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা তারা বোঝে না। যদিও, জ্ঞানের উপর শেখা এবং অভিনয় করা একজনকে আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই কারণেই কিছু মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী উপাসনা করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করে, তবুও আল্লাহ, মহান বা মানুষের প্রতি তাদের আচরণ সামান্যতম উন্নতি করে না। এটি এখন পর্যন্ত কর্মের সেরা কোর্স নয়।

একটি সুন্দর উপদেশ - 4

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 334-335-এ নিম্নলিখিত খুতবাটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, লোভ হলো দারিদ্র্য এবং হতাশা হলো ঐশ্বর্য।

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট। যে সর্বদা অধিক জাগতিক জিনিসের প্রয়োজন সে অভাবী, যা গরীবদের জন্য আরেকটি শব্দ, যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট সে অভাবী নয় এবং তাই তাদের কাছে সামান্য সম্পদ বা পার্থিব জিনিস থাকলেও সে ধনী।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তাতে যে সন্তুষ্ট, তাকে অনুগ্রহ প্রদান করা হবে যা তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে এবং এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদান করবে।

পক্ষান্তরে, যারা সন্তুষ্ট নয় তারা এই অনুগ্রহ লাভ করবে না যার ফলে তাদের মনে হবে যেন তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এটি তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তির জন্য যা পছন্দ করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্য। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিৎ, সর্বদা তার বান্দার জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যদি তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যদি একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করে, যেমন কঠিন সময়ে ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা, তাহলে তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করা হবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে কিছু লোক যা ব্যবহার করে না তা সংগ্রহ করে।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে কিছু লোক এমন আশা করে যা তারা কখনোই পেতে পারে না।

এটি দীর্ঘ জীবনের জন্য আশা রাখার সমালোচনা হতে পারে।

মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি বড় বাধা দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা করা। এটি একটি অত্যন্ত দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য কারণ এটি একটি মুসলিমের জন্য প্রধান কারণ যা পরকালের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে বস্তুগত জগতকে একত্রিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়। একজনকে শুধুমাত্র তাদের গড় 24 ঘন্টা দিনের মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য তারা বস্তুজগতের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে এবং পরকালের জন্য কতটা সময় উৎসর্গ করে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা রাখা হল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি যা শয়তান লোকেদের বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যবহার করে। যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্ব করে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে তারা অদূর ভবিষ্যতে এর জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই অদূর ভবিষ্যত কখনই আসে না এবং একজন ব্যক্তি পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়েই মারা যায়।

উপরন্তু, দীর্ঘ জীবনের জন্য মিথ্যা আশা একজনকে আন্তরিক অনুতাপ করতে এবং নিজের চরিত্রকে আরও ভালো করার জন্য বিলম্বিত করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এটি করার জন্য তাদের অনেক সময় বাকি আছে। এটি একজন ব্যক্তিকে এই জড়জগতের জিনিসপত্র যেমন সম্পদ মজুত করতে উৎসাহিত করে, কারণ এটি তাদের বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘ জীবনকালে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে। শয়তান লোকেদের এই ভেবে ভয় দেখায় যে তারা তাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে কারণ তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে তাদের সমর্থন করার মতো কেউ নাও পেতে পারে এবং তাই তাদের জন্য আর কাজ করতে পারে না। তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ যেভাবে তাদের ছোট

বয়সে তাদের রিজিকের যত্ন নিয়েছেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সেও তাদের রিজিক দেবেন। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টির বিধান বরাদ্দ ছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা আশ্চর্যজনক যে একজন ব্যক্তি কীভাবে তার জীবনের 40 বছর তাদের অবসর গ্রহণের জন্য উৎসর্গ করবে যা খুব কমই 20 বছরের বেশি স্থায়ী হয় কিন্তু অনন্তকালের জন্য একইভাবে প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর

ইসলাম মুসলমানদেরকে পৃথিবীর জন্য কিছু প্রস্তুত না করার শিক্ষা দেয় না। পরকালকে প্রাধান্য দিলে নিকট ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কোনো ক্ষতি নেই। যদিও, লোকেরা স্বীকার করে যে তারা এখনও যে কোনও সময় মারা যেতে পারে, কেউ কেউ এমন আচরণ করে যেন তারা এই পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। এমনকি এই বিন্দু পর্যন্ত যে তাদের যদি পৃথিবীতে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তবে তারা দিনরাত্রির সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি জড়জগত সংগ্রহ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে সক্ষম হবে না। প্রত্যাশিত সময়ের আগে কতজন মারা গেছেন? আর কতজন এ থেকে শিক্ষা নেয় এবং তাদের আচরণ পরিবর্তন করে?

প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মৃত্যুর সময় বা আখেরাতের অন্য কোন পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা অনুভব করবেন তা হল পরকালের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে দেরি করার জন্য অনুশোচনা। অধ্যায় 63 আল মুনাফিকুন, আয়াত 10-11:

"আর আমরা তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের একজনের মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যদি আমাকে অল্প সময়ের জন্য বিলম্ব করেন তাহলে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং

সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। " কিন্তু আল্লাহ কখনই দেরী করবেন না কোন আত্মা যখন তার সময় হয়ে যাবে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

একজন ব্যক্তিকে বোকা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যদি তারা এমন একটি বাড়িতে বেশি সময় এবং সম্পদ উৎসর্গ করে যেখানে তারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকার পরিকল্পনা করে এমন একটি বাড়ির তুলনায় অল্প সময়ের জন্য বাস করতে চলেছে। চিরন্তন পরকালের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ এটি।

মুসলমানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যই কাজ করা উচিত কিন্তু এটা জেনে রাখা উচিত যে মৃত্যু একজন ব্যক্তির কাছে এমন সময়ে আসে না, যে সময়, অবস্থা বা বয়স তাদের পরিচিত কিন্তু তা অবশ্যই আসবে। অতএব, এটির জন্য প্রস্তুতি এবং এটি যা ঘটায় তা এই পৃথিবীতে এমন একটি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যা ঘটবে না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছিলেন যে, কেউ যদি তাকে একটি জিনিস (একটি খারাপ কাজ) দেখায় কিন্তু দাবি করে যে তারা তাদের হৃদয়ে ভাল, তবে তিনি তাদের বিশ্বাস করবেন না।

সহীহ বুখারির ৫২ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যায় কিন্তু যদি তার আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয় তবে পুরো শরীরই সুস্থ হয়ে যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত

প্রথমত, এই হাদিসটি সেই মূর্খ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে যেখানে কেউ তার কথা ও কাজ খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একটি শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী বলে দাবি করে। কারণ ভিতরে যা আছে তা শেষ পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাবে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজের থেকে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন করে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তাকে। এইভাবে আচরণ করা একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। এই শুদ্ধিকরণ তখন শরীরের বাহ্যিক অঙ্গে প্রতিফলিত হবে, যেমন একজনের জিহ্বা এবং চোখ। অর্থ, তারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধার্মিক বান্দার প্রতি ভালবাসার একটি চিহ্ন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই শুদ্ধি একজনকে সমস্ত জাগতিক অসুবিধার মধ্যে সফলভাবে পথ দেখাবে যাতে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্য অর্জন করতে পারে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি তাকে ভালো কাজ দেখায়, তাহলে সে তাদের ভালো মনে করবে।

সুনানে আবু দাউদ, 4993 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষের সম্পর্কে ভাল চিন্তা করা মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে উপাসনার একটি দিক। অর্থ, এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি দিক।

নেতিবাচক উপায়ে জিনিস ব্যাখ্যা করা প্রায়ই গীবত এবং অপবাদের মতো পাপের দিকে নিয়ে যায়। সব ক্ষেত্রেই একজন মুসলিমের উচিত অন্যদের সন্দেহের সুবিধা দেওয়ার জন্য ইতিবাচক উপায়ে যেখানে সম্ভব বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, একটি নেতিবাচক মানসিকতা অবলম্বন করা একটি পরিবার থেকে জাতীয় স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি অনুমান এবং সন্দেহের জন্য একটি জাতি কতবার যুদ্ধে গেছে? মিডিয়াতে পাওয়া বেশিরভাগ কেলেঙ্কারি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি আইন তৈরি করা হয়েছে যা অনুমান এবং সন্দেহের ব্যবহারকে সমর্থন করে। এটি প্রায়শই ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায় কারণ এই মানসিকতার লোকেরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে অন্যরা তাদের কথা বা কাজের মাধ্যমে তাদের খনন করছে। এটি একজনকে অন্যের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল উপদেশ প্রদানকারী দ্বারা উপহাস করা হচ্ছে এবং এটি একজনকে উপদেশ দেওয়া থেকে বাধা দেয় কারণ তারা বিশ্বাস করে যে অন্য ব্যক্তি তাদের কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেবে না। এবং একজন ব্যক্তি এই নেতিবাচক মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন কারণ তারা বিশ্বাস করে

যে এটি কেবল একটি তর্কের দিকে নিয়ে যাবে। এটি অন্যান্য নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, এমনকি যদি তারা ধরে নেয় যে কেউ তাদের খোঁচা দিচ্ছে, তবুও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত যদি এটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে হয়। তাদের ইতিবাচক উপায়ে যেখানে সম্ভব এমন জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত যা একটি ইতিবাচক মানসিকতার দিকে পরিচালিত করে। এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা সুস্থ সম্পর্ক এবং অনুভূতির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা পরিহার কর। প্রকৃতপক্ষে, কিছু অনুমান পাপ..."

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, লোভকে কপটতার একটি শাখা বলেও উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মানুষকে ভালো উপায়ে ব্যয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং নিম্নলিখিত আয়াতটি উদ্ধৃত করেছিলেন: অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 9:

"...আর যে ব্যক্তি তার আত্মার কৃপণতা থেকে রক্ষা পাবে, তারাই সফলকাম হবে।"

কপটতার একটি দিক হল লোভ। তাদের চরম লোভ তাদেরকে মহান আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি রাখে। জামি আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যরা দান করাকে তারা অপছন্দ করে কারণ তাদের লোভ অন্যদের কাছে প্রকাশ পায়। তারা মানুষকে দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখে কারণ তারা সমাজে অন্যকে উদার হিসাবে লেবেল করা অপছন্দ করে। তাই তারা সর্বদা লোকেদের দাতব্য দান করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যেমন খারাপ কারণে দাতব্য সংস্থাকে কন আর্টিস্ট হিসাবে লেবেল করা। এই লোকদের উপেক্ষা করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে লোকদের বিচার করেন যা সহীহ বুখারির 1 নম্বর হাদিসে প্রমাণিত। সুতরাং তাদের দান করা সম্পদ গরীবদের কাছে না পৌঁছালেও যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে দান করে। সুপরিচিত দাতব্য তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী তাদের পুরস্কার পাবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 67:

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের। তারা অন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত বন্ধ করে..."

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষকে আখেরাতের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এই জড় জগতের চেয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে তাকে তৃপ্তি দান করা হবে, তাদের বিষয়গুলি তাদের জন্য সংশোধন করা হবে এবং তারা পাবে। সহজ উপায়ে তাদের নির্ধারিত বিধান।

হাদিসের এই অর্ধেকটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে, যেমন এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে বৈধ উপায়ে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদান করাকে তৃপ্তি দেওয়া হবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ লোভী না হয়ে এবং আরও জাগতিক জিনিস পাওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা না করে তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হয়। বাস্তবে, যে ব্যক্তি যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট সে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি, যদিও তাদের কাছে সামান্য সম্পদ থাকে যদিও তারা জিনিস থেকে স্বাধীন হয়। যে কোনো কিছুর স্বাধীনতাই একজনকে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

তদতিরিক্ত, এই মনোভাব একজনকে তাদের জীবনে উদ্ভূত যে কোনও জাগতিক সমস্যাগুলির সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে মোকাবিলা করার অনুমতি দেবে। এর কারণ হল বস্তুজগতের সাথে যত কম যোগাযোগ করে এবং পরকালের দিকে মনোনিবেশ করে তত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে। একজন ব্যক্তি যত কম পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে তার জীবন তত বেশি আরামদায়ক হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে একটি ঘরের অধিকারী তার কাছে দশটি ঘরের অধিকারী ব্যক্তির তুলনায় একটি ভাঙা কুকারের মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য কম সমস্যা থাকবে। অবশেষে, এই ব্যক্তি সহজে এবং আনন্দের সাথে তাদের হালাল রিযিক প্রাপ্ত হবে. শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাদের রিযিকের মধ্যে এমন অনুগ্রহ স্থাপন করবেন যে এটি তাদের সমস্ত দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আবৃত করবে, অর্থাৎ তাদের এবং তাদের নির্ভরশীলদের সন্তুষ্ট করবে।

কিন্তু এই হাদিসের অন্য অর্ধেক যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের চেয়ে বস্তুগত জগতকে প্রাধান্য দেয়, নিজের কর্তব্যকে অবহেলা করে বা এই জড়

জগতের অপ্রয়োজনীয় ও বাড়াবাড়ির জন্য চেষ্টা করে, সে দেখতে পাবে যে, পার্থিব জিনিসের জন্য তাদের প্রয়োজন, অর্থ লোভ। কখনই সন্তুষ্ট হন না যা সংজ্ঞা দ্বারা তাদের দরিদ্র করে তোলে যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। এই লোকেরা সারাদিন একটি পার্থিব সমস্যা থেকে অন্য জগতে যাবে এবং তারা অনেক পার্থিব দরজা খুলে দিয়েছে বলে তৃপ্তি অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তারা তাদের নির্ধারিত রিজিক কষ্টের সাথে পাবে এবং এটি তাদের সন্তুষ্টি দেবে না এবং তাদের লোভ পূরণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হবে না। এমনকি এটি তাদেরকে হারামের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা শুধুমাত্র উভয় জগতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেছেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে তিনি অল্প ব্যবধানে রক্ষা পাবেন।

এটি নেতৃত্বের বিপদকে নির্দেশ করে এবং যে ব্যক্তি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে মহান আল্লাহর আদেশের অধীন করে না তাকে কীভাবে এটি কলুষিত করতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের বিশ্বাস নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্খা করে, ঠিক যেমন খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায় পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য বা দীর্ঘকাল বসবাস করেন না কেন, তিনি তাদের দ্বারা সঠিক কাজ করার চেষ্টা করবেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে

দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সম্পদের যত্ন নিতে হবে।

এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কেউ যখন আশীর্বাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে তখন সঠিক মনোভাব গ্রহণ করতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্নতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

উপকারী কথোপকথন

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিশ্চিত করেছেন যে তাঁর সাথে যারা আসত তারা সর্বদা উপকারী বিষয় নিয়ে কথা বলত। তিনি এর জন্য এতটাই স্বীকৃত হয়েছিলেন যে আল আব্বাস তার ছেলে আবদুল্লাহকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি প্রায়শই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে থাকতেন, তার সামনে কাউকে গীবত না করার জন্য। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৮৮৯ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৯৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত ও অপবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

গীবত করা হল যখন কেউ তাদের পিঠের পিছনে এমনভাবে সমালোচনা করে যা তাদের কাছে অপছন্দনীয় হবে যদিও এটি সত্য। যদিও, অপবাদ গীবত করার মতই, তবে উক্তিটি সত্য নয়। এই পাপগুলি প্রধানত বক্তৃতা জড়িত কিন্তু অন্যান্য জিনিস অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমন হাতের সংকেত ব্যবহার করা। এগুলো বড় পাপ এবং গীবতকে পবিত্র কুরআনে মৃত লাশের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

“...এবং একে অপরকে গুপ্তচরবৃত্তি বা গীবত করবেন না। তোমাদের কেউ কি মৃত অবস্থায় তার ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তুমি এটা ঘৃণা করবে..."

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এই গুনাহগুলি একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে থাকা বেশিরভাগ পাপের চেয়েও খারাপ। এর কারণ হল একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যকার গুনাহসমূহ, যদি পাপী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় তবে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ একজন গীবতকারী বা নিন্দাকারীকে ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তবে বিচারের দিন গীবতকারী/নিন্দাকারীর ভাল কাজগুলি তাদের শিকারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শিকারের পাপগুলি তাদের গীবতকারী/নিন্দাকারীকে দেওয়া হবে। এর ফলে গীবতকারী/নিন্দাকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। এটি সহীহ মুসলিম, 6579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেবলমাত্র গীবত করা বৈধ হয় যখন একজন অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করে এবং রক্ষা করে বা যদি একজন ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষের সাথে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের সমাধান করে, যেমন একটি আইনি মামলা।

এসব বড় পাপের কুফল সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে গীবত ও অপবাদ পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র এমন শব্দগুলি উচ্চারণ করা উচিত যা তারা আনন্দের সাথে ব্যক্তির সামনে বলবে সম্পূর্ণরূপে জেনে যে তারা এটিকে আক্রমণাত্মক উপায়ে নেবে না। তৃতীয়ত, একজন মুসলমানের উচিত অন্যের সম্বন্ধে কেবলমাত্র শব্দ উচ্চারণ করা যদি অন্য কেউ তাদের সম্পর্কে এই বা অনুরূপ শব্দগুলি বললে তাদের আপত্তি না থাকে। অর্থ, তারা অন্যদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে যেভাবে তারা চায় যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে কথা বলুক। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের নিজেদের দোষত্রুটি

সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করা এবং আন্তরিকভাবে করা হলে তা অন্যের গীবত ও অপবাদ থেকে বিরত থাকবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই বৈশিষ্ট্যটিও উত্তম সাহচর্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে সত্যিকারের ভালবাসার একটি প্রধান চিহ্ন হল যখন কেউ তাদের প্রিয়জনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কারণ আনুগত্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি একজন ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা এবং সাফল্য কামনা করে না সে কখনই তাকে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে না, তারা যা দাবি করুক বা অন্য ব্যক্তির সাথে কীভাবে আচরণ করুক না কেন। একজন মানুষ যেমন খুশি হয় যখন তার প্রিয় পার্থিব সাফল্য লাভ করে, চাকরির মতো, তারাও তার প্রিয়জনের পরকালের সাফল্য কামনা করবে। যদি একজন ব্যক্তি অন্যের নিরাপত্তা এবং সাফল্য লাভের বিষয়ে চিন্তা না করে, বিশেষ করে পরবর্তী জগতে, তাহলে তারা তাদের ভালোবাসে না।

একজন সত্যিকারের প্রেমিক তাদের প্রেয়সীকে ইহকাল বা পরকালে কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হতে দেখে ও তা সহ্য করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে পরিহার করা যায়। অতএব, তারা সর্বদা তাদের প্রিয়তমকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করবে। কোন ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যকে তার নিজের স্বার্থ বা অন্যের স্বার্থের দিকে পরিচালিত করে, তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে না। এটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার মতো সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অতএব, একজন মুসলমানের মূল্যায়ন করা উচিত যে তাদের জীবনে যারা তাদেরকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে, নাকি না। যদি তারা তা করে তবে এটি তাদের প্রতি তাদের ভালবাসার স্পষ্ট লক্ষণ। যদি তারা তা না করে তবে এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে তারা তাদের সত্যিকারের ভালবাসে না। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

অভিভাবকদের সম্মান করা

যদিও সামরিক অভিযানে অংশ নেওয়া ইসলামের দ্বারা প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত পুরস্কৃত ছিল, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিশ্চিত করতেন যে সৈনিকের পিতামাতা তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে যখন কিছু বৃদ্ধ পিতা-মাতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তাদের ছেলেদের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করেন, যারা সামরিক অভিযানে চলে গিয়েছিল, তখন তিনি তাদের পিতামাতার সাথে থাকার জন্য ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 380-383-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত বৈশিষ্ট্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ১৭ অধ্যায় আল ইসরা, আয়াত 23-এর মতো অনেক জায়গায় পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়াকে একমাত্র তাঁর ইবাদত করার পাশে রেখেছেন:

" আর তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আপনার সাথে থাকা অবস্থায় তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হউক, তাদের [এতটা] বলবেন না, "উফ," [1] এবং তাদের তাড়িয়ে দিও না, বরং তাদের সাথে ভালো কথা বল।"

প্রকৃতপক্ষে এই একই আয়াত মুসলমানদেরকে তাদের পিতামাতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে নিষেধ করে। পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাকে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে একত্রিত করেছেন। অধ্যায় 31 লুকমান, আয়াত 14:

"... আমার এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও..."

যদিও, পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ করার আদেশ দেওয়ার জন্য অসংখ্য হাদিস রয়েছে, সুনানে ইবনে মাজা, 3662 নম্বরে পাওয়া একটি মাত্র হাদিসই এর গুরুত্ব বোঝার জন্য যথেষ্ট। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একজনকে উত্তর দিয়েছিলেন যিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে তারা সন্তানের জান্নাত বা জাহান্নাম ঘোষণা করে পিতা-মাতার অধিকার কী। অর্থ, কেউ যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ করে, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু যারা তাদের পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তারা এর কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

যদিও, পিতা-মাতার আনুগত্য করা, যতক্ষণ না এর সাথে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা জড়িত না হয়, তা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে, এই দিন এবং যুগে মুসলমানদের ধৈর্য ধরে থাকার চেষ্টা করা উচিত এবং তাদের পিতামাতার সাথে তর্ক না করা উচিত। যদি কোন মুসলমান তাদের সাথে একমত না হয় তবে তারা সর্বদা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখতে পারে এবং এখনও করা উচিত।

দুই পবিত্র মসজিদে পরিবর্তন

পৃথিবীর সেরা স্থান

মদিনায় পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মসজিদটি প্রাথমিকভাবে ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছিল যার উপরে খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি একটি হালকা ছাদ ছিল। আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফত আমলে এর কোনো উন্নতি করেননি। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর খিলাফত আমলে এটিকে বড় করে তোলেন, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে যেভাবে ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি করেছিলেন সেভাবে এটিকে পুনর্নির্মাণ করেন এবং তিনিও তার কাঠের স্তম্ভ পুনরুদ্ধার. তাঁর খিলাফতকালে উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, পরিবর্তন ও বড় ধরনের সংযোজন করেন। তিনি এর দেয়ালগুলি কাটা পাথর ও প্লাস্টার দিয়ে, পাথরের স্তম্ভ এবং সেগুনের ছাদ দিয়েছিলেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার মসজিদ আল হারামেও কিছু সাধারণ পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি মসজিদের সাথে সংযুক্ত ইব্রাহিমের স্টেশনটি এখন যেখানে রয়েছে সেখানে স্থানান্তরিত করেন, যাতে মানুষের জন্য আল্লাহর ঘর, কাবাকে প্রদক্ষিণ করা এবং সেখানে প্রার্থনা করা সহজ হয়। তিনি মসজিদের আশেপাশে থাকা কিছু বাড়ি ক্রয় ও ভেঙ্গে মসজিদকে বড় করেন। তিনি মসজিদের চারপাশে নিচু দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন যাতে তাদের উপর বাতি স্থাপন করা যায়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 387-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

তারা সুনানে ইবনে মাজা, 738 নম্বরে পাওয়া মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসকে কার্যকর করেছে। এতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, এমনকি একটি চড়ুইয়ের মত ছোটও। বাসা বা তার চেয়ে ছোট মহান আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 201-202-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করে না। কিংবা তাদেরকে সর্বদা মসজিদে বসবাসের নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজারের জায়গায় যাওয়ার চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যেখানে, মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান।

এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন ছাত্র যেমন একটি লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয় যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে।

একজন মুসলমানকে অন্য জায়গার চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

ভ্রমণকারীদের জন্য

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী অঞ্চলের মধ্যে চলাফেরা করা সহজতর করার জন্য প্রচুর সংখ্যক উট বরাদ্দ করেছিলেন। তিনি খাদ্য ঘর স্থাপন করেছিলেন যা আটকে থাকা ভ্রমণকারী এবং বিদেশী অতিথিদের সমর্থন করেছিল। তিনি মক্কা ও মদিনার মধ্যে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জন্য উটে চড়ার ব্যবস্থা করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 388-389-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ভ্রমণকারীকে সাহায্য করার জন্য কুরআনের আদেশ বাস্তবায়ন করেছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 215:

"তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], তারা কি ব্যয় করবে? বলুন, "তোমরা যা কিছু ভালো কিছু ব্যয় কর তা মুসাফিরের জন্য..."

পথিক হল সেই আগন্তুক যে ভিনদেশে আটকে আছে। আল্লাহ, মহান, মুসলমানদেরকে তাদের যাত্রায় সাহায্য করার জন্য তাদের কিছু সম্পদ তাদের দিতে উৎসাহিত করেন কারণ তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে এবং তাদের অনেক খরচ হতে পারে। যার কাছে সম্পদ আছে তার উচিত এই অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং তাদের যে কোন উপায়ে সাহায্য করা,

যদিও তা তাদের খাদ্য বা পরিবহনের মাধ্যম দিয়ে বা তাদের ভ্রমণের সময় তাদের সাথে ঘটতে পারে এমন কোনো অন্যায় থেকে রক্ষা করা।

উপরন্তু, এটি তাদের বাড়ির বাইরে মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়া যে কেউ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সুনানে আবু দাউদ, 4815 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, জনসাধারণের সামনে মিলিত হওয়ার সময় জনগণকে অবশ্যই সর্বজনীন রাস্তার অধিকার পূরণ করতে হবে।

এই হাদিসে সর্বপ্রথম উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের উচিত তাদের দৃষ্টি নত করা এবং তাদের জন্য হারাম জিনিসের দিকে তাকায় না। আসলে, একজনের উচিত তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেমন তাদের জিহ্বা এবং কানকে একইভাবে রক্ষা করা।

এই হাদীসে উপদেশ দেওয়া পরবর্তী বিষয় হল, তারা যেন তাদের ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এতে বক্তৃতা আকারে ক্ষতি, যেমন অশ্লীল ভাষা এবং গীবত করা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ক্ষতি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার শারীরিক ও মৌখিক ক্ষতিকে মানুষ ও তাদের সম্পদ থেকে দূরে রাখে। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, অন্যকে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এর মধ্যে রয়েছে একজনের কথার মাধ্যমে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন শুরু করা এবং অন্যদের কাজে শান্তি দেখানো। নিজের কথার মাধ্যমে অন্যকে শান্তি প্রসারিত করা এবং তারপর তাদের কাজের মাধ্যমে তাদের ক্ষতি করা খাঁটি ভণ্ডামি।

পরিশেষে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি মুসলিমদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার পরামর্শ দেয়। জামে আত তিরমিযী, ২১৭২ নং হাদীসে আলোচিত তিনটি স্তর অনুযায়ী এটি করা উচিত। সর্বোচ্চ স্তর হল আইনের সীমারেখার মধ্যে নিজের কর্মের সাথে এটি করা। এর পরের স্তরটি হল একজনের কথার সাথে এটি করা। আর সর্বনিম্ন স্তর হল, গোপনে অন্তরের অর্থ দিয়ে করা। এ দায়িত্ব সর্বদা ইসলামী জ্ঞান অনুযায়ী এবং নম্রভাবে পালন করতে হবে। প্রায়শই মুসলমানরা সঠিক জিনিসের উপদেশ দেয় কিন্তু তারা যেমন কঠোরভাবে তা করে, তারা শুধুমাত্র মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই সদয় আচরণের সাথে জ্ঞানকে একত্রিত করা অত্যাবশ্যক যাতে পরামর্শটি অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

উপসংহারে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মুসলমানের উচিত তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোকের প্রতি এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা এবং প্রদর্শন করা।

বাণিজ্য রুট উন্নত করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী অঞ্চলের অবকাঠামোর উন্নতির জন্য মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যেমন জলপথ খনন এবং সেতু মেরামত। সহজ যাতায়াত ও বাণিজ্যের সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে রুট স্থাপন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একটি পুরানো জলপথ পুনঃখনন করেছিলেন যা আরব উপদ্বীপকে আল-ফুসতাতের সাথে সংযুক্ত করেছিল, যা মিশরের নতুন রাজধানী হয়ে ওঠে। এতে সমগ্র অঞ্চলে সমৃদ্ধি এসেছে।

তিনি টাইগ্রিস নদী থেকে বসরা শহরে জল আনার জন্য একটি জলপথ খনন করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 390-391-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি একটি বৈধ জীবনযাপনের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দাবি করে, তাদের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে এবং মহান আল্লাহ্‌ অকার্যকর জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা। একজন মুসলিম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান যার মধ্যে রয়েছে সম্পদও বরাদ্দ করা হয়েছিল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তাই একজন মুসলমানের উচিত হবে আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা দাবী করার সময়, যখন তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়সমূহের মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় আছে, তখন সামাজিক সুবিধা নিয়ে চলার মাধ্যমে অলস হওয়া উচিত নয়।

ইসলামিক শহর

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে ইসলামি সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ায়, ইসলামী অঞ্চল এবং সদ্য বিজিত ভূমির মধ্যে ভূমিতে শহর নির্মাণ করেছিলেন। তিনি লোকেদের তাদের পরিবারের সাথে চলাফেরা করতে উত্সাহিত করেছিলেন এবং তাদের সংস্থান এবং কাজের সুযোগ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। তিনি এই শহরগুলির মধ্যে মসজিদ, বাড়ি, বাজার এবং যা কিছু মানুষকে সুন্দর জীবন দেওয়ার জন্য প্রয়োজন তা নির্মাণ করেন। এই শহরগুলি অমুসলিমদের জন্য শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে যেখানে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে যে কীভাবে ইসলামের শিক্ষাগুলিকে বাস্তবায়ন করা সবার জন্য শান্তি, ন্যায়বিচার এবং অন্যান্য সুবিধা ছড়িয়ে দেয়। এটা ছিল অনেকের ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 391-393-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, তারা এমন কিছু যারা দাবি করে যে এই পৃথিবীতে ঈমানের প্রয়োজন নেই এবং অন্যরা যারা মুসলিম তারা দাবি করে যে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য না করে ইসলামকে সমর্থন করাই যথেষ্ট। কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে অপরাধ বৃদ্ধি ঈমানের গুরুত্ব প্রমাণ করে এবং জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে তা শক্তিশালী করে। এর কারণ হল অপরাধ এবং পাপ শুধুমাত্র তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি মনে করেন যে তারা হয় তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কোন পরিণতির সম্মুখীন হবেন না, যেমন জেল, অথবা তারা কোনভাবে তাদের থেকে পালিয়ে যাবে, উদাহরণস্বরূপ, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা যে কাজই করুক না কেন, প্রকাশ্য বা গোপন, বড় বা ছোট, এবং তারা যে কৌশলের চেষ্টাই করুক না কেন, নিঃসন্দেহে সেখানে আসবে যেখানে তাদের সমস্ত কাজের জন্য জবাবদিহি করা হবে করার আগে সর্বদা দুবার

চিন্তা করবে। একটি অপরাধ বা একটি পাপ। ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা হলে তা অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত থাকবে। মানুষ এভাবে কাজ করলে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়ত। অপরাধের হার হ্রাস পাবে এবং সময়গুলি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঠিক নির্দেশিত খলিফাদের সময়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই সত্যটিই বিশ্বাসের গুরুত্বকে নির্দেশ করে এবং সমাজের মধ্যে জ্ঞান অর্জন ও তার উপর কাজ করার মাধ্যমে এটিকে শক্তিশালী করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 90:

"*নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের [সাহায্য] করার নির্দেশ দেন এবং অনৈতিক কাজ, মন্দ আচরণ ও জুলুম থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সম্ভবত তোমরা স্মরণ করিয়ে দেবে।*"

ভাল খরচ

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নতুন শহর নির্মাণ করেছিলেন, তখন প্রাথমিকভাবে বাড়িগুলো নল দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। কুফাহ এবং বসরার মতো এই শহরগুলির মধ্যে কিছু অগ্নিকাণ্ডের পরে, নল দিয়ে তৈরি এই বাড়িগুলির অনেকগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গভর্নররা তাদের ইট দিয়ে পুনরায় নির্মাণের অনুমতি চাইলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু কোনো বাড়িতে তিনটি কক্ষের বেশি থাকা উচিত নয় এবং কেউ উঁচু ভবন নির্মাণে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা উচিত নয় এই বলে তাদের বাড়াবাড়ি এড়ানোর জন্য সতর্ক করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 399-400-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আমর ইবনে আল আস, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, যিনি মিশরের গভর্নর ছিলেন, আল ফুসতাত শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা সেই সময়ে মিশরের রাজধানী হয়েছিল। তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ভবিষ্যত খলিফাদের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন, যাতে তারা মিশর সফরে যাওয়ার সময় তাদের থাকার জায়গা ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জানানো হলে, তিনি তাকে বাড়িটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন এবং এর পরিবর্তে স্থানীয় জনগণের সেবা করার জন্য তার জায়গায় একটি বাজার নির্মাণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 405-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, ভবন নির্মাণে ব্যয় করা সম্পদ ব্যতীত সমস্ত বৈধ ব্যয় মহান আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব লাভ করে।

এর মধ্যে হালাল জিনিসের উপর সমস্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত যা অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত। নির্মাণে ব্যয় করা যা প্রয়োজন তা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে যে নির্মাণ প্রয়োজন তার বাইরে। এটি অপছন্দ করা হয় কারণ নির্মাণে ব্যয় করা সহজে অপচয় এবং অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি নির্মাণে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার দাতব্য দান এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করার সম্ভাবনা কম। এছাড়াও এই আচরণটি প্রায়শই একজন মুসলিমকে দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করতে পরিচালিত করে কারণ যারা বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরিতে শক্তি এবং সম্পদ নষ্ট করবে না। দীর্ঘ জীবনের জন্য একজনের আশা যত বেশি হবে তত কম ধার্মিক কাজগুলি তারা করবে এই বিশ্বাসে যে তারা ভবিষ্যতে সবসময় ভাল কাজ করতে পারবে। এটি একজনকে আন্তরিক অনুতাপকে বিলম্বিত করে এই বিশ্বাস করে যে তারা সর্বদা ভবিষ্যতে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে পারে। অবশেষে, এটি এই পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘস্থায়ী থাকার জন্য আরও আরামদায়ক জীবন তৈরি করার জন্য বিশ্বের জন্য আরও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে।

অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া একজনের সময়কে দখল করে যা তাদের স্বেচ্ছামূলক ধার্মিক কাজগুলি করতে বাধা দেয়, যেমন উপবাস এবং স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা চরম ক্লান্তি থেকে। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার প্রচেষ্টা থেকেও বাধা দেয়।

অবশেষে, বাস্তবে অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে অংশ নেওয়া কখনই শেষ হয় না। অর্থ, যে মুহূর্তে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির একটি অংশ সম্পূর্ণ করে তারা পরবর্তীতে চলে যায় যতক্ষণ না চক্রটি পুনরাবৃত্তি হয়।

অতএব, মুসলমানদের উচিত কেবল নির্মাণের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা উচিত যাতে তারা এই নেতিবাচক পরিণতিগুলি এড়াতে পারে।

অহংকার পরিহার করা

বসরার গভর্নর হিসেবে উমর ইবনে খাত্তাব যখন উতবাহ ইবনে গাজওয়ানকে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে মহান আল্লাহকে ভয় করার পরামর্শ দেন এবং তাকে ঔদ্ধত্য অবলম্বন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন কারণ এটি তার মুসলিম ভাইদের সাথে তার বন্ধন নষ্ট করবে। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে একজন নেতা হিসাবে তার কথা শোনা হবে এবং তার আনুগত্য করা হবে এবং এটি তার জন্য একটি মহান আশীর্বাদ হবে যতক্ষণ না তিনি তার চেয়ে ভাল বোধ করবেন না বা অন্যদের অবজ্ঞা করবেন না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 352-353-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

" আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর যদিও তারা তাদের নিজেদের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যদের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। এটা হল সরল অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে তাদের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায় কারণ মহান আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি । প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা

তাঁর খিলাফতের সময় যখন ইসলামী সাম্রাজ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল এবং ফলস্বরূপ মুসলমানরা পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করছিল, তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই পার্থিবতা পরিহার করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি লোকদেরকে জাগতিক জিনিসে লিপ্ত না হওয়ার জন্য এবং তার পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে উত্সাহিত করেছিলেন, যে আশীর্বাদগুলি তাদের দেওয়া হয়েছিল তা ব্যবহার করে তাকে খুশি করার উপায়ে। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা যত বেশি পার্থিব জিনিসে লিপ্ত হবে, তত কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে মহান আল্লাহর প্রতি, এবং ফলস্বরূপ তারা উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ হারাবে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 402-404-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা কৃতজ্ঞতার তিনটি দিকই পূরণ করবে যাতে তারা মহান আল্লাহকে অস্বীকারকারী হওয়া এড়াতে পারে, কারণ যে ব্যক্তি বাস্তবে অকৃতজ্ঞ, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে যিনি তাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

"... আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

কৃতজ্ঞতার তিনটি দিক হল অভ্যন্তরীণভাবে মহান আল্লাহকে সকল নেয়ামতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং প্রদানকারী হিসেবে স্বীকার করা। এর একটি দিক হল নিজের নিয়তকে সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। পরবর্তী দিকটি হল জিহ্বার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা। এবং চূড়ান্ত এবং সর্বোচ্চ দিকটি হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামের নির্দেশিত প্রতিটি নেয়ামত ব্যবহার করে নিজের কাজের মাধ্যমে কার্যত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

“এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে আরও বাড়িয়ে দেব। অতঃপর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আমার শাস্তি কঠোর।'

যেহেতু সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা আশীর্বাদের বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায় মুসলমানদের ভয় করা উচিত যে অকৃতজ্ঞতা দেখানোর ফলে তাদের কাছে থাকা নেয়ামতগুলো হয় তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হতে পারে অথবা তাদের আশীর্বাদ উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা এবং অভিশাপ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি যদি একজন মুসলিম সত্যিকারের কৃতজ্ঞ হয় তবে তারা এখনও পরীক্ষা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হবে কারণ তারা নিশ্চিত। কিন্তু যদি তারা সঠিকভাবে আচরণ করে তবে তারা প্রতিটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে যাতে তারা এই পৃথিবীতে মানসিক ও শরীরের শান্তি এবং পরকালে একটি মহান পুরস্কার লাভ করে। এটি সেই রোগীর মতো যাকে অপারেশন করা হয় কিন্তু কোনো ব্যথা অনুভব করে না কারণ তাদের চেতনানাশক করা হয়েছে।

খাদ্য ব্যাংক

মদিনা এবং আশেপাশের অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়, যা ছাইয়ের বছরে সংঘটিত হয়েছিল, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু খাদ্যের সন্ধানে মদিনায় আসা লোকদের জন্য খাদ্য ব্যাংকের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে তার কাছে আসা প্রত্যেককে তাদের কাছে থাকা উপায় অনুসারে খাওয়ানো হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে খাবার রান্না ও বিতরণের তত্ত্বাবধান করতেন এবং এমনকি মানুষের জন্য নিজে রান্নাও করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 412-414-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্যদের প্রতি যে মহান আন্তরিকতা ছিল তা নির্দেশ করে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে

দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

কঠোরতার সাথে ভদ্রতা

ছাইয়ের বছরে, এক বছর যখন মদিনা এবং আশেপাশের অঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু চুরির আইনি শাস্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিলেন। আইনগত শাস্তি বাস্তবায়নের শর্ত না থাকায় তিনি এ কাজ করেছেন। যে ব্যক্তি প্রচন্ড ক্ষুধার্ত হয়ে অন্যের সম্পত্তি খায় সে লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের সম্পদ চুরিকারীর সমান বলে গণ্য হয় না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে, পবিত্র কুরআন কাউকে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় হারাম খাবার খাওয়ার অনুমতি দেয়, তাই এটি কঠিন সময়ে নিজেকে খাওয়ানোর জন্য অন্যের সম্পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ক্ষুধাও অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 3:

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং [সেসব প্রাণী] শ্বাসরোধে বা প্রচণ্ড আঘাতে অথবা মাথার ওপরে পড়ে যাওয়া বা গর্জন দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। শিং, এবং যেগুলি থেকে একটি বন্য প্রাণী খেয়েছে, আপনি যা [মৃত্যুর আগে] জবাই করতে পারেন এবং যা পাথরের বেদীতে বলি দেওয়া হয়...কিন্তু যে কেউ পাপের প্রতি প্রবণতা ছাড়াই তীব্র ক্ষুধায় বাধ্য হয় - তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

চোরদের কঠোর সমালোচনা করা হবে এবং হুমকি দেওয়া হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে চাবুক মারা হবে কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় এর চেয়ে বেশি কিছু করা হয়নি।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকা থেকে বাধ্যতামূলক দান সংগ্রহ করতে বিলম্ব করেছিলেন, পরের বছর, যখন দুর্ভিক্ষ প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

কোন সাহাবী, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাঁর আদেশের প্রতি আপত্তি করেননি কারণ তারা ন্যায়সঙ্গত ছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 421-423-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ইসলামের কোমল প্রকৃতি নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের

পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

“অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

সতর্কতা অবলম্বন করা বিশ্বাস করা হয়

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মানুষের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য সিরিয়া সফর করার সিদ্ধান্ত নেন। যখন তিনি আরব উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার সীমান্তে পৌঁছেছিলেন তখন তাকে বলা হয়েছিল যে সিরিয়ায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাকে ফিরে যেতে হবে। এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন কি করবেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সঠিক পথে থাকার এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন এবং অন্যরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ সতর্কতা অবলম্বন করা মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রস্থান করার আগে আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের শিবিরে উপস্থিত হন এবং তাদেরকে জানান যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেছিলেন। যে দেশে প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে মানুষ যেন সেখানে প্রবেশ না করে। কিন্তু প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সময় যদি তারা ইতিমধ্যেই ভিতরে থাকে তবে তাদের দেশ ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। সহীহ বুখারীর ৫৭২৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল সেই উপায়গুলি ব্যবহার করা যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে সরবরাহ করা হয়েছে, এবং তারপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে পরিস্থিতির ফলাফল, যা মহান আল্লাহ একাই বেছে নেন, জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম। . অতএব, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তের মূল ছিল মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার।

জামে আত তিরমিযী, 2344 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সত্যই মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে, তবে তিনি পাখিদের যেমন রিজিক দেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দেবেন। সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ছেড়ে সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল এমন একটি বিষয় যা অন্তরে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে একমাত্র মহান আল্লাহই একজনকে উপকারী জিনিস প্রদান করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে দিতে, আটকাতে, ক্ষতি করতে বা উপকার করতে পারে না।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ যে উপায়গুলো দিয়েছেন, যেমন ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে

দেওয়া উচিত। আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করে। যখন কেউ মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় ব্যবহার করে, তখন ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তারা নিঃসন্দেহে তাঁর আনুগত্য করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। বহু আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে । অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাবধান হও..."

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই হলো মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভ্যন্তরীণ আস্থার অধিকারী হলেও বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

কর্ম এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, ক্রিয়াগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল সেই সমস্ত আনুগত্যের কাজ যা মহান আল্লাহ মুসলমানদের করতে আদেশ করেন যাতে তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাত লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এই বিশ্বাস দাবী করার সময় এগুলো পরিত্যাগ করা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা এবং তাই দোষারোপযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম হল সে সকল মাধ্যম যা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণা পেলে পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম কাপড় পরিধান করা। যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। যাইহোক, কিছু লোক আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনব্যাপী রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে সেই কাজ করতে নিষেধ করতেন, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি প্রদান করেন। এটি সহীহ বুখারি, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী বিন আবু তালিবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট না হন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ অনুভব করা। সুনানে ইবনে মাজাহ, 117 নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, যদি একজন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি প্রদান করে তবে তা গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় এটা দোষারোপযোগ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকারের কর্ম হল সেসব কাজ যা একটি প্রথাগত অভ্যাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেই সব মানুষ যারা ওষুধের প্রয়োজন ছাড়াই রোগ নিরাময় করে। এটি বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে বেশ সাধারণ যেখানে ওষুধ পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2144 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে যুক্ত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে ছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করেন তিনি সক্রিয়ভাবে এই জেনেও ব্যবস্থা নাও পেতে পারেন যে

এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা তাদের মিস করতে পারে না। সুতরাং এই ব্যক্তির জন্য রিযিক প্রাপ্তির প্রথাগত উপায় যেমন চাকরির মাধ্যমে তা অর্জন করা মহান আল্লাহ তায়ালা ভেঙে দিয়েছেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদ। অভিযোগ না করে বা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে যে এমন আচরণ করতে পারে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যদি এই পথ বেছে নেয় তবে দোষমুক্ত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া একটি পাপ। তারা এই উচ্চ পদে থাকতে পারে।

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলে নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকে। অর্থ, মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা কিছু বেছে নেন তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করেন কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহই তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তমটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপসংহারে বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা সর্বোত্তম, বৈধ উপায় ব্যবহার করে একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস

করেন যে শুধুমাত্র আল্লাহ, উচ্চতর, সিদ্ধান্ত নেবে ঘটবে, যেটি নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ যে তারা এটি পালন করে বা না করে।

মেজর প্লেগ

নিয়তিকে গ্রহণ করা

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের 17 তম বছরে, একটি বড় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দেশে, বিশেষ করে সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সিনিয়র সাহাবী, যেমন আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ এবং মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা গেছেন। তারা সকলেই মহান আল্লাহর প্রতি ধৈর্যশীল ও আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা আদেশ করেছিলেন তা সহজেই মেনে নেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 424-426-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের জন্য একটি সহজ জিনিস বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের ভাগ্যের সাথে ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করতে সাহায্য করতে পারে এবং এটি যে অসুবিধাগুলি নিয়ে আসে। একজন ব্যক্তি আনন্দের সাথে একটি তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করেন যা তাদের ডাক্তার তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং পছন্দের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে এই বিশ্বাস করে যে তাদের ডাক্তার জানেন যে তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল কি। এটি সত্য যদিও তারা শুধুমাত্র মানুষ এবং ত্রুটি প্রবণ। তবুও, অনেক মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার উপর এই একই স্তরের আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়, যদিও তাঁর জ্ঞান অসীম এবং তাঁর পছন্দগুলি সর্বদা জ্ঞানী। মুসলমানদের উচিত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করা এবং এটি যে সমস্যা নিয়ে আসে ঠিক সেভাবে তারা অভিযোগ না করে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো। তাদের বোঝা উচিত যে তারা যে সমস্যা এবং অসুবিধার মুখোমুখি হয় তা তাদের পক্ষে সবচেয়ে

ভাল হয় যদিও তারা তাদের মধ্যে থাকা জ্ঞানগুলি বুঝতে বা পর্যবেক্ষণ না করে ঠিক যেমন তারা আনন্দের সাথে গ্রহণ করা তিক্ত ওষুধের পিছনে বিজ্ঞান বুঝতে পারে না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা যে তিক্ত ওষুধ গ্রহণ করে তার পিছনের বিজ্ঞানটি তারা কখনই বুঝতে পারে না, একটি সময় অবশ্যই আসবে, ইহকাল হোক বা পরকালে, যখন তারা যে তিক্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তার পিছনের জ্ঞান তাদের কাছে প্রকাশিত হবে। তাই একজন মুসলমানের উচিত এই সময়টা ধৈর্য সহকারে জেনে রাখা যে শীঘ্রই সব প্রকাশ পাবে। এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা অসুবিধা মোকাবেলা করার সময় একজনের ধৈর্য বাড়াতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

বিচ্ছেদের পরামর্শ

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের 17 তম বছরে, একটি বড় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দেশে, বিশেষ করে সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সিনিয়র সাহাবী, যেমন আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ এবং মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা গেছেন। তারা সকলেই মহান আল্লাহর প্রতি ধৈর্যশীল ও আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা আদেশ করেছিলেন তা সহজেই মেনে নেন।

আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যু শয্যা সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জনগণকে নামাজ কায়েম, ফরজ দান, রোজা, দান-খয়রাত, পবিত্র হজ্জ (হজ) ও ওমরা পালন, একে অপরের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখতে, একে অপরকে ভালবাসতে, শাসকদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার উপদেশ দেন। বস্তুজগতের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা যতদিন বেঁচে থাকুক না কেন তারা শেষ পর্যন্ত মারা যাবে তাই, সবচেয়ে চতুর ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক আনুগত্যশীল এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 424-426-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ এই উপদেশটি পূরণ করতে পারে যখন তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে।

বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জড় জগতের কিছুই ভাল বা খারাপ নয়, যেমন সম্পদ। কোন জিনিসকে ভাল বা খারাপ করে তোলে তা হল এটি ব্যবহার করার উপায়। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করা। যখন কোন কিছু সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না তখন তা বাস্তবে অকেজো হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সম্পদ উভয় জগতেই উপযোগী হয় যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় যেমন একজন ব্যক্তি এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হলে তা অকেজো এবং এমনকি বাহকের জন্য অভিশাপও হয়ে যেতে পারে, যেমন মজুত করা বা পাপপূর্ণ কাজে ব্যয় করা। শুধু সম্পদ মজুদ করলে সম্পদের মূল্য নষ্ট হয়। কিভাবে কাগজ এবং ধাতব মুদ্রা এক tucks দূরে দরকারী হতে পারে? এই ক্ষেত্রে, একটি ফাঁকা কাগজের টুকরো এবং টাকার নোটের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এটি তখনই কার্যকর যখন এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যদি তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে চায় তবে তাদের যা করতে হবে তা হল পবিত্র কুরআনে পাওয়া শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। তাকে। কিন্তু যদি তারা সেগুলোকে ভুলভাবে ব্যবহার করে তাহলে একই দোয়া তাদের জন্য উভয় জগতেই বোঝা ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এটা যে হিসাবে হিসাবে সহজ।

কেউ সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা এই দোয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একজন মুসলমানের কাছে থাকা প্রতিটি পার্থিব আশীর্বাদই কেবল একটি উপায় যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। এটা নিজেই শেষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধন-সম্পদ হল এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে, তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার মাধ্যমে। এটি নিজেই একটি শেষ বা চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

এটি শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে পরকালের প্রতি তাদের মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে না বরং যখনই তারা পার্থিব আশীর্বাদ হারাবে তখন এটি তাদের সাহায্য করে। যখন একজন মুসলমান প্রতিটি পার্থিব নিয়ামত যেমন একটি শিশুকে মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এবং নিরাপদে পরকালে পৌঁছায় তখন তা হারানো তাদের উপর তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। তারা দু: খিত হতে পারে, যা একটি গ্রহণযোগ্য আবেগ, কিন্তু তারা শোকগ্রস্ত হবে না যা অধৈর্যতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যা যেমন বিষণ্নতার দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে থাকা পার্থিব নিয়ামত শুধুমাত্র একটি উপায় ছিল তাই এটি হারানো চূড়ান্ত লক্ষ্যে ক্ষতির কারণ হয় না, যেমন জান্নাত, যার ক্ষতি বিপর্যয়কর। অতএব, এখনও ধারণ করা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা তাদের শোকগ্রস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখবে।

উপরন্তু, তারা বুঝতে পারবে যে তারা যে জিনিসটি হারিয়েছে তা কেবল একটি উপায় ছিল তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর এবং পূরণ করার জন্য অন্য একটি উপায় সরবরাহ করবে। এটি তাদের শোক থেকেও রক্ষা করবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব আশীর্বাদকে উপায়ের পরিবর্তে শেষ বলে বিশ্বাস করে, সে যখন তা হারাবে তখন তার পুরো

উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তীব্র দুঃখ অনুভব করবেন। এই শোক বিষণ্নতা এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে।

উপসংহারে, মুসলমানদের উচিত তাদের কাছে থাকা প্রতিটি আশীর্বাদকে নিরাপদে পরকালে পৌঁছানোর উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় নিজেরাই শেষ হিসাবে। এভাবেই একজন ব্যক্তি তাদের দ্বারা আবিষ্ট না হয়েও জিনিসপত্রের অধিকারী হতে পারে। এভাবেই তারা পার্থিব জিনিস তাদের হাতে রাখতে পারে, হৃদয়ে নয়।

বিচ্ছেদের পরামর্শ – 2

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের 17 তম বছরে, একটি বড় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং সারা দেশে, বিশেষ করে সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সিনিয়র সাহাবী, যেমন আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ এবং মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা গেছেন। তারা সকলেই মহান আল্লাহর প্রতি ধৈর্যশীল ও আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা আদেশ করেছিলেন তা সহজেই মেনে নেন।

মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যু শয্যা সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা এমন একটি সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তারা সৎকাজ করতে চাইবে কিন্তু তাদের থেকে বাধা দেওয়া হয়েছিল, তাদের সুযোগ থাকাকালীন কঠোর পরিশ্রম করার। তিনি তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা যা খেয়েছে, পান করেছে, পরিধান করেছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা ব্যয় করেছে তা তাদের কাছে আশা করা যায় না, অন্য সমস্ত সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে দেওয়া হবে। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে তিনি কেবল দীর্ঘ রাত নামাজে কাটাতে, দিনের দীর্ঘ সময় রোজা রাখার জন্য এবং আলেমদের মজলিসে অংশ নেওয়ার জন্য পৃথিবীতে থাকতে চেয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 424-430-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6442 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তির প্রকৃত সম্পদ হল যা সে আখিরাতে প্রেরণ করে অথচ তারা যা রেখে যায় তা বাস্তবে তার সম্পদ। উত্তরাধিকারী

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের সম্পদের মতো যতটা বরকত পাঠাতে পারে, সেগুলিকে এমন উপায়ে ব্যবহার করে যা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এর মধ্যে অযথা, অত্যধিক বা অপব্যয় না করে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কোন মুসলমান তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এবং যদি তারা তাদের মজুদ করে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যায় তবে তারা তাদের পাওয়ার জন্য দায়ী হবে যদিও তারা চলে যাওয়ার পরে অন্যরা তাদের উপভোগ করবে। জামে আত তিরমিযী, ২৩৭৯ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, যদি তাদের উত্তরাধিকারীরা নিয়ামতগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে, এবং যে এটি সংগ্রহ করবে সে বিচারের দিন খালি হাতে থাকবে। অথবা তাদের উত্তরাধিকারী নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যা নিয়ামত অর্জনকারী এবং তাদের উত্তরাধিকারী উভয়ের জন্যই বড় আফসোস হয়ে যাবে, বিশেষ করে, যদি তারা তাদের উত্তরাধিকারী যেমন তাদের সন্তানকে শিক্ষা না দেয়, তাহলে দোয়াগুলোকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি একটি কর্তব্য। তাদের উপর এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তাই মুসলমানদের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা এবং নিশ্চিত করা যে তারা তাদের বাকি নেয়ামতগুলোকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যবহার করে পরকালে নিয়ে যাবে। অন্যথায়, তারা হাশরের দিনে খালি হাতে এবং অনুশোচনায় পূর্ণ থাকবে।

দায়িত্ব পালন

সিরিয়ায় প্লেগ শেষ হওয়ার পর, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের জন্য শুধু সাহায্যই পাঠাননি বরং তাদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করার জন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি প্লেগ দ্বারা বিঘ্নিত বিষয়গুলি সংশোধন করেছিলেন এবং তাঁর শাসনাধীন ব্যক্তিদের অধিকার পূরণের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 431-433-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের

দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখ হালাল জিনিসের দিকে তাকানোর জন্য এবং তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জন্য প্রদান করা এবং মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে কারণ এটিই শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

মোটামুটি আচরণ

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, নিশ্চিত করবেন যে তাঁর পরিবার এবং তাঁর কর্মচারীরা, যেমন তাঁর গভর্নররা, তাদের সামাজিক অবস্থানকে পার্থিব লাভের জন্য ব্যবহার করবেন না, যেমন ব্যবসার মাধ্যমে আরও সম্পদ অর্জন করা। ব্যক্তিগত লেনদেনের মাধ্যমে তারা যে সম্পদ অর্জন করেছিল তার একটি শতাংশ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে করেছিলেন যে তাদের সামাজিক অবস্থান মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা অন্যায্য ছিল বলে সরকারি কোষাগারে রাখা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 441-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই মনোভাব নির্দেশ করে যে একজনকে সৎভাবে ব্যবসায় অংশ নেওয়া উচিত এবং তাদের লাভ বাড়ানোর জন্য তাদের পার্থিব সংযোগগুলি অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2146 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে ব্যবসায়ীরা অনৈতিক লোক হিসাবে উত্থাপিত হবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎ কাজ করে এবং কথা বলে। সত্য।

যারা ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নেয় তাদের জন্য এই হাদীসটি প্রযোজ্য। মহান আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের বক্তৃতায় সৎ হওয়া উচিত লেনদেনের সমস্ত বিবরণ যারা জড়িত তাদের কাছে প্রকাশ করে। সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 2079 নম্বর, সতর্ক করে যে মুসলমানরা যখন আর্থিক লেনদেনে জিনিসগুলি লুকিয়ে রাখে, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, এটি বরকতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে পণ্যের জন্য অত্যধিক অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা না করা। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে সেরকম আচরণ করা যেভাবে তারা অর্থপূর্ণ আচরণ করতে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশের সাথে। একইভাবে, একজন মুসলিম আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার করা পছন্দ করবে না তাদের অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

যারা ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সত্যের অনুসরণ

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আশেপাশের লোকদের সবসময় তাঁর মতামতের বিরোধিতা করলেও তাঁকে সত্য ও আন্তরিক পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। তিনি একবার একদল সাহাবীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, যাদের কাছ থেকে তিনি পরামর্শ চেয়েছিলেন, তিনি তাদের মতই ছিলেন এবং তারা তার সাথে একমত হোক বা না হোক তাদের সিদ্ধান্ত সত্যের উপর ভিত্তি করে দেওয়া উচিত। এবং তাদের সিদ্ধান্তে পবিত্র কুরআন মেনে চলার আহ্বান জানান। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 466-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত সফল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল একে অপরের সাথে এই আচরণ। প্রত্যেকেই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সততার সাথে কথা বলেছেন এবং অন্য কারো সমালোচনাকে ভয় পাননি। মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সকল বিষয়ে সত্যবাদিতা মেনে এই বৈশিষ্ট্যটি গ্রহণ করতে হবে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

মহৎ আচরণ

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য এবং সিনিয়র সাহাবী উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের মধ্যে সদ্য বিজিত জমিগুলিকে ভাগ না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পরিবর্তে অমুসলিমদের তাদের জমি রাখার অনুমতি দেন এবং তাদের উপর তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর আরোপ করেন। অমুসলিমরা তার সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছিল কারণ এটি তাদের জীবনে প্রথমবারের মতো অনুভব করেছিল যে তারা, শাসক শ্রেণী নয়, কৃষি জমির মালিক। পূর্ববর্তী শাসনামলে, এই অমুসলিমরা ছিল কেবল শ্রমিক যারা জমি চাষ করত এবং বিনিময়ে কার্যত কিছুই পেত না। সমস্ত আয় শাসক শ্রেণী গ্রহণ করবে যখন তাদের কাছে পয়সা থাকবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত এই অমুসলিমদেরকে বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে মিত্রতার জন্য উৎসাহিত করেছিল এবং তাদের অনেকেই তাঁর খেলাফতের কারণে সারা দেশে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 466-467-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যখন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে বাস্তবে তা নিজেদের উপকার করে, অন্যদের নয়। এর কারণ হল অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা একটি সওয়াব লাভ করে।

উপরন্তু, যখন কেউ অন্যদের প্রতি সদয় হয় তখন তারা জীবিত অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করবে যা তাদের উপকারে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ মুসলিম, 6929 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, গোপনে একজন ব্যক্তির জন্য করা প্রার্থনা সর্বদা উত্তর দেওয়া হয়।

উপরন্তু, তারা মারা যাওয়ার পরে লোকেরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবে যা অবশ্যই উত্তর দেওয়া হবে কারণ এটি পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 10:

"... বলেন, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী..."

পরিশেষে, যে ব্যক্তি অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে বিচারের দিন তাদের সুপারিশ লাভ করবে, যেদিন মানুষ অন্যদের সুপারিশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। এটি সহীহ বুখারী, 7439 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেও অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তারা পূর্বে উল্লেখিত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হবে। এবং বিচারের দিন তারা দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তাদের শিকার প্রথমে তাদের ক্ষমা করে দেয়। যদি তারা তা না করে তাহলে

নিপীড়কের নেক আমল তাদের শিকারকে দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে শিকারের পাপ তাদের অত্যাচারীকে দেওয়া হবে। এতে অত্যাচারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের প্রতি সদয় হওয়ার মাধ্যমে নিজের প্রতি সদয় হওয়া, কারণ বাস্তবে তারা কেবল নিজেরাই ইহকাল ও পরকালে লাভবান হচ্ছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 6:

"এবং যে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের জন্যই চেষ্টা করে..."

অর্থনৈতিক ব্যাপার

উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতকালে ইসলামি সাম্রাজ্যের দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, জাতিগুলির মধ্যে ব্যবসায়ের সুযোগগুলি আরও সহজলভ্য হয়ে ওঠে। বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে আসা এবং ত্যাগকারী প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উপর শুল্ক শুল্ক আরোপ করেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বিদেশী জাতিগুলির মতো। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার উপর সন্তুষ্ট, ট্যাক্সটি ন্যূনতম ছিল তা নিশ্চিত করেছিলেন, শুধুমাত্র তাদের জন্য এটি প্রয়োগ করতেন যারা এটির সামর্থ্য রাখতেন এবং প্রায়শই এটি মওকুফ করতেন যখন এটি জাতির স্বার্থে কাজ করে। এই নম্রতা বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীদেরকে ইসলামী জাতিতে ভ্রমণে উৎসাহিত করেছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 468-472-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2076 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যারা আর্থিক বিষয়ে নম্র, যেমন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং যখন তারা তাদের জন্য মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেছেন। একটি ঋণ পরিশোধের দাবি.

মুসলমানদের জন্য আর্থিক বিষয়ে লোভী না হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোভ একজনকে হারামের দিকে ঠেলে দেয়। এমনকি তা না করলেও তা একজন মুসলমানকে রহমতের এই প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত করবে কারণ লোভ তাদের অন্যদের সাথে নম্র আচরণ করতে বাধা দেবে। সহজ কথায়, লোভ মানুষকে মহান

আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষের কাছ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে যায়। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে কখনই তাদের পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে অন্যের সুবিধা নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে, সাধারণ অসুবিধার সময়, যেমন একটি আর্থিক সংকট। সমস্ত আর্থিক বিষয়ে মুসলমানদের সমস্ত বিষয়গুলি জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে পরিষ্কার করা উচিত কারণ জিনিসগুলি লুকিয়ে রাখা, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, প্রতারণামূলক যা একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারিতে পাওয়া একটি হাদিস, 2079 নম্বর, সতর্ক করে যে যখন লোকেরা আর্থিক বিষয়ে অন্যদের সাথে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত মুছে ফেলা হয়। এটি তাদের সম্পদের সাথে সন্তুষ্টিকে সরিয়ে দেয় নির্বিশেষে তারা যতটা প্রাপ্ত এবং অধিকার করুক না কেন। এর ফলে একজন লোভী হয়ে ওঠে।

পরিশেষে, যখন অন্যরা আর্থিক সমস্যায় পড়ে তখন একজন মুসলমানকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থনের দিকে নিয়ে যায়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি ঋণের দোলা দেয়, তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোজিত আচরণ

তাঁর খিলাফতকালে, আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমাজের সকল সদস্যের সাথে সমানভাবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে সমান পরিমাণ সম্পদ বণ্টন করেছিলেন, তারা স্বাধীন হোক বা দাস। ইসলামের জন্য যারা সেবা ও ত্যাগ স্বীকার করেছে তাদেরকে কেন তিনি বেশি কিছু দেননি এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, তাদের পুরস্কার মহান আল্লাহর কাছে, কিন্তু জীবিকা নির্বাহ ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে মানুষ তাঁর দৃষ্টিতে সমান। . ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, আবু বক্কর আস সিদ্দিকের জীবনী, পৃষ্ঠা 259-260-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খলিফা হন, তখন তিনি সম্পদ বণ্টনের সময় কিছু শ্রেণীর লোককে অন্যদের উপরে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। আবু বক্করের খিলাফতের মতোই অভাবগ্রস্তদেরকে অন্য সকলের উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রবীণ ও প্রাথমিক সাহাবীগণকে এবং সৈন্যদের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা আরও বেশি প্রাপ্য কারণ তাদের ত্যাগের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। তারা ইসলাম এবং এর লক্ষ্য সম্পর্কে আরও বেশি উপলব্ধি করেছিল এবং এর আইনগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেনে চলেছিল এবং মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে তাদের সম্পদ ব্যয় করেছিল। অতএব, তাদের সম্পদ প্রদান শুধুমাত্র সমগ্র সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করেছে। বলা হচ্ছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতের শেষের দিকে তাঁর পদ্ধতি পর্যালোচনা করেছিলেন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পথে ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 488-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর পদ্ধতি পর্যালোচনা করা এবং এটি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া ইসলামের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়গুলিতে একটি অভিযোজিত আচরণ গ্রহণের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

কেউ কেউ পার্থিব বিষয়ে হঠকারিতা অবলম্বন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে না। পরিবর্তে, তারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে এই বিশ্বাস করে যে এটি তাদের মহান শক্তি এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ। বিশ্বাসের বিষয়ে অটল থাকা একটি প্রশংসনীয় মনোভাব কিন্তু অধিকাংশ পার্থিব বিষয়ে একে বলা হয় একগুঁয়েমি, যা দোষারোপযোগ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে যদি তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে তবে এটি দুর্বলতা প্রদর্শন করে বা এটি দেখায় যে তারা তাদের দোষ স্বীকার করছে এবং এই কারণে তারা জেদীভাবে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। প্রাপ্তবয়স্করা অপরিণত শিশুদের মতো আচরণ করে এই বিশ্বাস করে যে তারা যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে তবে এর অর্থ তারা হেরেছে এবং অন্যরা যারা তাদের মনোভাবের উপর অবিচল থাকে তারা জিতেছে। এটা নিছক শিশুসুলভ।

প্রকৃতপক্ষে, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকবে তবে পার্থিব বিষয়ে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, যতক্ষণ না এটি পাপ নয়, তাদের

জীবনকে সহজ করার জন্য। তাই নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য পরিবর্তন করা দুর্বলতার লক্ষণ নয় এটি আসলে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

অনেক ক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের জীবনে অন্যরা তাদের পরিবর্তন করতে চান, যেমন তাদের আত্মীয়রা। কিন্তু প্রায়শই যা ঘটে তা হ'ল একগুঁয়েমির কারণে সবাই একই অবস্থায় থাকে যা কেবল নিয়মিত মতবিরোধ এবং তর্কের দিকে নিয়ে যায়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে যদি তাদের চারপাশের লোকেরা তাদের উচিত তার চেয়ে ভাল পরিবর্তন না করে। এই পরিবর্তন তাদের জীবনের মান এবং অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবে যা মানুষের সাথে বৃত্তাকার তর্কে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো। এই ইতিবাচক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অন্যদের তাদের সম্মান করতে বাধ্য করবে কারণ ভালোর জন্য একজনের চরিত্র পরিবর্তন করতে প্রকৃত শক্তি লাগে।

যারা একগুঁয়ে থাকে তারা সবসময় বিরক্ত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পায় যা তাদের জীবন থেকে শান্তি সরিয়ে দেবে। এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যারা মানিয়ে নেয় এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করে তারা সবসময় শান্তির এক স্টেশন থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। যদি কেউ এই শান্তি অর্জন করে তবে অন্যরা বিশ্বাস করে যে তারা কেবল ভুল ছিল বলে তারা পরিবর্তন করেছে তা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ?

উপসংহারে বলা যায়, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর অবিচল থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু পার্থিব বিষয়ে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনো পাপ সংঘটিত হয় না একজন ব্যক্তির উচিত মানিয়ে নিতে

এবং তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে শেখা যাতে তারা এই পৃথিবীতে কিছুটা শান্তি পায়।

জাতির জন্য ভয়

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, সর্বদা তিনি যে সম্পদ পেয়েছিলেন তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে বন্টন করতেন, কিন্তু সর্বদা মুসলমানদের জন্য পার্থিব আশীর্বাদ উন্মুক্ত হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে ভয় করতেন। উদাহরণস্বরূপ, পারস্য জয়ের পর তার কাছে যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আনা হয়েছিল তা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। তার কান্না সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেছিলেন যে সম্পদ শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে শত্রুতা এবং ঘৃণার দিকে নিয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 488-489-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছিলেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্রকে ভয় করেন না। পরিবর্তে তিনি ভয় করেছিলেন যে পৃথিবী তাদের জন্য প্রাপ্ত করা সহজ এবং প্রচুর হয়ে উঠবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে কারণ এই একই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি শুধুমাত্র সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই সতর্কবার্তাটি মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং একজনের জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পেশার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ এই জিনিসগুলি অনুসরণ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য রাখে, যদিও সেগুলি হালাল হলেও, তাদের প্রয়োজনের বাইরে এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত

করবে। এটা তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে নিয়ে যাবে যেমন অপব্যয় ও অসংযত হওয়া এবং এমনকি এই জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য তাদের পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলি পেতে ব্যর্থ হলে অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার অন্যান্য কাজ হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে কারণ তারা এই জিনিসগুলি যেমন সম্পদ অর্জন করার জন্য বা ছুটিতে যাওয়ার জন্য আনন্দের সাথে মধ্যরাতে উঠবে কিন্তু স্বেচ্ছায় রাতের প্রস্তাব দেওয়ার পরামর্শ দিলে তা করতে ব্যর্থ হবে। নামাজ বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজে অংশ নেওয়া।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলি একজন ব্যক্তির প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি যখন এর বাইরে চলে যায় তখন তারা তাদের আখেরাতের ক্ষতির বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কারণ একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের কামনা-বাসনাকে অনুসরণ করবে ততই তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কম চেষ্টা করবে। আর তাই তাদের জন্য এই হাদীসে প্রদত্ত সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে।

বিচারকদের জন্য একটি পাঠ

যখন ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছিল, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর গভর্নর এবং বিচারকদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তারা সবসময় তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারে না। তাই তিনি তাদেরকে সর্বদা জনসাধারণের সাথে তাদের আচরণে ন্যায়বিচার ও নম্রতা প্রদর্শন করতে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সর্বদা বাস্তবায়ন করতে উত্সাহিত করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একবার তার একজন গভর্নর আবু মুসা আল আশআরী (রা.) কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তাকে যে মামলাগুলি উপস্থাপন করা হয়েছিল তা বোঝার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করার জন্য। তিনি তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের সাথে আচরণ করার সময় সকল লোকের সাথে সমান আচরণ করবেন যাতে কোনও মহীয়সী ব্যক্তি আশা না করে যে তিনি অন্যায়ভাবে তার পাশে থাকবেন এবং সামাজিকভাবে দুর্বল কোনও ব্যক্তি ন্যায়বিচারের জন্য হতাশ হবেন না। তিনি তাকে পরামর্শ দেন যে যতক্ষণ না এটি ইসলামের আইন লঙ্ঘন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরোধে আপস করতে উত্সাহিত করুন। তিনি তাকে বলেছিলেন যে তার মতামত পরিবর্তন করতে লজ্জিত হবেন না, এমনকি যদি একটি দিন চলেও যায়, কারণ সত্যের দিকে ফিরে আসা মিথ্যাতে অবিচল থাকার চেয়ে উত্তম। তার উচিত পবিত্র কুরআনের পাঠ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলা এবং তবেই স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগ করা, যা নির্দেশনার দুটি সূত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। সমস্ত রায় প্রমাণ এবং শপথ উপর ভিত্তি করে ছিল. তিনি তাকে অধৈর্য হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, কারণ সত্য অনুসারে বিচার করা একটি মহান পুরস্কার নিয়ে আসে। এবং তাকে সর্বদা একটি ভাল নিয়ত অবলম্বন করা উচিত যাতে তিনি মহান আল্লাহর সাহায্য পান। অথচ সে যদি মানুষের সাথে আচরণ করার সময় ভুল উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তাহলে মহান আল্লাহ তাকে অপদস্থ করবেন।

অন্য একটি চিঠিতে, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে, তিনি পূর্বে আলোচিত বিষয়গুলির অনুরূপ বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন এবং যোগ করেছেন যে তাঁর কাছে আসা সামাজিকভাবে দুর্বল ব্যক্তির সাথে তিনি নম্র আচরণ করবেন, যাতে তারা কথা বলার সাহস। তার অপরিচিত ব্যক্তির যত্ন নেওয়া উচিত, কারণ যদি তার মামলার তদন্তে দীর্ঘ সময় লাগে, তবে তিনি হাল ছেড়ে দিতে পারেন এবং বিচার না পেয়ে তার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারেন। তিনি তাকে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে বলেছিলেন, যদি না এটি ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে বা কে সঠিক এবং কে ভুল তা পরিষ্কার না হয়, কারণ পুনর্মিলন উভয় পক্ষকে খুশি করে চলে যায়, যেখানে একটি রায় একজনকে অপরের পক্ষে সমর্থন করে এবং তাই প্রায়শই নেতৃত্ব দেয়। ক্ষোভের প্রতি

ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 497-499-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য।[1] তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

ন্যায়পরায়ণ বিচারকগণ

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, শুধুমাত্র ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করতেন এবং তাঁর গভর্নরদেরকেও একই কাজ করার আদেশ দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 501-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ধার্মিকরা মহান আল্লাহকে ভয় করে, এবং এই ভয় তাদের মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার করার দায়িত্বে ব্যর্থ হতে বাধা দেয়।

ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া ন্যায়পরায়ণতা অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে

না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। অতএব, ধার্মিকতার একটি দিক হল সন্দেহজনক বিষয়গুলিকে এড়িয়ে যাওয়া যা কেবল বেআইনি নয়। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ত্রুটিগুলি হ্রাস করা।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, আদেশ দেন যে শুধুমাত্র তাঁর গভর্নররাই আইনি প্রতিশোধের সাথে জড়িত আইনি মামলার রায় দিতে পারেন। অর্থ, প্রতিটি এলাকার বিচারকদের মামলাটি তাদের গভর্নরের কাছে রায়ের জন্য পাঠাতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি আইনগত প্রতিশোধের সাথে জড়িত মামলাগুলিকে শুধুমাত্র নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন যা মৃত্যুদণ্ডের দিকে পরিচালিত করে। অর্থ, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি ছাড়া কোনো বিচারক বা গভর্নর মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদন দিতে পারেন না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 502-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, বিচারে সম্ভাব্য ত্রুটির সম্ভাবনাকে আরও কমানোর জন্য এটি করেছিলেন।

এই আলোচনাটি অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 178-179 এর সাথে সংযুক্ত:

"... আপনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে যারা হত্যা করা হয়েছে তাদের জন্য আইনানুগ প্রতিশোধ ... কিন্তু যে তার ভাই [অর্থাৎ, হত্যাকারী] কোন কিছুকে উপেক্ষা করে ... এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি উপশম এবং রহমত ... এবং আপনার জন্য আইনী প্রতিশোধ [জীবন সংরক্ষণ] রয়েছে হে বুদ্ধিমান লোকেরা, যাতে তোমরা ধার্মিক হতে পার।"

আইনি প্রতিশোধে জীবন রয়েছে কারণ অনেক খুনিকে মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম শাস্তি দিয়ে আরও হত্যা করা থেকে বিরত রাখা হয় না। এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে যেখানে একজন খুনি কয়েক বছর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার খুন করতে পেরেছে। তাই একজনের মৃত্যুদন্ড অন্যের জীবন বাঁচানোর দিকে নিয়ে যায়।

এছাড়াও, এই আইনী প্রতিশোধ শিকারের আত্মীয়দের মানসিক অবস্থাকেও সাহায্য করতে পারে কারণ হত্যাকারী তাদের জীবন দিয়ে এই অপরাধের জন্য অর্থ প্রদান করেছে তা জানা ভিকটিমের আত্মীয়দের তাদের জীবন নিয়ে চলতে সাহায্য করার একটি উপায়। কিন্তু যখন হত্যাকারীকে শুধুমাত্র কারাগারে রাখা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অবশেষে মুক্তি দেওয়া হয় তখন হত্যার কথা মনে রাখার কষ্ট ভিকটিমের স্বজনদের চলাফেরা করতে এবং শান্তিতে বসবাস করতে বাধা দিতে পারে। এই মানসিক নির্যাতন ঠেকিয়ে জীবন দিচ্ছে তাদের। একইভাবে, সরকার যখন কোনো অপরাধীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় তখন ভিকটিমদের স্বজনরা প্রায়ই মনে করেন যে বিচার হয়নি। এই কারণেই ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে ভিকটিমের আত্মীয়দেরকে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ক্ষমা করার সুযোগ দেওয়া হয়। যখন সিদ্ধান্তটি ভিকটিমের আত্মীয়দের সাথে রাখা হয় তখন এটি মানসিক চাপের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় যা সরকার যদি ফলাফলের সিদ্ধান্ত নেয়। এটি আবার ভুক্তভোগীর স্বজনদের বিরক্তিতে ভরা জীবন যাপন করার পরিবর্তে তাদের জীবন নিয়ে চলতে দেয়, যা বাস্তবে মোটেও বেঁচে থাকে না।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মাধ্যমে আইনগত প্রতিশোধও প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করে জীবন বাঁচায় যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিস্তৃত হতে পারে। সুতরাং একজন হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড অনেক হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করে।

মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে আইনি প্রতিশোধও সাধারণ জনগণের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে, যা এই আয়াতের চূড়ান্ত অংশ দ্বারা নির্দেশিত। যখন তারা হত্যাকারীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর হতে দেখবে, তখন যারা কাউকে হত্যা করতে চায় তাদের নিজেদের জীবন হারানোর ভয়ে তাদের হাত আটকে রাখতে এবং নিজের এবং অন্যদের জীবন দিতে বাধা দেবে। এটি সব ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। যদি ধর্ষণের মতো অপরাধের শাস্তি আরো গুরুতর হয় তাহলে তা অনেক সম্ভাব্য অপরাধীকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখত। বেশিরভাগ দেশে অপরাধের হার না কমার একটি প্রধান কারণ নরম আইন থাকা।

আইনগত প্রতিশোধের একটি দিক হচ্ছে হত্যাকারীকে ক্ষমা করা। দয়ার এই কাজটি হত্যাকারীকে তাদের অপরাধের জীবন থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উত্সাহিত করতে পারে। উপরন্তু, এটি অন্যান্য সম্ভাব্য শিকার এবং তাদের আত্মীয়দের তাদের নিপীড়কদের ক্ষমা করতে উত্সাহিত করতে পারে, যা সমাজে শান্তি ও করুণা ছড়িয়ে দেয়।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলি সবই সত্য যখন আইনি ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুসরণ করা হয় এবং সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। কাউকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রকৃত এবং শক্তিশালী প্রমাণের প্রয়োজন, যা অবশ্যই সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্ধ্বে। উপরন্তু, এই দিন এবং যুগে এটি পাওয়া সহজ যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ, ডিএনএ পরীক্ষা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে যা সঠিকভাবে অপরাধীদের উচ্চ মাত্রায় নিশ্চিতভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। এই সবই একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার সুযোগ কমিয়ে দেয়। এমনকি যদি অ-ইসলামী দেশগুলি শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে আইনি প্রতিশোধ প্রয়োগ করে তবে তা

অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। এসব ক্ষেত্রে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ভয়ে মৃত্যুদণ্ড এড়ানোর অজুহাত প্রযোজ্য নয় কারণ সঠিক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু আলোচনার মূল আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যারা তাদের চিন্তাভাবনাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করবে তারাই এটি বুঝতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, যার বোধগম্যতার অভাব রয়েছে সে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে অস্বীকার করবে কারণ তারা এই বিবৃতিটির শুধুমাত্র একটি দিকে মনোনিবেশ করে, যার অর্থ, শরীরের অঙ্গ কেটে ফেলা। তারা বৃহত্তর চিত্রের অর্থ প্রতিফলিত করে না, তাদের জীবন বাঁচায়, এবং ফলস্বরূপ তারা শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলতে অস্বীকার করে। যদিও, যিনি স্পষ্টভাবে মনে করেন তিনি একমত হবেন যে শরীরের অঙ্গ কেটে ফেলা খুবই গুরুতর কিন্তু এটি ছেড়ে যাওয়া আরও খারাপ কিছুর দিকে নিয়ে যাবে, মৃত্যু। তাই তারা বৃহত্তর চিত্রটি প্রতিফলিত করে এবং শরীরের একটি অঙ্গ কেটে ফেলার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। এটি আলোচনার অধীন আয়াতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। হত্যার জন্য সমাজের একজন সদস্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কঠোর শোনায় তবে এটি যদি ভিকটিমের স্বজনসহ বাকি সমাজের জন্য অনেক সুবিধার দিকে পরিচালিত করে তবে এটি অর্থবহ কারণ একটি সরকারকে অবশ্যই বৃহত্তর চিত্রের অর্থ বিবেচনা করতে হবে, সমগ্র সমাজের মঙ্গল জীবনের উপর। একজন দোষী সাব্যস্ত খুনি বা খুব বিরল ক্ষেত্রে একজন ভুলভাবে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির একক জীবন।

পার্থিব জিনিস থেকে বিচ্ছিন্নতা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন গভর্নর ও বিচারক নিয়োগ করতেন, তখন তিনি এমন লোকদের সন্ধান করতেন যারা পার্থিব জিনিসপত্র অর্জন ও মজুত করতে আগ্রহী ছিল না। তিনি একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার চেষ্টা করে না, প্রদর্শনী করে না এবং তার কোনো বস্তুবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই সে ব্যতীত কেউই মহান আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 503-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যের জিনিসপত্র থেকে বিচ্ছিন্ন কাউকে নিয়োগ করাও তখন অর্জিত হয়েছিল যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে একজন সচ্ছল ব্যক্তিকে বিচারক করা হবে। একজন সচ্ছল ব্যক্তির অন্যের সম্পদের প্রয়োজন নেই এবং তাই ধনী ব্যক্তিদের সাথে জড়িত বিচার করার সময় প্রভাবিত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 505-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4102 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিভাবে আল্লাহর ভালবাসা, মহান আল্লাহর ভালবাসা এবং মানুষের ভালবাসা পেতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর ভালবাসা তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি পরিহার করে যা তাদের প্রয়োজনের বাইরে। অর্থ, একজন

মুসলমানের উচিত এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করা । এবং তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা, তাঁর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। জড় জগতের কোন কিছু যা এই জিনিসগুলিতে সাহায্য করে তা বাস্তবে জাগতিক জিনিস নয়। অতএব, তাদের এড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে এমন জিনিসগুলিকে এড়িয়ে চলতে হবে যা এই দায়িত্ব পালনে বাধা দেয় বা বাধা দেয়। এভাবেই একজন মুসলিম বিশ্বকে তাদের হৃদয়ে নয় তাদের হাতে রাখতে পারে। এভাবেই একজন মুসলিম মহান আল্লাহর ভালবাসা লাভ করে, কারণ এই মনোভাব তাদের আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা মহান আল্লাহর ভালবাসাকে আকর্ষণ করে। এটি সহীহ বুখারী, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমান তাদের পার্থিব সম্পদকে এড়িয়ে ও কামনা করে মানুষের ভালোবাসা পেতে পারে। বাস্তবে, একজন ব্যক্তি তখনই অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ করে যখন তারা অনুভব করে যে অন্যরা সক্রিয়ভাবে তাদের সম্পত্তি কামনা করে বা যখন অন্যরা সক্রিয়ভাবে পার্থিব জিনিসগুলির জন্য প্রতিযোগিতা করে যা তারা নিজেরাই চায়। অর্থ, নিজের যা আছে তা হারানোর ভয় এবং অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার ইচ্ছা যা অন্যদের প্রতি নেতিবাচক অনুভূতির জন্ম দিতে পারে তা হারানোর ভয়। যদি একজন মুসলিম এই হাদীসের প্রথম অংশের উপর আমল করার পরিবর্তে নিজেকে দখল করে তবে এটি তাদের অতিরিক্ত পার্থিব জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখবে যা অন্যরা চায় কারণ এই আকাঙ্ক্ষাগুলির বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের জন্য। আর যদি কোনো মুসলমান অন্যের নিজের ও সম্পদ থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে, যা সুনানে আন নাসাই-এর ৪৯৯৮ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, যা প্রকৃত মুমিনের নিদর্শন, তাহলে তারা মানুষের ভালোবাসাও লাভ করবে।

অজ্ঞতা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন গভর্নর ও বিচারক নিয়োগ করতেন, তখন তিনি সামাজিক পটভূমি নির্বিশেষে ইসলামী জ্ঞানে দৃঢ় লোকদের সন্ধান করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 503-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একটি মহান বিভ্রান্তি যা মানুষকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেয় তা হল অজ্ঞতা। এটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে এটি প্রতিটি পাপের উৎপত্তি কারণ যে ব্যক্তি সত্যই পাপের পরিণতি জানে সে কখনই সেগুলি করবে না। এটি সত্যিকারের উপকারী জ্ঞানকে বোঝায় যা এমন জ্ঞান যার উপর কাজ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জ্ঞান যার উপর আমল করা হয় না তা উপকারী জ্ঞান নয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ করে তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে এমন একটি গাধা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা জ্ঞানের বই বহন করে যা কোন উপকারে আসে না। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করা হয়নি (জ্ঞানের উপর আমল করেনি) সে গাধার মত যে [বইয়ের] পরিমাণ বহন করে..."

যে ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে সে খুব কমই পিছলে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি ঘটে তখন এটি শুধুমাত্র অজ্ঞতার একটি মুহূর্ত দ্বারা সৃষ্ট হয় যেখানে একজন ব্যক্তি তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ভুলে যায় যার ফলে তারা পাপ করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামে আত তিরমিযী, 2322 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে জাহেলিয়াতের গুরুতরতা তুলে ধরেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মহান আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত জড় জগতের সবকিছুই অভিশপ্ত, এই স্মরণের সাথে যা কিছু যুক্ত, সেই পণ্ডিত এবং জ্ঞানের ছাত্র। এর অর্থ এই যে, জড় জগতের সমস্ত নিয়ামত অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ হয়ে উঠবে কারণ তারা তাদের অপব্যবহার করে পাপ করবে।

প্রকৃতপক্ষে, অজ্ঞতা একজন ব্যক্তির সবচেয়ে খারাপ শত্রু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ এটি তাদের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং উপকার লাভ করতে বাধা দেয় যা শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর কাজ করার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। অজ্ঞরা না জেনেই পাপ করে। কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করা হয় তা না জানলে কিভাবে পাপ এড়ানো যায়? অজ্ঞতার কারণে একজন ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্বে অবহেলা করে। কেউ যদি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তবে কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা যায়?

তাই সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য হল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা যাতে তাদের সকল ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় এবং পাপ পরিহার করা যায়। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উচ্চতর বেশী

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এমন দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী গভর্নর ও বিচারক নিয়োগ করতেন যে, জালেম তাদের দিকে তাকালেই ভয় পেয়ে যেত। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 504-505-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এর মধ্যে সেই ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে যাতে এটি তাদের চেহারার অর্থ, তাদের কথা এবং কাজে প্রদর্শিত হয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম মানুষ তারা যারা অন্যদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন তারা পালন করা হয়।

এটি তাদের উল্লেখ করে না যারা ইসলামিক বাহ্যিক চেহারা গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরিধান করে, কারণ এই লোকেদের অনেকেই অন্যদেরকে আল্লাহ, মহান,কে মোটেও স্মরণ করিয়ে দেন না। এই হাদিসটি তাদের বোঝায় যারা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। তার উপর। এটি একজনের হৃদয়ের পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে যা তাদের বাহ্যিক অঙ্গগুলির পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 3984

নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অন্যরা যখন এই ধার্মিক মুসলমানদের পর্যবেক্ষণ করবে তখন তারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করবে। আর এই স্মরণ তখনই বাড়বে যখন এই ধার্মিক মুসলমানরা কথা বলে যেমন তারা কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কথা বলে, অর্থাত্, তারা মন্দ ও অনর্থক কথা পরিহার করে এবং শুধুমাত্র দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী বিষয়ে কথা বলে। এই স্মরণ আরও বৃদ্ধি পায় যখন কেউ তাদের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করে যখন তারা কার্যত ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, অপছন্দ করে, দান করে এবং বন্ধ করে দেয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার দিকে নিয়ে যায়।

পরামর্শের গুরুত্ব

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর গভর্নর ও বিচারকদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, জনগণের বিষয়ে অন্যদের সাথে পরামর্শ করতে। তিনি তাদেরকে পরামর্শ দিতেন যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে তাদের সাথে পরামর্শ করতে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 506-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"...সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

সমান চিকিৎসা

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, প্রত্যেকের সাথে তাদের সামাজিক পটভূমি নির্বিশেষে সমান আচরণ করা নিশ্চিত করবেন, এমনকি যদি মামলাটি নিজেই জড়িত থাকে। একবার অন্য একজন সাহাবী উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তাঁর বিবাদ হয়েছিল। তারা তাদের বিরোধ জায়েদ ইবনে সাবিতের কাছে নিয়ে গেল, যিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বসার জন্য একটি বালিশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর নামের পরিবর্তে তাঁকে তাঁর উপাধি দিয়ে সম্বোধন করেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে তিনি তার সাথে এমন আচরণ করতেন যেভাবে তিনি অন্য সকলের সাথে আচরণ করেছিলেন যারা তার কাছে রায়ের জন্য এসেছিল। উমর তখন উবাইয়ের পাশে মেঝেতে বসলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 506-507-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ

করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বিচারকদের সতর্ক করেছিলেন যে তারা যখন আবেগপ্রবণ হয়, যেমন: একঘেয়েমি, ক্রোধ, উদ্বেগ ইত্যাদি, তখন তাদের রায় তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 507-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি তখনই যখন কেউ তাদের আবেগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে যে তারা নিজেকে চরম মানসিক অবস্থা অনুভব করতে দেয় না কারণ এটি প্রায়শই চাপ এবং মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে। পবিত্র কুরআনের 57 অধ্যায়ে আল হাদিদ, আয়াত 23 এ ইঙ্গিত করা হয়েছে:

" যাতে আপনি নিরাশ না হন তার জন্য এবং তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন তার জন্য গর্বিত না হন..."

ইসলাম কাউকে আবেগ দেখাতে নিষেধ করে না কারণ এটি মানুষের একটি অংশ। কিন্তু এটি মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার পরামর্শ দেয় যেখানে কেউ এক চরম আবেগ থেকে অন্য আবেগে না যায়। কঠিন পরিস্থিতিতে দু: খিত হওয়া গ্রহণযোগ্য তবে একজনকে হতাশ হওয়া উচিত নয়, যা চরম দুঃখ, কারণ

এটি প্রায়শই বিষণ্নতার মতো অন্যান্য মানসিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে। এবং সুখী হওয়া গ্রহণযোগ্য তবে একজনকে অতিরিক্ত সুখী হওয়া উচিত নয়, উল্লাস করা, কারণ এটি প্রায়শই উভয় জগতে পাপ এবং অনুশোচনার কারণ হতে পারে। একজন মুসলমানের উচিত কঠিন সময়ে তাদের কাছে থাকা অগণিত আশীর্বাদগুলিকে স্মরণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা অর্জনের চেষ্টা করা যা চরম দুঃখকে বাধা দেয়, যেমন হতাশা। এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাদের মনে রাখা উচিত যে তাদের খুশি করার জন্য তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং যদি তারা এটির অপব্যবহার করে বা এর সাথে যুক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তবে তারা এর জন্য শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে। এটি একজনকে অত্যধিক সুখী হতে বাধা দেবে, যেমন উল্লাসিত।

মনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা সর্বদা সর্বোত্তম যা চরম মেজাজের নেতিবাচক প্রভাবকে প্রতিরোধ করে। এটি একজন মুসলিমকে প্রকৃত মানসিক শান্তি এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

রাগ এড়িয়ে চলা

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর বিচারকদের সতর্ক করেছিলেন যে তারা রাগান্বিত হলে রায় দেবেন না, কারণ এটি তাদের রায়কে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 508-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। আসলে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ উপকারী হতে পারে উদাহরণস্বরূপ, আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে। এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল একজন ব্যক্তির উচিত তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে এটি তাকে পাপের দিকে নিয়ে না যায়। উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

প্রথমত, এই উপদেশ এমন সব ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজনকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য। এই হাদিসটিও ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তি তার রাগ অনুযায়ী কাজ করবে না। পরিবর্তে, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের নিজেদের সাথে লড়াই করা উচিত যাতে এটি

তাদের পাপের দিকে নিয়ে না যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 134:

"...যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

ইসলামের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, রাগ শয়তানের সাথে যুক্ত এবং অনুপ্রাণিত হওয়ায় সহীহ বুখারি, 3282 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন ক্ষুব্ধ মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সেজদা করবে। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি একজন নিষ্ক্রিয় শরীরের অবস্থান নেয় ততই তাদের রাগ করার সম্ভাবনা কম। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উপদেশের উপর কাজ করা একজনকে তাদের রাগকে নিজের মধ্যে বন্দী করার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না এটি চলে যায় যাতে এটি অন্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না করে।

একজন মুসলমান যে রাগান্বিত হয় তার উচিত সুনানে আবু দাউদ, 4784 নম্বরে পাওয়া হাদিসে দেওয়া উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

রাগান্বিত মুসলমানকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হল জল ক্রোধের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে কাউন্টার করে, তাপ। যদি কেউ তখন প্রার্থনা করে তবে এটি তাদের রাগকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি মহান পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে।

এ পর্যন্ত আলোচনা করা পরামর্শ একজন রাগান্বিত মুসলমানকে তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কারো কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাগ হলে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শব্দগুলি প্রায়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অন্যদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। রাগের মাথায় বলা কথার কারণে অগণিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে। এই আচরণ প্রায়ই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলমানের জন্য সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান গুণ এবং যে ব্যক্তি এটি আয়ত্ত করে তাকে সহীহ বুখারি, 6114 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্রোধ, অর্থ, তারা তাদের ক্রোধের কারণে কোন পাপ করে না, তাদের অন্তর শান্তি ও সত্য বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4778 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র হৃদপিণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একমাত্র হৃদয় যা কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88 এবং 89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আগেই বলা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ উপকারী হতে পারে। এটি নিজের নফস, বিশ্বাস এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত যা সঠিকভাবে করা হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ হিসাবে গণ্য হয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা, যিনি কখনো নিজের কামনা-বাসনার জন্য রাগান্বিত হননি। তিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন, যা সহীহ মুসলিম, 6050 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহীহ মুসলিম, 1739 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তা নিয়ে খুশি হবেন এবং যা রাগান্বিত হবে তাতে রাগান্বিত হবেন।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু এই রাগ যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা দোষারোপযোগ্য হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হলেও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুনান আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 4901 নম্বর, এমন একজন উপাসককে সতর্ক করে যে ক্রোধের সাথে দাবি করে যে আল্লাহ, মহান, একটি নির্দিষ্ট পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। ফলস্বরূপ এই উপাসককে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং বিচারের দিনে পাপীকে ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উত্স চারটি জিনিস নিয়ে গঠিত: নিজের ইচ্ছা, ভয়, খারাপ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদীসের উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের চরিত্র ও জীবন থেকে এক চতুর্থাংশ মন্দতা দূর করবে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, তাই এটি তাদের এমনভাবে কাজ বা কথা বলে না যা তাদের এই দুনিয়া এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়।

ঘুষ এড়ানো

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর গভর্নর এবং বিচারকদের ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নিতে বা কারও কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ এটি তাদের বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে, তাই ঘুষের একটি রূপ হয়ে উঠেছে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 508-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1337 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে ঘুষ প্রদানকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ই অভিশপ্ত।

একটি অভিশাপ মহান আল্লাহর রহমত অপসারণ জড়িত. যখন এটি ঘটে তখন পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত স্থায়ী সফলতা সম্ভব নয়। ঘুষের মাধ্যমে সম্পদের মতো যা কিছু পার্থিব সাফল্য অর্জন করা হোক না কেন, যদি কেউ আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয় তবে তা উভয় জগতেই বড় কষ্ট ও শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর রহমত ব্যতীত, ঈমানের তিনটি দিক সঠিকভাবে পরিপূর্ণ করা সম্ভব নয়, যথা, মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া।

দুর্ভাগ্যবশত, এই দিন এবং যুগে ঘুষের বড় পাপ বিশ্বের সমস্ত অংশে খুব সাধারণ হয়ে উঠেছে। পার্থক্য শুধু এই যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এটি প্রকাশ্যে এবং আরও উন্নত দেশে গোপনে করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ঘুষের সাথে জড়িত থাকে একজন ব্যক্তি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের, যেমন একজন বিচারককে উপহার দেওয়ার জন্য, যা তাদের নয় এমন কিছু লাভ করার জন্য। শুধুমাত্র একটি ঘুষ একটি পাপ হিসাবে রেকর্ড করা হবে না যখন কেউ তাদের নিজস্ব সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয়. এক্ষেত্রে অভিশাপ যে ঘুষ খায় তার উপর।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, মুসলিমরা যদি ঘুষ এবং অন্যান্য দুর্নীতির প্রথা দূর করতে চায় তাহলে তাদের নিজেদেরই এড়িয়ে চলতে হবে। শুধুমাত্র যখন এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত হয় তখনই তা প্রভাবশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের প্রভাবিত করবে। এই লোকেদের এইভাবে আচরণ করার কারণ হল তারা সমাজকে সম্পূর্ণরূপে দেখেন যে তারা নিজেরাই দুর্নীতির চর্চা করে। কিন্তু যদি একটি ব্যক্তি পর্যায়ে সমাজ এই অনুশীলনগুলি প্রত্যাখ্যান করে তবে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাবের অবস্থানে থাকা কোনও ব্যক্তি এইভাবে কাজ করার সাহস করবে না কারণ তারা জানে যে লোকেরা এর পক্ষে দাঁড়াবে না।

ভালো চিকিৎসা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী হিসেবে গণ্য করা যাবে না যতক্ষণ না তা প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 511-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ অন্যদের প্রতি সঠিক মনোভাব অবলম্বন করতে পারে যখন তারা অন্যদের সাথে এমন আচরণ করে যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান তাদের বিশ্বাস হারাবে যদি তারা এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো।

শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলমান তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তার অন্তর হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভাল কামনা করা তাদের ভাল জিনিসগুলিকে হারিয়ে ফেলবে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলমান মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী উপদেশ দেয়, তখন তাদের উচিত এমনভাবে করা উচিত যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"... সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই উত্সাহ একজন মুসলমানকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেকে মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রতিবেশী

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিবেশীদের অধিকার পূর্ণ করা নিশ্চিত করেছিলেন। এক ব্যক্তি একবার তার কাছে অভিযোগ করেছিল যে তার প্রতিবেশী তাকে তাদের সম্পত্তির মধ্য দিয়ে একটি স্রোত খনন করতে বাধা দিচ্ছে অথচ তারা উভয়েই এতে লাভবান হবে এবং এতে তার প্রতিবেশীর কোন ক্ষতি হবে না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিবেশীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে রাজি হতে উৎসাহিত করলেন। তিনি যখন প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেনে নিতে বাধ্য করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, সহীহ মুসলিম, 4130 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি বাস্তবায়ন করছিলেন যে, একজন মুসলমান তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে একটি বিম ঠিক করতে বাধা দেবেন না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 534-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

একজনের অধিকারের অপব্যবহারের আধুনিক দিনের দর্শন হল উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিবেশীকে যা করতে বাধা দিয়েছিলেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সহীহ বুখারি, 6014 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি প্রতিবেশীদের সাথে এমনভাবে সদয় আচরণ করতে উত্সাহিত করেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে একজন প্রতিবেশী উত্তরাধিকারী হবে। প্রত্যেক মুসলমান।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও এই দায়িত্বটি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। প্রথমত, এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামে একজন ব্যক্তির প্রতিবেশী সেই সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে যারা একজন মুসলমানের বাড়ির প্রতিটি দিকে চল্লিশটি ঘরের মধ্যে বসবাস করে। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 109 নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১৭৪ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহিমান্বিত এবং বিচার দিবসে প্রতিবেশীর সাথে সদয় আচরণের সাথে যুক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র এই হাদিসটিই এর গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য যথেষ্ট। প্রতিবেশীদের সাথে সদয় আচরণ করা। ইমাম বুখারীর, আদাব আল মুফরাদ, 119 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন মহিলা যে তার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেছে এবং অনেক স্বেচ্ছায় ইবাদত করেছে সে জাহান্নামে যাবে কারণ সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। যদি কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীর ক্ষতি করে, তাহলে তার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষতি কতটা গুরুতর তা কল্পনা করা যায়?

প্রতিবেশীর দ্বারা দুর্ব্যবহারের সময় একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের সাথে সদয় আচরণ করা উচিত। ভালো দিয়ে ভালো শোধ করা কঠিন নয়। ভালো প্রতিবেশী সেই যে ক্ষতির প্রতিদান ভালো দিয়ে দেয়। একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রতিবেশীর সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্থানকে সম্মান করা তবে একই সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানানো এবং খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দেওয়া। আর্থিক বা মানসিক সমর্থনের মতো একজন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ যে কোনো উপায়ে তাদের সমর্থন করা উচিত।

একজন মুসলমানের উচিত সবসময় প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করেন। আর যে ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবেন এবং প্রকাশ্যে তাদের অপমানিত করবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4880 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যেখানে মহানতা মিথ্যা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির মর্যাদা তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে এবং অন্য কিছু নয়। একবার, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র তীর্থযাত্রার সময় তাঁর মক্কার গভর্নরের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে মক্কার দায়িত্ব কাকে রেখেছিলেন তা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। গভর্নর একজন মুক্তকৃত ক্রীতদাসের কথা উল্লেখ করেন এবং যোগ করেন যে তিনি পবিত্র কুরআনের জ্ঞান এবং উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন উত্তর দিলেন যে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে কারো মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং অন্যদের নিম্ন করেন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 218 নম্বর একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

মহানতা এবং সত্যিকারের সাফল্য পার্থিব জিনিসের সাথে যুক্ত নয়, যেমন সম্পদ বা খ্যাতি। একজন ব্যক্তি এসবের মাধ্যমে কিছু পার্থিব সাফল্য লাভ করতে পারে কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা খুবই স্পষ্ট যে এই ধরনের সাফল্য খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং তা শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তির জন্য বোঝা ও অনুশোচনায় পরিণত হয়। একজন মুসলমানের কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে এই জিনিসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত থাকে যার ফলে আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টির প্রতি তাদের কর্তব্য অবহেলা করে সেগুলি পাওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। বা তাদের অন্যদেরকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় যারা এই জাগতিক জিনিসের অধিকারী নয় এই বিশ্বাস করে যে তাদের কোন মূল্য বা তাৎপর্য নেই কারণ এই মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ বুখারী, 6071 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, জান্নাতী তারাই যারা সমাজের কাছে নগণ্য বলে বিবেচিত হয় এবং এই উপসংহারে পৌঁছে যে তারা যদি শপথ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ তাদের জন্য তা পূরণ করবেন।

ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত সম্মান, সাফল্য ও মহানুভবতা একমাত্র তাকওয়ার মধ্যেই নিহিত। তাই মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে যত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়, তারা আবির্ভূত হলেও তত বেশি হয়। সমাজের কাছে নগণ্য। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত এতে সত্যিকারের সফলতা অন্বেষণ করা এবং পার্থিব জিনিসের সন্ধানে তাদের সময় ও প্রচেষ্টা নষ্ট না করা, অন্যথায় তারা আখেরাতে বড় ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 103-104:

"বলুন, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের [তাদের] কর্মের ব্যাপারে অবহিত করব? [তারা] তারাই যাদের পার্থিব জীবনে পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়, অথচ তারা মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে।"

কাঙ্খিত নেতৃত্ব

গভর্নর নির্বাচন করার সময়, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পূর্বসূরিদের নির্দেশনা অনুসরণ করেছিলেন এবং শুধুমাত্র যোগ্য এবং বিশ্বস্ত লোকদের নিয়োগ করেছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে কোনো দলের ওপর নিযুক্ত করে যখন সেখানে অন্য কোনো ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় এবং এর যোগ্য থাকে, তাহলে তারা মহান আল্লাহ তায়ালা, তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এবং বিশ্বাসীদের। অন্য একটি অনুষ্ঠানে, তিনি বন্ধুত্ব বা রক্তের বন্ধনের মতো পার্থিব সম্পর্কের ভিত্তিতে অন্যদের নিয়োগ করার বিরুদ্ধে লোকদের সতর্ক করেছিলেন। এই কারণেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিজের আত্মীয়দের গভর্নর বা বিচারক হিসেবে নিয়োগ করা থেকে বিরত ছিলেন, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই এর যোগ্য ছিলেন, যেমন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বিন উমর রা. . উপরন্তু তিনি নেতৃত্বের জন্য যাকে জিজ্ঞাসা করেন তাকে কখনও নিয়োগ করেননি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 45-46 এবং 49-50-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সম্পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক যাকে মুক্ত করা হয়েছে। ভেড়ার পাল

এটা দেখায় যে, কোন মুসলমানের বিশ্বাস নিরাপদ থাকে না যদি তারা এই পৃথিবীতে সম্পদ ও খ্যাতির জন্য আকাঙ্খা করে, ঠিক যেমন খুব কমই কোনো ভেড়া দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে থেকে রক্ষা পাবে। সুতরাং এই মহান উপমায়

পৃথিবীতে অতিরিক্ত সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য লালসার কুফলের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

খ্যাতি এবং মর্যাদার জন্য একজন ব্যক্তির লোভ যুক্তিযুক্তভাবে অতিরিক্ত সম্পদের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে তার বিশ্বাসের জন্য আরও ধ্বংসাত্মক। একজন ব্যক্তি প্রায়শই খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ ব্যয় করবে।

এটা বিরল যে কেউ মর্যাদা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং এখনও সঠিক পথে অটল থাকে যাতে তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতপক্ষে, সহিহ বুখারি, 6723 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি যে সমাজে নেতৃত্বের মতো মর্যাদা কামনা করে, তাকে নিজেরাই এটি মোকাবেলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু কেউ যদি এটি না চেয়ে এটি গ্রহণ করে তবে তাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন। , মহিমান্বিত, তাঁর প্রতি আনুগত্য থাকাতে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতেন না যিনি কর্তৃত্বের পদে নিয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন বা এমনকি এর জন্য ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। সহীহ বুখারী, ৬৯২৩ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সহীহ বুখারি, ৭১৪৮ নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষ মর্যাদা ও কর্তৃত্ব লাভের জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু শেষ বিচারের দিন এটি তাদের জন্য বড় আফসোস হবে। এটি একটি বিপজ্জনক তৃষ্ণা কারণ এটি একজনকে এটি পাওয়ার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং তারপরে এটিকে ধরে রাখার জন্য আরও প্রচেষ্টা চালায় যদিও এটি তাকে নিপীড়ন এবং অন্যান্য পাপ করতে উত্সাহিত করে।

মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষার সবচেয়ে খারাপ ধরন হল যখন কেউ এটি ধর্মের মাধ্যমে অর্জন করে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৫৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

অতএব, একজন মুসলমানের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদার লোভ এড়ানো নিরাপদ কারণ এ দুটি জিনিস যা তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করে তাদের ঈমানের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

জীবন একটি আয়না

নেতা ও গভর্নর হিসাবে লোকদের নিয়োগ করার সময়, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, নিশ্চিত করেছিলেন যে তারা নম্র এবং কোমল প্রকৃতির ছিল। তিনি তার সমস্ত নেতাদের তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর আহ্বান জানান। এক সময়ে, তিনি একজন ব্যক্তিকে নেতৃত্বে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। যখন এই ব্যক্তি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রবেশ করলেন, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হলেন, যখন দ্বিতীয়টি তাঁর সন্তানকে চুম্বন করছিলেন, তিনি মন্তব্য করলেন যে তিনি কখনও তাঁর সন্তানদেরকে চুম্বন করেননি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর এই বলে তাঁর সমালোচনা করেছিলেন যে তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি দয়া দেখাবেন না এবং তাই তাঁকে নেতৃত্বের ভূমিকায় নিযুক্ত করেননি।

তিনি একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে কোন সহনশীলতাই মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং নেতার সহনশীলতা ও দয়ার চেয়ে বেশি সুদূরপ্রসারী নয়। এবং মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন নেতার অজ্ঞতার চেয়ে বেশি ঘৃণা এবং সুদূরপ্রসারী আর কিছুই নেই। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 48-49-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন না যে অন্যের প্রতি দয়া করে না।

ইসলাম একটি অতি সরল ধর্ম। এর একটি মৌলিক শিক্ষা এতই সহজ যে, এমনকি অশিক্ষিত লোকেরাও সেগুলি বুঝতে এবং তার উপর আমল করতে পারে, অর্থাৎ মানুষ অন্যদের সাথে কেমন আচরণ করবে তা হল মহান আল্লাহ তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ, যারা অন্যের ভুল উপেক্ষা করতে এবং ক্ষমা করতে শেখে, মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

যারা অন্যদেরকে উপকারী পার্থিব এবং ধর্মীয় বিষয়ে যেমন মানসিক বা আর্থিক সাহায্যে সমর্থন করে, তারা উভয় জগতেই মহান আল্লাহ সমর্থন করবেন। সুনান আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি অন্যের দোষ গোপন করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের দোষ গোপন করবেন।

সোজা কথায়, কেউ যদি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে অন্যদের সাথে সদয় ও সম্মানের সাথে আচরণ করে তবে মহান আল্লাহ তাদের সাথে একই আচরণ করবেন। এবং যারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাদের সাথে মহান আল্লাহ অনুরূপ আচরণ করবেন, এমনকি যদি তারা ফরয নামাযের মতো বাধ্যতামূলক

দায়িত্ব পালন করে। এর কারণ হল একজন মুসলমানকে সফলতা অর্জনের জন্য উভয় দায়িত্বই পালন করতে হবে যথা, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য।

পরিশেষে, এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজন মুসলমানের সাথে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা সদয় আচরণ করবেন, যদি তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করেন। যদি তারা অন্য কোন কারণে তা করে তবে তারা নিঃসন্দেহে এই শিক্ষাগুলিতে বর্ণিত সওয়াব হারাবে। সকল কর্মের ভিত্তি এবং ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দায়িত্ব

একজন ব্যক্তিকে নেতৃত্বের ভূমিকায় অর্পণ করার আগে, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের নেট মূল্য রেকর্ড করতেন এবং তাদের চাকরির চুক্তি শেষ হওয়ার পরে এটি পর্যালোচনা করতেন। যদি তিনি তাদের বরাদ্দকৃত আয়ের সাথে মেলে না তাদের মোট সম্পদের বৃদ্ধি দেখতে পান, তবে তিনি তাদের কাছ থেকে লাভ নেবেন এবং সম্পদ সরকারি কোষাগারে জমা দেবেন। তিনি তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তাদের নেতৃত্বের ভূমিকা তাদের পক্ষে পক্ষপাতের কারণ হতে পারে, যা ঘুষ হিসাবে দেখা যেতে পারে। তিনি তাদের কোনো উপহার গ্রহণ করতেও নিষেধ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 50-51-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতোই নিজেদেরকে জবাবদিহি করতে হবে, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, ক্রমাগত নিজেকে এবং তাঁর কর্মচারীদের জবাবদিহি করতেন।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা

আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

চাকরির শর্তাবলী

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কাউকে নেতৃত্বের ভূমিকায় নিযুক্ত করতেন তখন তিনি একটি চুক্তি লিখতেন, তাতে সাক্ষী থাকতেন এবং এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে: তারা অভিজাত ঘোড়ায় চড়বে না, তারা ভাল খাবার খাবে না। , তারা সুন্দর পোশাক পরবে না এবং মুসলমানদের জন্য তাদের দরজা একেবারে বন্ধ করবে না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 51-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি নেতাদের ইসলামী শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি সরল জীবনধারা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল, যা সাধারণ জনগণকে অনুসরণ করতে উত্সাহিত করবে। উপরন্তু, একটি সাধারণ জীবনযাপন নিশ্চিত করবে যে সামাজিকভাবে দুর্বলরা তাদের কাছ থেকে অন্যায় আচরণের ভয় পাবে না, কারণ তাদের নেতারা তাদের সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে থাকবেন। এবং অভিজাত শ্রেণী তাদের পক্ষে রায় দেওয়ার সাহস করবে না, কারণ প্রায়শই এই নেতাদের মনোভাব হয় যারা বিলাসিতায় ডুবে থাকে। পরিশেষে, একটি সরল জীবনযাপন নিশ্চিত করবে যে তারা পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার এবং আদেশ করার চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতির উপর তাদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করবে। এই ব্যবহারিক প্রস্তুতি তাদের অন্যদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করতে সাহায্য করবে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

ব্লাইন্ড ট্রাস্ট এড়িয়ে চলা

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন এমন লোকদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন না। তিনি প্রথমে তাদের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করে পরীক্ষা করতেন এবং মুগ্ধ হলে তাদের নিয়োগ দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি একবার আহনাফ ইবনে কায়েসকে গভর্নর নিযুক্ত করার আগে তাকে পরীক্ষা করার জন্য এক বছরের জন্য নিজের কাছে রেখেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 53-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মানুষকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে না যার ফলে তাদের দ্বারা অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি তারা কেউ দ্বারা প্রতারিত হয় তবে তাদের উপেক্ষা করা উচিত এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি তাদের ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

তবে এই ব্যক্তির সাথে আচরণ করার সময় তাদের সাবধানতার সাথে তাদের আচরণ পরিবর্তন করা উচিত যাতে তারা আবার বোকা না হয় তা নিশ্চিত করে।

অন্যদের ক্ষমা করা এবং বিশেষ করে কারো প্রতি অন্যায় করার পরে তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

একজন নেতার পরামর্শ

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আহনাফ ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন, তখন তিনি তাঁকে কিছু উপদেশ দেন যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর রহ. জীবন ও সময়, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 53।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে বেশি হাসে সে তাদের মর্যাদা হারাবে এবং যে বেশি ঠাট্টা করে সে সম্মান হারাবে।

জামে আত তিরমিযী, 2315 নং হাদিসে পাওয়া যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে তিনবার অভিশাপ দিয়েছেন।

সত্যের উপর লেগে থাকা অবস্থায় রসিকতা করা পাপ নয় তবে ধারাবাহিকভাবে করা কঠিন। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঠাট্টা করে সে শেষ পর্যন্ত ছিটকে যাবে এবং পাপপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করবে, যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা বা অন্যকে উপহাস করা। অতএব, অতিরিক্ত রসিকতা করা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ যা জামি আত তিরমিযী, 1995 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত রসিকতা করে এমনকি যদি তারা সর্বদা সত্য কথা বলতে পারে এবং কাউকে অসন্তুষ্ট না করে তবে সে আধ্যাত্মিক ব্যক্তির মুখোমুখি হবে। যে রোগ

সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে ইবনে মাজা, 4193 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়। এটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে যে অত্যধিক রসিকতা করে এবং হাসে কারণ এই মানসিকতা দাবি করে যে তারা সর্বদা মজার বিষয় নিয়ে চিন্তা করে এবং আলোচনা করে এবং গুরুতর সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলে। মৃত্যু এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি গুরুতর বিষয় এবং যদি কেউ সেগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা এড়িয়ে যায় তবে সে কখনই তাদের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত হবে না। এই প্রস্তুতির অভাব তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মৃত্যু ঘটাবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি যত বেশি গুরুত্বের সাথে পরকালের বিষয়ে চিন্তা করবে তত কম তারা হাসবে এবং তামাশা করবে। এটি সহীহ বুখারী, 6486 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অনেক সময় ঠাট্টা করার কারণেও অন্যরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। এটি অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে, যেমন তারা যখন ভাল আদেশ দেয় এবং মন্দ নিষেধ করে তখন গুরুত্বের সাথে না নেওয়া হয় যদিও তা তাদের নিজের সন্তানদের জন্য হয়।

অত্যধিক রসিকতা প্রায়শই মানুষের মধ্যে শত্রুতার দিকে নিয়ে যায় কারণ কেউ সহজেই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে পারে। এর ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং ভেঙে যায়। প্রকৃতপক্ষে, অনেক লোক এমনকি রসিকতার কারণে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আহত হয়েছেন।

উপরন্তু, ঠাট্টা করার সময় উচ্চস্বরে বা পূর্ণ মুখের হাসি এড়ানো উচিত কারণ এটি ইসলামে অপছন্দনীয়। সহীহ বুখারী, ৬০৯২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাসি ছিল একটি হাসি।

একজন মুসলমানকে যেকোন মূল্যে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত এমনকি তামাশা করার সময়ও এটি তাদের জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘর পেতে পারে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4800 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমানকে মোটেই রসিকতা করা উচিত নয়। অন্যান্য পাপ যেমন মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলার সময় সময়ে সময়ে রসিকতা করা গ্রহণযোগ্য, যেমনটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে রসিকতা করেছেন। জামি আত তিরমিযী, 1990 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অতিরিক্ত রসিকতা যা কোন পাপের সাথে সম্পর্কিত হলে এটি অপছন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ। নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্যের ভুল ব্যাখ্যা করা পাপ। যদি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সংযুক্ত কোন পাপ না করে কদাচিৎ কৌতুক করেন তাহলে মুসলমানদেরও তা করা উচিত এবং নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

উপরন্তু, মানুষের সাথে প্রফুল্ল হওয়ার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, যেমন হাসি, এবং অতিরিক্ত রসিকতা। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 301 নম্বর হাদিস অনুসারে প্রফুল্ল হওয়া মহান আল্লাহর একটি নিয়ামত। এমনকি অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার জন্য হাসি দেওয়াও জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে দাতব্য কাজ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। , সংখ্যা 1970। তাই একজনের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে অতিরিক্ত রসিকতা এড়িয়ে যাওয়ার মানে হল যে মানুষ সবসময় দুঃখী এবং বিষণ্ন মেজাজে থাকা উচিত।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি বড় কিছু করবে তার জন্য পরিচিত হয়ে যাবে।

সম্ভবত এটি একটি মিথ্যাবাদী এবং সত্যবাদী ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করছে।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যে বেশি কথা বলে সে অনেক ভুল করে এবং এর ফলে মর্যাদা নষ্ট হয়। মর্যাদার ক্ষতি মহান আল্লাহর ভয়ে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, যা ফলস্বরূপ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত হৃদয়ের দিকে নিয়ে যায়।

জামে আত তিরমিযী, 2501 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অনর্থক বা মন্দ কথা থেকে চুপ থাকে এবং কেবল ভাল কথা বলে তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ রক্ষা করবেন। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রধান কারণ তাদের কথাবার্তা। জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিচারের দিন একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয় যা জামে আত তিরমিযীতে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, সংখ্যা 2314।

বক্তৃতা তিন প্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল মন্দ কথাবার্তা যা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা উচিত। দ্বিতীয়টি হল অনর্থক বক্তৃতা যা শুধুমাত্র একজনের সময় নষ্ট করে যা বিচার দিবসে একটি বড় অনুশোচনার কারণ হবে। উপরন্তু, পাপপূর্ণ বক্তৃতা প্রথম ধাপ প্রায়ই অসার বক্তৃতা. তাই এই ধরনের কথাবার্তা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। চূড়ান্ত প্রকারটি ভাল বক্তৃতা যা সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করে একজনের জীবন থেকে কথার দুই তৃতীয়াংশ মুছে ফেলা উচিত।

উপরন্তু, যারা খুব বেশি কথা বলে সে কেবল তাদের কর্ম এবং পরকালের প্রতি একটু ভাববে কারণ এর জন্য নীরবতা প্রয়োজন। এটি একজনকে তাদের কাজের মূল্যায়ন থেকে বিরত রাখবে যা একজনকে আরও সৎ কাজ করতে এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ব্যক্তি তখন আরও ভালোর জন্য পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকবে।

পরিশেষে, যারা খুব বেশি কথা বলে তারা প্রায়শই পার্থিব বিষয় এবং বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা বিনোদন এবং মজাদার। এটি তাদের এমন একটি মানসিকতা অবলম্বন করবে যার ফলে তারা মৃত্যু এবং পরকালের মতো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা বা শুনতে অপছন্দ করে। এটি তাদের পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখবে যা একটি বড় অনুশোচনা এবং সম্ভাব্য শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

এই সব এড়ানো যেতে পারে যদি কেউ পাপপূর্ণ এবং নিরর্থক কথাবার্তা থেকে নীরব থাকে এবং পরিবর্তে কেবল ভাল কথা বলে। অতএব, যে এভাবে নীরব থাকবে সে দুনিয়াতে কষ্ট ও পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

তপস্বী

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর পূর্বসূরিদের মতোই একটি তপস্বী এবং সরল জীবনযাপন করেছিলেন এবং তাঁর গভর্নরদেরও এটি করতে উত্সাহিত করেছিলেন। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেছে, যার একটি দিক তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ, সালমান আল ফারিসি, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁর পুরো বেতন 5,000 রৌপ্য মুদ্রা দাতব্য দান করতেন এবং তাল-পাতার মাদুর তৈরি করে নিজের হাতে সম্পদ উপার্জন করতেন। যেহেতু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরদের ব্যবসা করতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তাদের নেতৃত্বের ভূমিকা তাদের একটি অন্যায্য সুবিধা দেবে, এটা স্পষ্ট যে সালমান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর মাদুর বিক্রি করেছিলেন এই সত্যটি গোপন করার সময়। তাদের তৈরি

বলা হচ্ছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তারপরও তাঁর কর্মচারীরা তাদের পরিষেবার জন্য একটি ভাল মজুরি পেয়েছেন তা নিশ্চিত করেছিলেন, কারণ তিনি চাননি যে তারা জনগণের সেবা থেকে বিভ্রান্ত হোক। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 56 এবং পৃষ্ঠা 63-65-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইহলৌকিক ও পরকালের ব্যাপারে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি গ্রহণ করায় তারা তপস্যা গ্রহণ করে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে,

একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

নম্রতা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পূর্বসূরিদের মতো নম্রতা অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর গভর্নরদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা অহংকার এড়াবে যা তাদের সমাজে দুর্বল বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের অধিকার পূরণ করতে বাধা দেবে।

উদাহরণ স্বরূপ, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.) সিরিয়া অভিযানের নেতা ছিলেন, যখন একজন রোমান সৈন্য আলোচনার জন্য তার কাছে এসেছিল। রোমান সৈন্য তাকে তার লোকদের থেকে আলাদা করতে পারেনি, কারণ তারা সবাই একই রকম ছিল। রোমান সৈন্য অবশেষে তাকে মাটিতে বসে দেখতে পেল। তিনি যখন তার সরল আচার-ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন করলেন, তখন আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন যে, তিনি দুনিয়ার আরাম-আয়েশের অধিকারী নন, প্রকৃতপক্ষে, তিনি কেবল একটি ঘোড়া এবং একটি অস্ত্রের মালিক ছিলেন। তিনি আরো বলেন, যদি তার উপর বসার জন্য একটি কুশন থাকে তবে তিনি তা অন্য মুসলমানকে ব্যবহার করার জন্য দেবেন, কারণ তিনি মহান আল্লাহর কাছে তার চেয়ে উত্তম হতে পারেন। তিনি তখন রোমান সৈন্যকে স্মরণ করিয়ে দেন যে পৃথিবীতে হাঁটা (কোন প্রাণীর উপর চড়ার পরিবর্তে), মাটিতে বসে থাকা, মাটিতে খাওয়া এবং মাটিতে শুয়ে থাকা মহান আল্লাহর কাছে একজন ব্যক্তির মর্যাদাকে কম করে না। বরং মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তির সওয়াব বৃদ্ধি করেন এবং তাদের নম্রতার কারণে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 56-57-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ের সাথে জীবনযাপন করবে তখন তাকে মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। এটি ঘটে কারণ নম্রতা মহান আল্লাহর দাসত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নম্রতার বিপরীত যা অহংকার শুধুমাত্র মালিকের জন্য, অর্থাৎ আল্লাহ, সর্বোত্তম, কারণ মানুষের যা কিছু আছে তা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং দান করা হয়েছে। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি অহংকার পরিহার করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে নম্রতা প্রদর্শন করে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব এবং উভয় জগতেই প্রকৃত মহিমার দিকে নিয়ে যায়।

তাকওয়া অবলম্বন করা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পূর্বসূরিদের মতোই তাকওয়া অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর গভর্নরদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি যে লোকদের নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন তাদের অনেকেই তাদের ধার্মিকতার অর্থের কারণে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করার ভয় করত, যেমন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি সিরিয়ায় হোমসের গভর্নরশিপ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 57-58-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর।

তাকওয়া বলতে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি অন্যদের সাথে আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত করে যেভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

ধার্মিকতার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক শুধু হারাম নয়। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের এক ধাপ কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর যেটা বেআইনীর কাছাকাছি, তার মধ্যে পড়া তত সহজ। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করে এবং শুধুমাত্র হালাল জিনিস ব্যবহার করে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে।

সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা এক আকস্মিক পদক্ষেপে নয় ধীরে ধীরে ঘটেছে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার অর্থ, যে কথার কোনো উপকার হয় না বা পাপও হয় না, তা প্রায়শই গীবত, মিথ্যা ও অপবাদের মতো খারাপ কথার দিকে নিয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক বক্তৃতা না করে প্রথম পদক্ষেপটি এড়িয়ে যায় তবে সে মন্দ কথা এড়িয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানের উচিত পূর্বে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বন করার চেষ্টা করা, যার একটি শাখা হল নিরর্থক ও সন্দেহজনক বিষয়গুলিকে এড়িয়ে চলার ভয়ে যে তারা হারামের দিকে নিয়ে যাবে।

হিংসা পরিহার করা

উমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক নিযুক্ত এবং বরখাস্ত করা গভর্নররা, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অন্যদেরকে কখনোই হিংসা করেননি, যেমন যারা তাদের নেতৃত্বের ভূমিকায় তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। বা যারা নেতৃত্বের ভূমিকায় নিযুক্ত হননি তারা যারা করেছেন তাদের হিংসা করেননি। তাদের প্রত্যেকেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন, কারণ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন বিষয়ে একজন নেতার আনুগত্য করা, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 58-59-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4210 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে হিংসা ভাল কাজকে ধ্বংস করে যেমন আগুন কাঠকে গ্রাস করে।

হিংসা করা একটি গুরুতর এবং বড় পাপ কারণ হিংসাকারীর সমস্যা অন্য ব্যক্তির সাথে নয় বাস্তবে এটি মহান আল্লাহর সাথে, কারণ তিনিই সেই নিয়ামত যিনি ঈর্ষা করা হয় তাকে দিয়েছেন। সুতরাং একজন ব্যক্তির হিংসা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বরাদ্দ এবং পছন্দের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ একটি ভুল করেছেন যখন তিনি তাদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ বরাদ্দ করেছিলেন।

কেউ কেউ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ামত বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় যা নিঃসন্দেহে পাপ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার হল যখন হিংসাকারী আশীর্বাদ না পেলেও মালিকের কাছ থেকে আশীর্বাদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। হিংসা তখনই বৈধ যখন একজন ব্যক্তি তাদের অনুভূতির উপর কাজ করে না, তাদের অনুভূতিকে অপছন্দ করে এবং মালিকের আশীর্বাদ না হারিয়ে অনুরূপ আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও এই প্রকারটি পাপ নয়, এটি অপছন্দনীয় বলে বিবেচিত হয় যদি হিংসা পার্থিব আশীর্বাদের উপর হয় এবং যদি তা ধর্মীয় আশীর্বাদের উপর হয় তবে প্রশংসনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বর হাদিসে পাওয়া প্রশংসনীয় ধরণের দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যায় সে হল সেই ব্যক্তি যে বৈধ সম্পদ অর্জন করে এবং ব্যয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বৈধভাবে ঈর্ষা করা যেতে পারে সেই ব্যক্তি যিনি তাদের জ্ঞানকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন এবং অন্যকে তা শেখান।

একজন ঈর্ষান্বিত মুসলমানের উচিত হিংসা করা ব্যক্তির প্রতি উত্তম চরিত্র ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের হৃদয় থেকে এই অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করা, যেমন

তাদের ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা যতক্ষণ না তাদের হিংসা তাদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়।

মুসলিম আচার

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, ইসলামী সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিমদের সম্মানের সাথে আচরণ করা নিশ্চিত করার জন্য মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তিনি তাঁর সমস্ত গভর্নরদেরকে তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যেহেতু তারা আল্লাহ, মহান এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুরক্ষার অধীনে ছিলেন এবং তাদের শত্রুদের থেকে তাদের রক্ষা করতে এবং তাদের উপর কখনও বোঝা না দেন। যা তারা সহ্য করতে পারেনি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 72-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

ফান্ডের অপব্যবহার

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, সর্বদা নিশ্চিত করতেন যে পাবলিক ফান্ড সঠিকভাবে ব্যয় করা হয়েছে। তিনি তার গভর্নরদের তা সঠিকভাবে ব্যয় করার জন্য অনুরোধ করবেন এবং তাদের কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি ক্রমাগত এই সম্পদ নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করতেন এবং তার গভর্নরদের মনে করিয়ে দিতেন যে এই সম্পদ মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং এটি তার বা তার পরিবারের নয়, তাই তাদের অবশ্যই তা সঠিকভাবে জনগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 73-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, তহবিলের অপব্যবহার একটি ব্যাপক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে, ইসলামী দেশগুলির মধ্যে। এ কারণে ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও দরিদ্র হচ্ছে।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের দিন থেকে কীভাবে জিনিসগুলি এত পরিবর্তিত হয়েছে তা লজ্জাজনক। তখনকার দিনে তারা নেতা হয়ে আসলে জনগণের সেবক হয়ে উঠেছিল এবং জনগণের অর্থ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করে নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ জনগণের জন্য ব্যয় করত। অথচ আজকাল নেতা ও রাজপরিবাররা জনগণের সম্পদ ব্যয় করে এমন আচরণ করে যেন তারাই জাতির মালিক।

জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরিদেরকে তাদের আদর্শ হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সকলের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে যা একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে তাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং তারপরে তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাদেরকে প্রথমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এবং তারপর মানুষের অধিকার আদায় করতে হবে।

জান্নাত পরিদর্শন

উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাঁর গভর্নরদের বরখাস্ত করতেন যদি তারা তাদের শাসনাধীনে অসুস্থ ব্যক্তিদের নিয়মিত দেখতে ব্যর্থ হয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এই কাজটি সমাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে এবং তাদের শাসনাধীন ব্যক্তিদের জন্য একজন নেতার যত্নের একটি স্পষ্ট লক্ষণ। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 76-77-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 6551 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে মুসলিম অসুস্থ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যায় সে জান্নাতের বাগানে থাকে যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, এই হাদিসটি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও, নিঃসন্দেহে এটি একটি মহান কাজ, একজন মুসলমানের জন্য প্রথমে এই সৎ কাজটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি তারা অন্য কোন কারণে যেমন লোক দেখানোর জন্য এটি করে তবে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে না।

উপরন্তু, তাদের সওয়াব পাওয়ার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অসুস্থদের দেখতে যাওয়ার আদব ও শর্ত পূরণ করতে হবে। এতে তাদের বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়,

অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের আত্মীয়দের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই দিন এবং বয়সে অসুস্থ ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করা সহজ হয় যাতে তারা উপযুক্ত সময়ে তাদের দেখতে যান কারণ একজন অসুস্থ ব্যক্তি সারা দিন বিশ্রামে থাকবেন। তাদের উচিত তাদের কাজ এবং কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা পরচর্চা, গীবত করা এবং অন্যদের নিন্দা করার মতো সব ধরনের পাপ থেকে বিরত থাকে। তাদের উচিত অসুস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করা এবং এর সাথে সম্পর্কিত পুরষ্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণত দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষেত্রে উপকারী বিষয়ে আলোচনা করা। যদি কেউ এইভাবে আচরণ করে তখনই তারা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত সওয়াব লাভ করবে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয় তবে তারা হয় কোন পুরষ্কার পাবে না বা তারা কীভাবে আচরণ করেছে তার উপর নির্ভর করে তাদের পাপের সাথে অবশিষ্ট থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান এই ধার্মিক কাজটি সম্পাদন করতে উপভোগ করে কিন্তু সঠিকভাবে এর শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 114:

"তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনে কোন কল্যাণ নেই, যারা দাতব্যের নির্দেশ দেয় বা যা সঠিক বা মানুষের মধ্যে সমঝোতা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করবে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেব।

সাম্যের গুরুত্ব

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাম্যের গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী নীতি নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তিনি তার কোনো গভর্নর এবং নেতাদের কঠোরভাবে সমালোচনা করবেন যদি তিনি শুনেন যে তারা মানুষের সাথে সমান আচরণ করে না। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 77-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

অবিচল মনোভাব

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এমন কোনো দারোয়ান বা প্রহরী থাকবে না যে লোকেদেরকে তাঁর সাথে দেখা করতে বাধা দেবে এবং তিনি তাঁর গভর্নরদেরকেও প্রহরী ও দারোয়ানদের থেকে নিষেধ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের দরজা সর্বদা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে এবং তাদের সমস্যাগুলি চব্বিশ ঘন্টা মোকাবেলা করতে, ঠিক যেমন তিনি করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 79-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

নিজের কর্তব্যের প্রতি এই অটল পন্থা সকল মুসলমানদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং

যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে

সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

অন্যদের মনিটরিং

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্বের পদে সবচেয়ে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগ করতেন। কিন্তু তিনি তাদের স্বাধীন রাজত্ব দিতেন না। তিনি অন্যান্য কর্মচারীদের মাধ্যমে ক্রমাগত তাদের পর্যবেক্ষণ করতেন।

তিনি নিয়মিত বিভিন্ন এলাকা থেকে এলোমেলো নাগরিকদের তাদের গভর্নর এবং জনগণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পাঠাতেন।

তিনি মেইল বাহক নিয়োগ করেছিলেন যারা অন্য কোন হস্তক্ষেপ বা চিঠির বিষয়বস্তু পড়া ছাড়াই যেকোন নাগরিকের কাছ থেকে সরাসরি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চিঠি নিয়ে যেতেন। এটি নিশ্চিত করে যে কেউ একজন গভর্নরের বিরুদ্ধে সরাসরি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ করতে পারে, এই ভয় ছাড়াই গভর্নর বাধা দেবেন এবং অভিযোগ তাঁর কাছে পৌঁছাতে বাধা দেবেন।

উমর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, একজন সিনিয়র ইন্সপেক্টর, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ, আল্লাহ তাঁর উপর নিযুক্ত করেছিলেন, যার দায়িত্ব ছিল গভর্নরদের তত্ত্বাবধান করা এবং গভর্নররা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন তা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ করা। পরিবর্তে, তার দায়িত্ব সর্বোচ্চ মানদণ্ডে পূর্ণ হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য তার অনেক সহায়তা ছিল।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরদের ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য এক বছরব্যাপী ভ্রমণে প্রতিটি অঞ্চলে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু এটি করার সুযোগ পাওয়ার আগেই তিনি শহীদ হয়েছিলেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, তীর্থযাত্রার মরসুম ব্যবহার করতেন, যেখানে সমস্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের লোকেরা পবিত্র তীর্থযাত্রা (হজ্জ) করতে মক্কায় আসত। তিনি এটি সম্পাদনও করতেন এবং জনগণকে তাদের গভর্নরদের সাথে তাদের যে কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে উত্সাহিত করতে সময় ব্যয় করতেন। তিনি তীর্থযাত্রার মরসুমে তার কর্মচারীদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করতেন যারা সেখানেও উপস্থিত ছিলেন, তাদের দায়িত্ব এবং তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা লোকদের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরদের সাথে আকস্মিক সফর করতেন এবং তারা খলিফাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন না বুঝতে পেরে তাদের বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি পেতেন। তিনি তাদের সম্পদ এবং জিনিসপত্রের হিসাব নেবেন যাতে তারা পার্থিব জিনিসপত্র জমা করার জন্য তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার না করে।

তিনি নিয়মিত তার গভর্নরদের একটি বোনাস, সরকারী কোষাগার থেকে কিছু সম্পদ পাঠিয়ে পরীক্ষা করতেন এবং সম্পদের সাথে তারা কী করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য লোকদের নিয়োগ করতেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 80-85-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তাঁর আচার-আচরণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যক্তিদের অধিকার আদায় করাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন।

সহীহ বুখারী, 2409 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জিনিসগুলির জন্য একজন অভিভাবক এবং দায়ী।

একজন মুসলমানের অভিভাবক সবচেয়ে বড় জিনিস হল তাদের বিশ্বাস। তাই তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে এর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

এই অভিভাবকত্বের মধ্যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি আশীর্বাদও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে বাহ্যিক জিনিস যেমন সম্পদ এবং অভ্যন্তরীণ জিনিস যেমন একজনের দেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করে এসবের দায়িত্ব পালন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র তাদের চোখ হালাল জিনিসের দিকে তাকানোর জন্য এবং তাদের জিহ্বাকে শুধুমাত্র হালাল এবং দরকারী শব্দ উচ্চারণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

এই অভিভাবকত্ব একজনের জীবনের মধ্যে অন্যদের যেমন আত্মীয় এবং বন্ধুদের কাছেও প্রসারিত হয়। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের জন্য প্রদান করা এবং মৃদুভাবে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ নিষেধ করার মতো অধিকারগুলো পূরণ করে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে পার্থিব বিষয়ে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের সাথে সদয় আচরণ করা এই আশায় যে তারা আরও ভালোর জন্য পরিবর্তিত হবে। এই অভিভাবকত্ব একজনের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত. একজন মুসলিমকে অবশ্যই উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে কারণ এটিই শিশুদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, কার্যত আগে যেমন আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরও তা করতে শেখাতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, এই হাদীস অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য কাজ করা কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ।

ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরদের প্রতি এতটাই কঠোর হতেন যে, তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের সমস্ত লোকদের কাছে অবিরাম ঘোষণা করতেন যে, তাঁর কোনো গভর্নর যদি তাদের প্রতি অন্যায় করে, তবে তারা যেন বিষয়টি তাঁর কাছে নিয়ে আসে এবং তিনি তা মেনে নিতেন। ব্যক্তিগতভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করুন।

তিনি অনেক লোককে নিয়োগ করেছিলেন শুধুমাত্র এমন লোকদের সন্ধান করার জন্য যাদের গভর্নরদের দ্বারা অন্যায় করা হয়েছিল যাতে তিনি জিনিসগুলি সংশোধন করতে পারেন।

তীর্থযাত্রার মৌসুমে তিনি জনগণকে আমন্ত্রণ জানাতেন তাদের অভিযোগ তার কাছে তুলে ধরতে। একবার, একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে অভিযোগ করলেন যে তার গভর্নর তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়েছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরের উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে তিনি লোকটিকে তাঁর গভর্নরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং প্রতিশোধ নিতে বলেছিলেন। আরেক গভর্নর আমর ইবনে আল আস সতর্ক করে দিয়েছিলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, এটা করবেন না কারণ এটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হয়ে যেতে পারে এবং গভর্নররা জনগণের উপর তাদের প্রভাব ও সম্মান হারাবেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর চূড়ান্ত অসুস্থতার সময়, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি মানুষকে নিজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যদি তারা মনে করে যে তিনি তাদের প্রতি

অন্যায় করেছেন। আমর, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, তারপর সেই ব্যক্তির সাথে একটি চুক্তি করার পরামর্শ দেন যার সাথে অন্যায় করা হয়েছিল এবং তিনি 200টি স্বর্ণমুদ্রায় সম্মত হন এবং তার প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার ছেড়ে দেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 83-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

কঠোরতার সাথে প্রেম

যদিও উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কর্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, তবুও তাদের সকলের মধ্যে একে অপরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। এর কারণ ছিল যে, তারা মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাই, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখনই তাঁর গভর্নরদের সমালোচনা করতেন তখনই তারা তা গ্রহণ করতেন কারণ তারা জানত যে এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে। যখন একজনের সাথে অন্যের সংযোগ মহান আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে হয়, তখন তাদের মধ্যে পার্থক্য কখনই শত্রুতা ও খারাপ অনুভূতির দিকে নিয়ে যায় না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ এন্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 103-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে লোকেরা প্রায়শই বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একে অপরের সাথে তাদের একসময়ের শক্তিশালী সংযোগ হারায়। এর অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু একটি প্রধান কারণ হল তাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা তাদের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তি। এটি সাধারণত জানা যায় যে যখন একটি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি দুর্বল হয় তখন ভবনটি সময়ের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা এমনকি ধসে পড়ে। একইভাবে, যখন মানুষকে সংযুক্ত করার বন্ধনের ভিত্তি সঠিক না হয় তখন তাদের মধ্যকার বন্ধনগুলি অবশেষে দুর্বল বা এমনকি ভেঙ্গে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন। যেখানে, বেশিরভাগ মুসলমান আজ উপজাতীয়তা, ভ্রাতৃত্বের জন্য এবং অন্যান্য পরিবারকে দেখানোর জন্য লোকদের একত্রিত করে। যদিও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারা সম্পর্কযুক্ত

ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু তাদের সংযোগকারী বন্ধনের ভিত্তি ছিল যথার্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বন্ধন শক্তিশালী থেকে শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও আজকাল অনেক মুসলমান রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ তাদের বন্ধনের ভিত্তি ছিল মিথ্যা, গোত্রবাদ এবং অনুরূপ জিনিসের উপর ভিত্তি করে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে যদি তাদের বন্ধন টিকে থাকার এবং আত্মীয়তার বন্ধন এবং অ-আত্মীয়দের অধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য সওয়াব অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে তাদের অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধন তৈরি করতে হবে। এর ভিত্তি হল মানুষ কেবল একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একসাথে এমনভাবে কাজ করে যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি হয়। পবিত্র কুরআনে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ

উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতকালে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যান। তার শেষ কথায় অন্তর্ভুক্ত ছিল: "...আমি অমুক এবং অমুক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমার শরীরে এমন কোন স্থান নেই যেটা তরবারির আঘাত পায়নি বা তীর বা বর্শা দিয়ে বিদ্ধ হয়নি, তবুও আমি এখানে আছি, উট মরে আমার বিছানায় মরে। কাপুরুষেরা কখনো উন্নতি না করুক। আমি মৃত্যু (শহীদ) চেয়েছিলাম যেখানে এটি চাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এটি কেবলমাত্র আমার নিজের বিছানায় মৃত্যুবরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 115-116-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর অসীম এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি যদি একজন ব্যক্তির উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাদের তা করতে চাননি। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রে কারো ক্ষতি করতে পারে না। এর অর্থ একমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেন তা মহাবিশ্বের মধ্যে ঘটে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই উপদেশটি ওষুধের মতো উপায় ব্যবহার ত্যাগ করার ইঙ্গিত দেয় না, তবে এর মানে হল যে কেউ উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ সেগুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করেছেন, তবে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহই সকল কিছুর ফলাফল নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অনেক অসুস্থ ব্যক্তি যারা ওষুধ খান এবং তাদের অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তারা অন্য যারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয় না। এটি ইঙ্গিত করে যে আরেকটি কারণ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে, তা হল মহান আল্লাহর ইচ্ছা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমরা কখনই আঘাত করব না..."

যিনি এটি বোঝেন তিনি জানেন যে তাদের প্রভাবিত করে এমন কিছু এড়ানো যেত না। এবং যে জিনিসগুলি তাদের মিস করেছে সেগুলি কখনই পাওয়া যেত না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেষ ফলাফল যাই হোক না কেন তা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাদের ধৈর্য ধরে থাকা উচিত এবং সত্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম নির্বাচন করেছেন যদিও তারা ফলাফলের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যখন কেউ এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে তখন তারা সৃষ্টির উপর নির্ভর করা বন্ধ করে দেয় যে তারা জন্মগতভাবে তাদের ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। পরিবর্তে, তারা মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে

আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সমর্থন ও সুরক্ষা কামনা করে। এটি একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দিকে পরিচালিত করে। এটি একজনকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

নিজের জীবনে এবং মহাবিশ্বের মধ্যে যা কিছু ঘটে তা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা স্বীকার করা, মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝার একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয় যার কোন শেষ নেই এবং এটি কেবলমাত্র অতিমাত্রায় বিশ্বাস করার বাইরে চলে যায় যে মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। যখন এটি কারও হৃদয়ে স্থির হয় তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর উপর আশা করে, তারা জানে যে একমাত্র তিনিই তাদের সাহায্য করতে পারেন। তারা কেবল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করবে এবং আনুগত্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পেতে বা কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্যের আনুগত্য করে। একমাত্র মহান আল্লাহই এটি প্রদান করতে পারেন তাই কেবলমাত্র তিনিই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যের আনুগত্য পছন্দ করে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে যে এই অন্যটি তাদের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা তাদের ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। যা কিছু ঘটে তার উৎস হল আল্লাহ, মহান, তাই মুসলমানদের শুধুমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা উচিত। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

“আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন- কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না..."

উল্লেখ্য যে, এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উৎসাহিত করে, বাস্তবে মহান আল্লাহকে মান্য করা। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

দুঃখের সময়

উমর ইবনে খাত্তাবের খিলাফতকালে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং লোকেরা তাঁর জন্য প্রচুর শোক প্রকাশ করেছিল। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে লোকেরা তার জন্য কাঁদতে দেওয়া উচিত, যতক্ষণ না তারা বকবক করছে (পাপপূর্ণ বক্তৃতায় জড়িত)। তিনি এই বলে শেষ করলেন যে, খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পছন্দের জন্য, কান্নাকারীদের কাঁদতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 116-117-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 3127 নম্বর, সতর্ক করে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে প্রিয়জনকে হারানোর মতো কঠিন সময়ে কান্না করা অনুমোদিত নয়। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায়

তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নাতি যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্নার জন্য বা তাদের হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে যদি তারা মহান আল্লাহর পছন্দের ব্যাপারে তাদের অধৈর্যতা প্রদর্শন করে এমন শব্দ উচ্চারণ করে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হারাম জিনিসগুলি হল কান্না, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা দুঃখে মাথা ন্যাড়া করা। যারা এইভাবে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর সতর্কবাণী। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। এইভাবে কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে যদি মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয় তবে তারাও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 18:

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না..."

পারস্যদের বিরুদ্ধে অভিযান

অন্যদের গাইডিং

আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে পারস্যদের বিরুদ্ধে অভিযান পুরোদমে চলছিল। তাঁর মৃত্যুর পর, উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর সাথে অভিযান চালিয়ে যান এবং জনগণকে স্বেচ্ছায় অভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। আবু উবায়দ ইবনে মাসউদ, আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, তিনি প্রথম প্রতিক্রিয়া জানালেন এবং ফলস্বরূপ অনেক লোক তার নেতৃত্ব অনুসরণ করেছিল এবং অভিযানের জন্য সাইন আপ করেছিল। যখন তার প্রতিক্রিয়া অন্যদের প্রতিক্রিয়া জানাতে পরিচালিত করেছিল, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সেনাবাহিনীর নেতা নিযুক্ত করেছিলেন, যদিও তিনি একজন সাহাবী ছিলেন না, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 119-120-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে ভালো কিছুর পথ দেখায় সে তাদের উপদেশ অনুযায়ী আমলকারীর সমান সওয়াব পাবে। আর যারা অন্যদেরকে পাপের পথ দেখায় তাদের জবাবদিহি করা হবে যেন তারা পাপ করেছে।

অন্যদের উপদেশ ও পথপ্রদর্শন করার সময় মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদেরকে শুধুমাত্র ভালো বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাতে তারা এর থেকে পুরস্কার লাভ করে এবং অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন ব্যক্তি বিচারের দিনে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না শুধুমাত্র এই দাবি করে যে তারা অন্যদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যদিও সে নিজে পাপ করেনি। মহান আল্লাহ পথপ্রদর্শক ও অনুসরণকারী উভয়কেই তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে সেই কাজগুলো করার পরামর্শ দেওয়া যা তারা নিজেরা করবে। যদি তারা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ একটি কাজ অপছন্দ করে তবে তাদের অন্যদেরকে সেই কাজটি করার পরামর্শ দেওয়া উচিত নয়।

এই ইসলামি নীতির কারণে মুসলমানদের উচিত অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়ার আগে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা নিশ্চিত করা কারণ তারা অন্যদেরকে ভুল উপদেশ দিলে তারা সহজেই তাদের নিজের পাপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে।

উপরন্তু, এই নীতি হল মুসলমানদের জন্য পুরষ্কার অর্জনের একটি অত্যন্ত সহজ উপায় যা তারা সম্পদের অভাবের কারণে নিজেদের করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে আর্থিকভাবে দাতব্য দান করতে সক্ষম নয় অন্যদেরকে এটি করতে উত্সাহিত করতে পারে এবং এর ফলে তারা দানকারীর সমান পুরস্কার লাভ করবে।

একজন জেনারেলের পরামর্শ

যখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, পারস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইরাকে একটি সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁর সেনাপতি আবু উবায়দ ইবনে মাসউদকে নিম্নোক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন। এটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 120-121 লিপিবদ্ধ হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ দিলেন যেন তিনি সাহাবাদের কথা শুনেন এবং মনোযোগ দেন, যারা তাঁর সাথে যাচ্ছিলেন।

মুসলমানদের উচিত তাদের বিষয়ে কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করা। তাদের উচিত পবিত্র কুরআনের পরামর্শ অনুযায়ী এই কয়েকজনকে নির্বাচন করা। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 43:

"... সুতরাং বার্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যদি আপনি না জানেন।"

এই আয়াতটি মুসলমানদের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা কেবলমাত্র আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যেমন তার শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে একজন গাড়ির মেকানিকের সাথে পরামর্শ করা বোকা হবে, একজন

মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা এটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষাগুলি।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের শুধুমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। কারণ তারা কখনই অন্যদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার পরামর্শ দেবে না। পক্ষান্তরে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় বা আনুগত্য করে না, তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে কিন্তু তারা সহজেই অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেবে, যা কেবল তাদের সমস্যাই বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং শুধুমাত্র এই জ্ঞানই তাদের সমস্যার সমাধান করে অন্যদেরকে সফলভাবে পরিচালনা করবে। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ কেউ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় নেয় এবং কাজ করার সঠিক সময় না জেনে সঠিকভাবে যুদ্ধ করা যায় না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই পরামর্শটি চিন্তা করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

জামে আত তিরমিযী, 2012 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, চিন্তা করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, অথচ তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যা বোঝার এবং তার উপর কাজ করার জন্য মুসলমান যারা অনেক সৎ কাজ করে তারা প্রায়শই তাড়াহুড়ো করে তাদের ধ্বংস করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্রোধের সাথে কিছু খারাপ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যা তাদের বিচারের দিনে জাহান্নামে নিমজ্জিত হতে পারে। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বেশিরভাগ পাপ এবং অসুবিধা, যেমন তর্ক-বিতর্ক, ঘটতে পারে কারণ লোকেরা জিনিসগুলি চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হল যখন কেউ কথা বলার বা কাজ করার আগে চিন্তা করে এবং কেবল তখনই আগে আসে যখন তারা জানে যে তাদের কথা বা কাজ পার্থিব বা ধর্মীয় বিষয়ে ভাল এবং উপকারী।

যদিও, একজন মুসলমানের এখনও সৎকাজ সম্পাদনে বিলম্ব করা উচিত নয়, তবুও তাদের সেগুলি সম্পাদন করার আগে কিছু চিন্তা করা উচিত। এর কারণ হল একটি সৎ কাজের কোনো প্রতিদান পাওয়া যায় না শুধুমাত্র এই কারণে যে এর শর্ত ও শিষ্টাচার কারোর তাড়াহুড়ার কারণে পরিপূর্ণ হয়নি। এই ক্ষেত্রে, যে কোনও বিষয়ে চিন্তা করার পরেই একজনকে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করবে সে কেবল তাদের পাপগুলিকে কম করবে না এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াবে, তবে তারা তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং মতানৈক্যের মতো সমস্যাগুলিকে কমিয়ে দেবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিপীড়নে ভরা দেশে যাচ্ছেন। যেখানে অধিকাংশ মানুষ মন্দ কাজ করতে সাহসী ছিল এবং ভাল ভুলে গিয়েছিল।

এটি মুসলমানদের তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে অবিচল থাকার স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন শয়তান, তাদের অভ্যন্তরীণ শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা

তাঁর খিলাফতের সময়, আবু বক্কর, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, যারা ধর্মত্যাগ থেকে অনুতপ্ত হয়েছিল তাদেরকে মুসলিম অভিযানে যোগদানের অনুমতি দেননি, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তারা আবার ধর্মত্যাগে প্রলুব্ধ হতে পারে। বিদেশী ভূমিতে পরাশক্তির সাথে জড়িত মুসলিম সৈন্যদের জন্য এটি বিপর্যয়কর হবে। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যারা ধর্মত্যাগ থেকে তওবা করেছিল তারা ইসলামের উপর অটল ছিল, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে মুসলিম অভিযানে যোগদানের অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাদেরকে নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত করেননি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 121 এবং 157-158-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সমস্ত মুসলমান আশা করে যে বিচার দিবসে মহান আল্লাহ তাদের অতীতের ভুল ও পাপকে দূরে সরিয়ে দেবেন, উপেক্ষা করবেন এবং ক্ষমা করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই একই মুসলিমদের অধিকাংশই যারা এর জন্য আশা করে এবং প্রার্থনা করে তারা অন্যদের সাথে একইভাবে আচরণ করে না। অর্থ, তারা প্রায়শই অন্যদের অতীতের ভুলগুলিকে আটকে রাখে এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এটি সেই ভুলগুলির উল্লেখ নয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চালকের দ্বারা সৃষ্ট একটি গাড়ি দুর্ঘটনা যা অন্য ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তা একটি ভুল যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শিকারকে প্রভাবিত করবে। এই ধরনের ভুল বোধগম্যভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং উপেক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অনেক মুসলমান প্রায়ই অন্যদের ভুলের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না, যেমন মৌখিক অপমান। যদিও, ভুলটি ম্লান হয়ে গেছে তবুও এই লোকেরা পুনরুজ্জীবিত করার এবং সুযোগ পেলে অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য জোর দেয়। এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক মানসিকতা কারণ একজনের বোঝা উচিত যে লোকেরা

ফেরেশতা নয়। অন্ততপক্ষে একজন মুসলিম যে মহান আল্লাহর কাছে তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করার আশা রাখে তার উচিত অন্যের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করা। যারা এইভাবে আচরণ করতে অস্বীকার করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের বেশিরভাগ সম্পর্ক ভেঙে গেছে কারণ কোনও সম্পর্কই নিখুঁত নয়। তারা সবসময় একটি মতবিরোধ হবে যা প্রতিটি সম্পর্কে একটি ভুল হতে পারে. অতএব, যে এইভাবে আচরণ করবে সে একাকী হয়ে যাবে কারণ তাদের খারাপ মানসিকতা তাদের অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে এই লোকেরা একাকী থাকতে ঘৃণা করে তবুও এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করে যা অন্যদের তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এটি যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ বেঁচে থাকাকালীন এবং মারা যাওয়ার পরে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান পেতে চায় কিন্তু এই মনোভাব একেবারে বিপরীত ঘটতে দেয়। তারা বেঁচে থাকতে মানুষ তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা যখন মারা যায় তখন মানুষ তাদের সত্যিকারের স্নেহ ও ভালোবাসায় স্মরণ করে না। যদি তারা তাদের মনে রাখে তবে এটি কেবল প্রথার বাইরে।

অতীতকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে অন্যের প্রতি অত্যধিক সুন্দর হতে হবে তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সর্বনিম্ন শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এটির জন্য কিছু খরচ হয় না এবং সামান্য প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাই মানুষের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখা উচিত, তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ বিচারের দিন তাদের অতীতের ভুলগুলোকে উপেক্ষা করবেন। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"... এবং তাদের ক্ষমা এবং উপেক্ষা করা যাক। আপনি কি চান না যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

বিশ্বের ক্রীতদাস

ইরাক অভিযানের সময়, পার্সিয়ান সেনাবাহিনী মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করলেও মুসলিমরা যে অঞ্চলগুলি জয় করেছিল সেখানে বসবাসকারী জনগণের নেতাদের বিদ্রোহ করতে উত্সাহিত করেছিল। তারা তাদের পার্থিব জিনিসের জন্য খালি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যেমন সম্পদ এবং ক্ষমতা, যার ফলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রলুব্ধ করেছিল। এর ফলে আন নামরিকের যুদ্ধ শুরু হয়। একটি যুদ্ধ যা শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা জয়ী হয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 122-123-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক

কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহুর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং

বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

প্রতিশ্রুতি পূরণ করা

পারস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তাদের একজন নেতা মুসলিম বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। যে সৈনিক তাকে গ্রেপ্তার করেছিল সে জানে না যে সে কে এবং তাকে মুক্তিপণের জন্য ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রতারিত হয়েছিল। তিনি পালাতে পারার আগেই পারস্যের নেতাকে আটক করা হয় এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতা আবু উবায়দ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু মুসলিম সৈনিক যেমন পারস্য নেতাকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আবু উবায়েদ, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চাননি এবং তাই পারস্য নেতাকে মুক্ত করেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 123-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব তার সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াকাসকে একই আদেশ দিয়েছিলেন, যখন তিনি তাকে ইরাকে প্রেরণ করেছিলেন। অর্থ, তিনি তাকে বলেছেন যে কোনো শত্রু সৈন্যকে নিরাপত্তা দিতে যাকে একজন মুসলিম সৈনিক নিরাপত্তা দিয়েছে, যদিও তা ভুলবশতই হয়। তিনি আরও বলেন, প্রতিশ্রুতি পূরণ করা বিজয় অর্জনের একটি উপায়, যেখানে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা পরাজয়ের দিকে নিয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 162-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকির একটি দিক।

একজন মুসলমানের প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হল মহান আল্লাহর সাথে, যা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। লোকেদের সাথে করা অন্যান্য সমস্ত প্রতিশ্রুতিও অবশ্যই রাখা উচিত যদি না একজনের কাছে একটি বৈধ অজুহাত থাকে, বিশেষ করে যেগুলি একজন পিতামাতা সন্তানদের সাথে করেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধুমাত্র শিশুদের খারাপ চরিত্র শেখায় এবং তাদের বিশ্বাস করতে উত্সাহিত করে যে প্রতারক হওয়া একটি গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারী, 2227 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে হবেন যে তাঁর নামে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তারপরে বৈধ অজুহাত ছাড়াই তা ভঙ্গ করে। যার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ আছেন, তিনি শেষ বিচারের দিন কিভাবে সফল হতে পারেন?

একটি শক্তিশালী উপদেশ

উমর ইবনে খাত্তাব সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাসকে ইরাক অভিযানের সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাকে মদিনা থেকে পাঠানোর আগে, তিনি তাকে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 146-148-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ এবং তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য ছাড়া আর কারও মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে সকলেই সমান ছিল। এবং লোকেরা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর কাছে যা আছে তা অর্জন করবে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার

দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাকে অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ অনুসরণ করতে হবে, কারণ এটিই সঠিক পথ। এবং তিনি তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যদি সে তার পরামর্শ উপেক্ষা করে তবে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ইরাক অভিযান ছিল একটি কঠিন এবং সত্যকে মেনে চলা ছাড়া আর কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারেনি।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ভালো কাজ করতে অভ্যস্ত করার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে থাকা লোকদেরও তা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক

হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহর ভয় দুটি জিনিসের সংমিশ্রণ: তাঁর আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা পরিহার করা।

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে

পারে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয় । এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহর ভয় দুটি জিনিসের সংমিশ্রণ: তাঁর আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা পরিহার করা। যারা তাঁর আনুগত্য করে, তারা জড় জগতকে অপছন্দ করে এবং পরকালকে ভালবাসে। আর যারা তাঁর নাফরমানি করে, তারা দুনিয়াকে ভালোবেসে এবং পরকালকে অপছন্দ করে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো

একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঈমানের নিদর্শন হল যে, যে তাঁর সমালোচনা করে এবং সত্যের ভিত্তিতে তাঁর প্রশংসা করে সে যেন তাঁর কাছে সমান হয়।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয়

জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ যখন একজন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি অন্যদেরও তাকে ভালোবাসেন। এবং যখন তিনি একজন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি অন্যদেরও তাকে ঘৃণা করেন। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে তার সাথে থাকা লোকদের সাথে তার মর্যাদা যাচাই করে মহান আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা পরীক্ষা করা উচিত।

সহীহ মুসলিম, 7432 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বান্দাকে ভালবাসেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তাকওয়া। এর অর্থ হল তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে এবং তারা তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন এই পৃথিবীতে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃষ্টি থেকে স্বাধীন হওয়া। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের উচিত তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের শারীরিক শক্তি যেমন মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। তাদের অলস আচরণ করা উচিত নয় এবং মানুষের কাছ থেকে জিনিসগুলি চাওয়া উচিত নয় কারণ এই অভ্যাস তাদের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা কমিয়ে দেয়। একজনকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে যা কিছুই ঘটুক না কেন তাদের জন্য তাদের রিজিক বরাদ্দ করা হয়েছিল আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলমানের উচিত তাদের প্রচেষ্টার উপর মনোনিবেশ

করা এবং বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য যা সর্বোত্তম তা দেবেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে বেনামী। এর অর্থ হল একজন মুসলমানের খ্যাতি অর্জনের জন্য জাগতিক বা ধর্মীয় বিষয়ে সংগ্রাম করা উচিত নয়। যেহেতু এটি প্রদর্শনের মতো অনেক পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি শুধুমাত্র একজনের পুরস্কারকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে খ্যাতি অন্বেষণ করা একটি ভেড়ার পালের উপর ছেড়ে দেওয়া দুটি নেকড়ের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত তাদের কর্তব্য পালনের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং যদি তারা বিখ্যাত হয়ে যায় তবে তাদের উচিত মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য পরিবর্তন না করে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখা উচিত কারণ এটি উভয় জগতের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

একটি সুন্দর উপদেশ - 5

উমর ইবনে খাত্তাব, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, জনসাধারণের কাছে মার্জিত, সুনির্দিষ্ট এবং দরকারী উপদেশ দিতেন, উভয় জগতের সাফল্য এবং শান্তির দিকে তাদের আহ্বান জানাতেন। সা'দ ইবনে আবী ওয়াকাসকে ইরাকে পাঠানোর পর, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নলিখিত খুতবা দেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়, খণ্ড 2, পৃষ্ঠা 149-এ আলোচনা করা হয়েছে। -150।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কিছু জানে সে যেন তা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করার চেষ্টা করতে হবে কারণ কর্ম ছাড়া জ্ঞানের কোন মূল্য বা উপকার নেই। এটি সেই ব্যক্তির মতো যার নিরাপত্তার পথ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না এবং পরিবর্তে বিপদে পূর্ণ এলাকায় অবস্থান করে। এই কারণেই জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর আমল করে, যা তাকওয়া এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার মহান আল্লাহর প্রতি কারো আনুগত্য বৃদ্ধি করবে না, প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবল তাদের অহংকার বৃদ্ধি করবে যে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা এমন গাধার মত যা বই বহন করে যা উপকারী নয়। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...অতঃপর তা গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) এমন একটি গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে... "

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে মৃত্যুকে স্মরণ করে, মৃতদের কথা চিন্তা করে এবং ভালো কাজগুলোকে এগিয়ে পাঠিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার উপদেশ দেন।

মৃত্যু এমন একটি জিনিস যা ঘটবে নিশ্চিত কিন্তু সময়টি অজানা তাই এটি বোধগম্য হয় যে একজন মুসলিম যে পরকালে বিশ্বাস করে সে তার জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় যা ঘটতে পারে না, যেমন বিয়ে, সন্তান বা তাদের অবসর গ্রহণ। এটা আশ্চর্যজনক যে কত মুসলমান বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে যদিও তারা সাক্ষ্য দেয় যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত অথচ আখেরাত চিরস্থায়ী এবং তারা সেখানে পৌঁছানো নিশ্চিত। কেউ যেভাবে আচরণ করুক না কেন তাদের কাজের ব্যাপারে তাদের বিচার করা হবে। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা ভবিষ্যতে পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে পারে এবং করবে কারণ এই মনোভাব তাদের মৃত্যু ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত তাদের আরও বিলম্বিত করে এবং তারা অনুশোচনা নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় যা তাদের সাহায্য করবে না।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে মানুষ মারা যাবে কারণ এটি অনিবার্য, তবে মূল বিষয় হল এমনভাবে কাজ করা যাতে কেউ এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। এর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল ইসলামের শিক্ষার উপর

আমল করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ঘটতে না পারে এমন জিনিসগুলির জন্য প্রস্তুতির চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে যদি একজন ব্যক্তি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সন্তুষ্ট না হয় তবে কিছুই তাকে উপায়ের থেকে স্বাধীন বোধ করবে না।

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট। যে সর্বদা অধিক জাগতিক জিনিসের প্রয়োজন সে অভাবী, যা গরীবদের জন্য আরেকটি শব্দ, যদিও তারা অনেক সম্পদের অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কাছে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট সে অভাবী নয় এবং তাই তাদের কাছে সামান্য সম্পদ বা পার্থিব জিনিস থাকলেও সে ধনী।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন তাতে যে সন্তুষ্ট, তাকে অনুগ্রহ প্রদান করা হবে যা তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে এবং এটি তাদের মানসিক ও শারীরিক শান্তি প্রদান করবে। পক্ষান্তরে, যারা সন্তুষ্ট নয় তারা এই অনুগ্রহ লাভ করবে না যার ফলে তাদের মনে হবে যেন তাদের সম্পদ তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এটি তাদের মানসিক এবং শরীরের শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে, মহান আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তির জন্য যা পছন্দ করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্য। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিৎ, সর্বদা তার বান্দার জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন, এমনকি যদি তারা পছন্দের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যদি একজন মুসলিম সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করে, যেমন কঠিন সময়ে ধৈর্য্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা, তাহলে তাদের মানসিক শান্তি প্রদান করা হবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি যেন তার কাছে কোনো অভিযোগ আনেন। যদি তারা তা করতে না পারে তবে তাদের উচিত অভিযোগটি এমন কারও কাছে নিয়ে আসা উচিত যারা এটি তার কাছে পৌঁছে দিতে পারে এবং তিনি তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবেন।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও...”

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

অন্যদের সম্পর্কে চিন্তা

সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস (রা.) ইরাকে পৌঁছনোর আগে মহান সেনাপতি আল মুথান্না ইবনে হারিথা (রা.) তার পূর্ববর্তী যুদ্ধের ব্যাপক ক্ষত থেকে মারা যান। এমনকি তার মৃত্যুশয্যায়ও তার উদ্বেগ ছিল মুসলিম সৈন্যদের নিরাপত্তার জন্য কারণ তিনি সা'দ, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য কিছু কৌশলগত পরামর্শ রেখে গেছেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 150-151-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের

প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

একটি বুদ্ধিমান উপদেশ

উমর ইবনে খাত্তাব অবশেষে সাদ ইবনে আবি ওয়াকাসকে নির্দেশ দেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে ইরাকের দিকে রওনা হন যেখানে তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমান্তে। তিনি তাকে নিম্নলিখিত পরামর্শও পাঠিয়েছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 152-155-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এবং তাঁর সাথে থাকা সৈন্যদের সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ এটি শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বোত্তম অস্ত্র এবং যুদ্ধের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে ভয় করে, সে তার সঙ্গ পাবে। যার সঙ্গ আছে সে ইহকাল বা পরকালে হারাতে পারে না। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 128:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকে ভয় করে..."

মহান আল্লাহকে ভয় করা, ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা ছাড়া অর্জন করা যায় না যাতে কেউ মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে, তাঁর

নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

জামে আত তিরমিযী, 2451 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত ধার্মিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা এমন কিছু এড়িয়ে চলে যা তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় যাতে সতর্কতা অবলম্বন করে যে এটি কিছুর দিকে নিয়ে যাবে। যা ক্ষতিকর। অতএব, তাকওয়ার একটি দিক হল এমন সব বিষয় এড়িয়ে চলা যা সন্দেহজনক নয় শুধু হারাম। কারণ সন্দেহজনক বিষয়গুলো একজন মুসলিমকে হারামের একধাপ কাছে নিয়ে যায় এবং হারামের কাছাকাছি যাওয়া তত সহজ হয়। এ কারণেই জামে আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি হারাম ও সন্দেহজনক জিনিসগুলি পরিহার করবে সে তাদের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করবে। সমাজে যারা বিপথগামী হয়েছে তাদের লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে এমনটি ঘটেনি ধীরে ধীরে। অর্থ, ব্যক্তিটি হারামের মধ্যে পড়ার আগে প্রথমে সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হয়েছিল। এই কারণেই ইসলাম একজন ব্যক্তির জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং নিরর্থক জিনিসগুলি এড়িয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় কারণ তারা তাদের হারামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অনর্থক এবং অনর্থক কথাবার্তা যা ইসলামের দ্বারা পাপী শ্রেণীভুক্ত নয়, তা প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত, মিথ্যা এবং অপবাদ। যদি কোন ব্যক্তি অনর্থক কথা না বলে প্রথম ধাপ এড়িয়ে চলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে মন্দ কথা পরিহার করবে। এই প্রক্রিয়াটি নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশেষত সন্দেহজনক সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এবং তাঁর সাথে থাকা সৈন্যদেরকে শত্রুকে এড়িয়ে চলার চেয়ে পাপ থেকে বাঁচতে বেশি সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ সেনাবাহিনীর পাপ তাদের শত্রুর চেয়ে বেশি ভয় পায়। মুসলমানরা তাদের শত্রুর অবাধ্যতা দ্বারা সমর্থিত হয় আল্লাহর প্রতি; তা না হলে তাদের কোনো শক্তিই থাকত না, কারণ মুসলমানদের সংখ্যা তাদের মতো নয় এবং মুসলমানদের অস্ত্রও তাদের মতো নয়। যদি উভয় পক্ষ পাপের ক্ষেত্রে সমানভাবে মিলিত হয় তবে তারা শক্তিতে মুসলমানদের উপর একটি সুবিধা পাবে। যদি মুসলমানরা তাদের উপর সদগুণে সুবিধা না করত, তাহলে মুসলমানরা তাদের শক্তি দিয়ে তাদের পরাজিত করতে পারবে না। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষাকারী রয়েছে যারা জানে যে তারা কী করছে (রেকর্ডিং ফেরেশতা), তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই তাদের সামনে লজ্জা বোধ করতে হবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতামূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। তার বলা উচিত নয় যে, শত্রু মুসলমানদের চেয়েও খারাপ এবং তাই মুসলমানরা পাপ করলেও তারা কখনো তাদের উপর বিজয়ী হবে না। একটি জাতি তাদের চেয়ে খারাপ অন্যদের দ্বারা পরাজিত হতে পারে, যেমন ইসরাঈলের সন্তানরা মুশরিকদের কাছে পরাজিত হয়েছিল যখন তারা এমন কাজ করেছিল যা মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছিল। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 5:

"...এবং তারা [এমনকি] গৃহগুলিতে অনুসন্ধান করেছিল, এবং এটি একটি প্রতিশ্রুতি ছিল।"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, s ins শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ছোট এবং বড় হিসাবে। সময়ের সাথে সাথে অনেক সংজ্ঞা একটি বড় পাপ ঠিক কি সম্পর্কে দেওয়া

হয়েছে. একটি সহজ শ্রেণীবিভাগ হল যে কোন পাপ যে শাস্তির জন্য ইসলাম ইসলামী সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে তা একটি বড় পাপ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ। আরেকটি শ্রেণীবিভাগ হল, যদি কোন পাপকে জাহান্নামের আগুন, মহান আল্লাহর ক্রোধ বা মহান আল্লাহর অভিশাপ উল্লেখ করা হয়, তবে তা একটি বড় গুনাহ। উদাহরণস্বরূপ, গীবত করা একটি বড় পাপ কারণ এটি পবিত্র কুরআনে অভিশপ্ত। অধ্যায় 104 আল হুমাজাহ, আয়াত 1:

" ধিক্ প্রত্যেক গীবতকারী, নিন্দুকের জন্য।"

কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র সাতটি বড় পাপের কথা বলা হয়েছে সহীহ বুখারীতে ২৭৬৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে এই সাতটি বড় গুনাহ হলেও এর মানে এই নয় যে তারা মাত্র সাতটি। প্রকৃতপক্ষে , অন্যান্য হাদিস রয়েছে যাতে অন্যান্য বড় গুনাহ যেমন পিতামাতার অবাধ্যতার কথা বলা হয়েছে। এই হাদিসটি সহীহ বুখারি, ৬২৭৩ নম্বরে পাওয়া যায়। পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদিসে ঘোষিত সাতটি বড় গুনাহ হল: শিরক, জাদু, একজন নিরপরাধকে হত্যা, আর্থিক স্বার্থের লেনদেন, এতিমের সম্পদ হস্তগত করা, যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন করা এবং একজন নিরপরাধ নারীকে অভিযুক্ত করা। ব্যভিচার

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে , যখন কেউ ছোটখাট পাপ করে থাকে তখন ইসলামের দৃষ্টিতে তা বড় হয়ে যায়।

বড় গুনাহ শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে মাফ করা হয় যেখানে বড় গুনাহ এড়িয়ে সৎ কাজ করার মাধ্যমে ছোট গুনাহগুলো মুছে ফেলা যায়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 31:

"তোমরা যদি বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকো যেগুলি থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ছোট গুনাহ দূর করে দেব..."

আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। উন্নত, এবং মানুষ.

মুসলমানদের নিশ্চিত করতে হবে তারা আকার নির্বিশেষে সব ধরনের পাপ এড়িয়ে চলে কারণ শয়তানের ফাঁদগুলির মধ্যে একটি হল সে মুসলমানদের ছোট পাপকে উপেক্ষা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। সব সময় মনে রাখতে হবে পাহাড় ছোট ছোট পাথর দিয়ে তৈরি।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তাদের সফরের সময় মুসলিম সৈন্যদের প্রতি সদয় আচরণ করার পরামর্শ দেন এবং তারা যেন ক্লান্ত না হয় যাতে তারা তাদের শত্রুর কাছে যাত্রা থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ তাদের শত্রু ভ্রমণ করেনি এবং শক্তিশালী ঘোড়া রয়েছে। এবং রাইডার

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

“অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকেও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তারা মুসলমানদের সাথে তাদের চুক্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত ছিল বলে শহরের কাউকে বিরক্ত করবেন না।

সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো

সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

আধ্যাত্মিক উপদেশ

উমর ইবনে খাত্তাব একবার ইরাক অভিযানের সময় সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখেছিলেন এবং তাকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়েছিলেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবনী ও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 160।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারির ৫২ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, কারো আধ্যাত্মিক হৃদয় সুস্থ থাকলে পুরো শরীর সুস্থ হয়ে যায় কিন্তু যদি তার আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয় তবে পুরো শরীরই সুস্থ হয়ে যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত

প্রথমত, এই হাদিসটি সেই মূর্খ বিশ্বাসকে খণ্ডন করে যেখানে কেউ তার কথা ও কাজ খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একটি শুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী বলে দাবি করে। কারণ ভিতরে যা আছে তা শেষ পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাবে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের পরিশুদ্ধি তখনই সম্ভব যখন কেউ নিজের থেকে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে এবং ইসলামী শিক্ষায় আলোচিত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে তাদের প্রতিস্থাপন করে। এটা তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাগুলো শিখে এবং তার উপর আমল করে যাতে তারা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে। তাকে। এইভাবে আচরণ করা একটি শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে পরিচালিত করবে। এই শুদ্ধিকরণ তখন শরীরের বাহ্যিক অঙ্গে প্রতিফলিত হবে, যেমন একজনের জিহ্বা এবং চোখ। অর্থ, তারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেবল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 6502 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধার্মিক বান্দার প্রতি ভালবাসার একটি চিহ্ন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই শুদ্ধি একজনকে সমস্ত জাগতিক অসুবিধার মধ্যে সফলভাবে পথ দেখাবে যাতে তারা পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্য অর্জন করতে পারে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তাঁর সৈন্যদের উপদেশ দিতে এবং তাদের ভালো উদ্দেশ্য এবং নিজেদের পরীক্ষা করার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মহান আল্লাহর সাহায্য একজনের ভালো উদ্দেশ্য অনুযায়ী আসে।

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর

মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। সহীহ বুখারির ১ নম্বর হাদিস অনুসারে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিচার করেন। একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত ধর্মীয় এবং দরকারী পার্থিব কর্ম সম্পাদন করে, যাতে তারা উভয় জগতে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করুন। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততাকে প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে কারণ তারা মনে করে যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি তাদের সন্তানদের মতো অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি সর্বদা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর তাঁর আশা রাখবেন।

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা একটি ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা

করবে। তার উপর। এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম থেকে। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, তার মধ্যস্থতায় কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে তখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদের শয়তান বিশ্বাস করে যে তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে

দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যে তাকে বিশ্বাস করে এবং তার আনুগত্য করার চেষ্টা করে যে তাকে অবিশ্বাস করেছিল। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

" আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

ঈমানের আহ্বান

উমর ইবনে খাত্তাব ইরাক অভিযানের সময় তার সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাকে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পারস্যের রাজার কাছে জ্ঞানী মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠাতে। যদিও রাজা তাদের সাথে অভদ্র এবং কঠোর ছিলেন তবুও তারা তাদের কথোপকথনে ভাল আচরণ এবং ভদ্রতা বজায় রেখেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 163-167-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের সৌন্দর্য পাওয়া যায়। অনেক হাদিসে যেমন সুনানে ইবনে মাজা, ৩৬৮৯ নম্বরে পাওয়া যায় এমন অনেক হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে এমনকি উল্লেখ করা হয়েছে যে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাঁর নম্রতা ও কোমল স্বভাবের কারণে সর্বদা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে স্নেহের সাথে চলতেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

" সুতরাং আল্লাহর রহমতে, [হে মুহাম্মদ], আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

আরবরা কঠোর হৃদয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কারণে শান্তি ও তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, তাদের মেজাজ অনেক সময় তাদের কঠিন হৃদয় গলে যেত এবং এইভাবে তারা গ্রহণ করত এই গুণটি এবং মানবজাতির বাকি পথ দেখানোর জন্য বীকন হয়ে উঠেছে । এ জন্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক, একটি হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4809 নম্বরে পাওয়া যায় যে, যে ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 103:

"... এবং তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর - যখন তোমরা শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়কে একত্রিত করেছিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই হয়ে গেলে..."

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায় তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট বার্তা। তাদের অবশ্যই কঠোর ধ্বংসাত্মক মানসিকতার পরিবর্তে একটি কোমল গঠনমূলক মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। তাদের উচিত জনগণকে একত্রিত করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে অন্যের উপকার করার চেষ্টা করা সমাজের মধ্যে বিতর্ক। একটি ভাল উদাহরণ এই তাদের সন্তানদের প্রতি একজনের মনোভাব দেখা যায়। যে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের প্রতি নম্র স্বভাব দেখিয়েছিলেন তারা দত্তক নেওয়া বাবা-মায়ের চেয়ে তাদের উপর অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। একটি কঠোর মেজাজ। প্রায়শই কেউ কেউ তাদের কঠোর মনোভাব দিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয় এবং এটি ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জ করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। উদাহরণস্বরূপ, একবার এক অশিক্ষিত বেদুইন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মসজিদে প্রস্রাব করে । যখন সাহাবায়ে কেরাম রা আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাকে শাস্তি দিতে চান মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা

এবং তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, তাদের নিষেধ করলেন এবং মসজিদে থাকার আদব বিদুইনকে আলতো করে ব্যাখ্যা করলেন। এই ঘটনাটি সুনানে ইবনে মাজাহ 529 নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে । এই নরম দৃষ্টিভঙ্গি লোকটিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেও উল্লেখ আছে। যেমন ফেরাউন নিজেকে সর্বোচ্চ প্রভু বলে দাবি করলেও তথাপি মহান আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-কে । উভয়, ফেরাউনকে আমন্ত্রণ জানানো না মৃদু এবং সদয় বক্তৃতা ব্যবহার করে নির্দেশনার দিকে। C hapter 79 An Naziat, আয়াত 24:

"এবং বললেন, "আমিই তোমার শ্রেষ্ঠ প্রভু।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 43-44:

"তোমরা দুজনেই ফেরাউনের কাছে যাও। নিঃসন্দেহে সে সীমালংঘন করেছে। এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

শিশুরা এমনকি পশুরাও ভদ্রতার ভাষা বোঝে। সুতরাং একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ইসলাম ও কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে কীভাবে সঠিক পথ দেখা যাবে না? এ কারণেই মহানবী সা এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সহীহ মুসলিম, 6601 নম্বরে পাওয়া যায় যে , আল্লাহ তায়ালা তিনি তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে দয়ালু এবং কোমল এবং সৃষ্টিকে একে অপরের সাথে নরম আচরণ করতে পছন্দ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক যারা শব্দ ছড়িয়ে ইসলামের ভুল বিশ্বাস গৃহীত হয়েছে যে কোমল হওয়া আমি দুর্বলতার লক্ষণ। এটা শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ সে মানবজাতিকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায় ।

ক্ষমতায়ন

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে একটি মুসলিম বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। এই বাহিনী ইরাকে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল, যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় খুতবা দিচ্ছিলেন। তাঁর খুতবার সময় তিনি এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেছিলেন, "হে সারিয়া, পাহাড়ে চলে যাও!" তিন বার। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সারিয়ার বাহিনী থেকে একজন দূত এসে মদীনাবাসীদের বললেন যে যুদ্ধের সময় তারা পরাজিত হচ্ছে যতক্ষণ না তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আওয়াজ শুনতে পায়, তাদেরকে পাহাড়ে যেতে বলে। যখন তারা তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করেছিল তখন তারা শত্রুকে পরাস্ত করেছিল। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 127-128-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সত্য যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, বহু মাইল দূরে যা ঘটছিল তা দেখেছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠ সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছেছিল তা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অলৌকিক ঘটনা। এই ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে অনুসরণ ও মেনে চলে।

সহীহ বুখারি নং 6502-এ পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর একটি ঐশী হাদিসে, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, যখন কেউ বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে এবং স্বেচ্ছায় সৎকর্ম সম্পাদনে চেষ্টা করে তখন তিনি তাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে বরকত দেন। যাতে তারা তার আনুগত্যের জন্য তাদের ব্যবহার করে। এই নেক

বান্দা খুব কমই পাপ করবে। দিকনির্দেশনার এই বৃদ্ধি 29 অধ্যায় আল আনকাবুত, 69 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

এই মুসলিম শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছে যা সহীহ মুসলিমের 99 নম্বর হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। এটি তখন হয় যখন একজন মুসলমান কাজ করে, যেমন নামায, যেন তারা মহান আল্লাহকে পালন করে। যারা এই স্তরে পৌঁছেছে সে তাদের মন ও শরীরকে পাপ থেকে রক্ষা করবে। এই সেই ব্যক্তি যে যখন তারা কথা বলে তারা মহান আল্লাহর জন্য কথা বলে, যখন তারা চুপ থাকে তারা মহান আল্লাহর জন্য নীরব থাকে। যখন তারা কাজ করে তখন তারা তার জন্য কাজ করে এবং যখন তারা এখনও থাকে তারা তার জন্য। এটি একেশ্বরবাদের একটি দিক এবং মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝা।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, এই মুসলিমের দোয়া পূর্ণ হবে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যারা হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করে তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট শিক্ষা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাদের প্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত নয়। কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষক বা অন্য কেউ একজন ব্যক্তিকে জিনিস প্রদান করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে এবং সেগুলি অর্জন করার জন্য তাদের ভাগ্য থাকে।

এই হাদিসটি উপসংহারে বলতে গেলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য কেবলমাত্র তাঁর নির্দেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং নিয়তের প্রতি ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ এবং উভয় জগতের সফলতার একমাত্র পথ।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ

দৃঢ় অবশিষ্ট

মহান আল্লাহ, পারস্যদের বিরুদ্ধে প্রধান যুদ্ধের সময় মুসলমানদের বিজয় দান করেছিলেন: আল কাদিসিয়ার যুদ্ধ। মুসলমানদের সংখ্যা চার থেকে এক ছিল এবং তাদের সম্পদ কম ছিল তবুও সাদ ইবনে আবি ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে তারা বিজয় না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে অবিচল ছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 200-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি

ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার

অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

সত্যিই ধনী

আল কাদিসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নোক্ত খুতবা দেন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 203-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে। .

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে বলেছিলেন যে, তিনি তাদের কোনো প্রয়োজন পূরণ না করে রেখে যেতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি সকলের জন্য সমান হতে চান এবং প্রত্যেকের বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে চান। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি এমন একজন রাজা নন যিনি মানুষকে দাসত্ব করেন, বরং তিনি মহান আল্লাহর দাস ছিলেন, যাকে একটি আমানত দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি যদি জনগণের সম্পদ থেকে দূরে থাকেন এবং জনগণের জন্য ব্যয় করেন তবে তিনি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবেন। কিন্তু যদি সে সম্পদ নিজের জন্য রাখে, তবে তার একটি স্বল্পস্থায়ী আনন্দ থাকবে যা দীর্ঘ আযাব দ্বারা অনুসরণ করবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি জাগতিক জিনিসগুলিকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সহীহ বুখারির ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, দুনিয়ার ধনী ব্যক্তিরা পরকালে গরীব হবে যদি না তারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করে তবে এই লোক সংখ্যায় অল্প। .

এর অর্থ এই যে, অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ ভুলভাবে ব্যয় করে, অর্থাৎ হয় নিরর্থক জিনিসের জন্য যা তাদের আখিরাতে কোন উপকার করে না, অথবা তারা এমন পাপ কাজে ব্যয় করে যা উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় অথবা তারা ব্যয় করে। ইসলামের অপছন্দের মত হালাল জিনিসের উপর যেমন অপব্যয় বা অযথা। এসব কারণে বিচারের দিন ধনীরা গরীব হয়ে যাবে কারণ তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং এমনকি তাদের উপর শাস্তিও দেওয়া হবে।

উপরন্তু, যারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পদ তাদেরকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাই তারা পরকালে খালি হাতে গরিব হিসেবে পৌঁছাবে। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি তার জন্য দায়বদ্ধ থাকা অবস্থায় অন্যদের ভোগের জন্য সম্পদ রেখে যাবে।

পরিশেষে, ধনীরা যেমন তাদের সম্পদ অর্জন, মজুদ, রক্ষা এবং বৃদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, এটি তাদের সৎ কাজ করা থেকে বিভ্রান্ত করে যা বিচার দিবসে কাউকে ধনী করে তোলে। বাস্তবে, এটিকে হারানো তাদের দরিদ্র করে তুলবে।

এটা মনে রাখা জরুরী, সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করা মানে শুধু দাতব্য দান করা নয় বরং এর মধ্যে অযথা বা অপব্যয় না করে তাদের প্রয়োজনীয় এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এই ব্যক্তি দুনিয়া ও পরকালে ধনী হবে। এবং এই মনোভাব অনেক সম্পদ থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। যেকোন পরিমাণ সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একজন ব্যক্তি ধনী হতে পারে যদিও তার কাছে সামান্য সম্পদ থাকে। বাস্তবে, এই ব্যক্তি তাদের সম্পদ তাদের সাথে পরকালে নিয়ে যায় এবং এই মনোভাব তাদের অবসর সময় দেয় যা তাদেরকে সৎ কাজ করতে দেয় যা পরকালে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

সত্যের অনুসরণ

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে যে কেউ তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কাজ করবে, সে ক্ষতি করবে এবং কেবল নিজের ক্ষতি করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করে এবং আইন-কানুন মেনে চলে এবং সঠিক পথের অনুসরণ করে, যা মহান আল্লাহর কাছে রয়েছে, সে ভালো করেছে এবং বিজয়ী হবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 203-204-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই উপদেশ একজনকে দৃঢ়ভাবে নির্দেশনার দুটি উৎসকে মেনে চলতে এবং অনুসরণ করতে উৎসাহিত করে।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আন্তরিকতা।

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত

তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। আন্তরিক মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত, যা সুনানে আবু দাউদ, ১৩৪২ নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা, নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে।

কোন ছাড় নেই

উমর ইবনে খাত্তাব সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস রা.-এর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যেটি ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 205 এ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ দুটি বিষয় ছাড়া কিছু পরিস্থিতিতে ছাড়ের অনুমতি দিয়েছেন: ন্যায়বিচার এবং মহান আল্লাহর স্মরণ। মহান আল্লাহর স্মরণের জন্য কোন ছাড় নেই এবং তিনি এর প্রচুর পরিমাণ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন না।

সহীহ বুখারির ৬৪০৭ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না তাদের মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তির মতো। একটি মৃত ব্যক্তি।

মুসলমানদের জন্য যারা মহান আল্লাহর সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ তৈরি করতে চায়, যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে যতটা সম্ভব সফলভাবে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে তার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। সহজ কথায়, তারা যত বেশি তাকে স্মরণ করবে ততই তারা এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবে।

মহান আল্লাহর স্মরণের তিনটি স্তরে কার্যত আমল করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। প্রথম স্তর হল মহান আল্লাহকে অন্তরে ও নীরবে স্মরণ করা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের উদ্দেশ্য সংশোধন করা যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে। দ্বিতীয়টি হল জিহ্বা দ্বারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করা। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে বন্ধন দৃঢ় করার সর্বোচ্চ ও কার্যকরী উপায় হল কার্যতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা। তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে এটি অর্জন করা হয়। এর জন্য একজনকে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে হবে যা উভয় জগতের সকল কল্যাণ ও সাফল্যের মূল।

যারা প্রথম দুই স্তরে থাকবে তারা তাদের নিয়তের উপর নির্ভর করে পুরষ্কার পাবে কিন্তু তারা আল্লাহর স্মরণের তৃতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই।

এই পর্যায়গুলি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ দুটি বিষয় ছাড়া কিছু পরিস্থিতিতে ছাড়ের অনুমতি দিয়েছেন: ন্যায়বিচার এবং মহান আল্লাহর স্মরণ। ন্যায়বিচারের জন্য কোন ছাড় নেই, তা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে হোক বা কষ্টের সময়ে। ন্যায়বিচার নরম দেখালেও তা অন্যায়ের চেয়ে শক্তিশালী এবং অন্যায়ের চেয়ে মিথ্যাকে দূর করতে সক্ষম।

সহীহ মুসলিম, 4721 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, যারা ন্যায়ের সাথে কাজ করবে তারা বিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকটে আলোর সিংহাসনে বসে থাকবে। এটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা তাদের পরিবার এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এবং কর্তৃত্বের অধীনে তাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে।

মুসলমানদের জন্য সব সময়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতে হবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। তাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রদত্ত সকল নেয়ামত ব্যবহার করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য ও বিশ্রামের অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করে তাদের নিজের শরীর ও মনের প্রতি শুধু থাকা। ইসলাম মুসলমানদের তাদের শরীর ও মনকে তাদের সীমার বাইরে ঠেলে দিতে শেখায় না যার ফলে তাদের নিজেদের ক্ষতি হয়।

অন্যদের দ্বারা তারা যেভাবে আচরণ করতে চায় সেরকম আচরণ করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য মানুষের প্রতি অবিচার

করে ইসলামের শিক্ষার সাথে তাদের কখনই আপোষ করা উচিত নয়। এটি হবে মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের একটি প্রধান কারণ যা সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের থাকা উচিত এমনকি যদি এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। একজন ধনী হোক বা গরীব, আল্লাহ উভয়েরই অধিক যোগ্য। [1] তাই [ব্যক্তিগত] প্রবণতার অনুসরণ করো না, পাছে তুমি ন্যায়পরায়ণ না হও..."

ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে একজনকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত হতে হবে যা সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাদের অবহেলা করা উচিত নয় এবং স্কুল ও মসজিদের মতো অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়। শিক্ষক একজন ব্যক্তির এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয় যদি তারা তাদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে খুব অলস হয়।

উপসংহারে বলা যায়, কোন ব্যক্তিই ন্যায়বিচারের সাথে মুক্ত নয় কারণ ন্যূনতম হল আল্লাহ, মহান এবং নিজের প্রতি ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা।

উপেক্ষা ত্রুটি

ইরাক অভিযানের সময়, আল কাদিসিয়ার সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ পর্যন্ত, যেগুলি মুসলমানদের এই শহরগুলি পুনরুদ্ধার করার অনুমতি দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও, প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসা অনেক শহরই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। উমর ইবনে খাত্তাব, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হয় মুসলিম কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী লোকদের ক্ষমা করতে, যদি তিনি তাদের অনুশোচনায় নিশ্চিত হন, অথবা তাদের নিরাপদ স্থানে নিরাপদে যাওয়ার অনুমতি দেন, যদি যে কোন কারণে সে তাদের অবিশ্বাস করেছিল। কিন্তু তিনি কাউকে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে দেননি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 205-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহিহ বুখারি, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কখনও নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি বরং ক্ষমা এবং উপেক্ষা করেছেন।

মুসলমানদেরকে আনুপাতিক এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যখন তাদের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের কখনই লাইনের উপরে পা দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একটি পাপ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 190:

“আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

যেহেতু চিহ্ন অতিক্রম করা এড়ানো কঠিন একজন মুসলমানের তাই ধৈর্য ধরে রাখা উচিত, অন্যকে উপেক্ষা করা এবং ক্ষমা করা উচিত কারণ এটি কেবলমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য নয়, বরং মহান আল্লাহর দিকেও নিয়ে যায়, তাদের পাপ ক্ষমা করা। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

অন্যদের ক্ষমা করাও অন্যের চরিত্রকে ইতিবাচক উপায়ে পরিবর্তন করতে আরও কার্যকর যা ইসলামের উদ্দেশ্য এবং মুসলমানদের উপর একটি কর্তব্য কারণ প্রতিশোধ নেওয়া শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও শত্রুতা এবং ক্রোধের দিকে নিয়ে যায়।

পরিশেষে, যাদের অন্যকে ক্ষমা না করার বদ অভ্যাস আছে এবং সর্বদা ছোটখাটো বিষয় নিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে, তারা হয়তো দেখতে পাবে যে, মহান আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন না এবং বরং তাদের প্রতিটি ছোট-

খাটো পাপ যাচাই করেন। একজন মুসলিমের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া শিখতে হবে কারণ এটি উভয় জগতে ক্ষমা এবং মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

সত্যবাদিতার সাথে নেতৃত্ব দেওয়া

যখন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইরাক অভিযান থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লুণ্ঠন পাঠানো হয়েছিল, তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে যে লোকেরা এটি তার কাছে পাঠিয়েছিল তারা সৎ ছিল, অর্থাত্ যদি তারা অসৎ হত তবে তারা তা রাখত। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, তিনি যেমন সৎ ছিলেন, তেমনি জনগণও সৎ ছিল এবং তিনি যদি অসৎ হতেন তাহলে মানুষ অসৎ হয়ে যেত। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 223-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল মুসলমানের জন্য, বিশেষ করে পিতামাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তারা অন্যদেরকে যা পরামর্শ দেয় তার উপর আমল করা। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা তাদের প্রচারের উপর কাজ করেছিল তারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল যারা উদাহরণ দিয়ে নেতৃত্ব দেয়নি। সর্বোত্তম উদাহরণ হ'ল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি কেবল যা প্রচার করেছিলেন তা অনুশীলন করেননি বরং সেই শিক্ষাগুলি অন্য কারও চেয়ে কঠোরভাবে মেনে চলেন। শুধুমাত্র এই মনোভাবের সাথে মুসলমানদের বিশেষ করে, পিতামাতারা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন মা তার সন্তানদের মিথ্যা না বলার জন্য সতর্ক করে কারণ এটি একটি পাপ কিন্তু প্রায়শই তাদের সামনে মিথ্যা বলে তার সন্তানরা তার পরামর্শে কাজ করার সম্ভাবনা কম। একজন ব্যক্তির কর্ম সবসময় তার বক্তব্যের চেয়ে অন্যদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে পরামর্শ দেওয়ার আগে একজনকে নিখুঁত হতে হবে। এর অর্থ হল অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার

জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই আচরণকে ঘৃণা করেন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ দেয় কিন্তু নিজে তা থেকে বিরত থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে সে নিজেই তার উপর আমল করে। কঠিন শাস্তি জাহান্নামে. অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

তাই সকল মুসলমানের জন্য তাদের উপদেশের উপর নিজে আমল করার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক এবং অন্যদেরকেও তা করার পরামর্শ দেওয়া। দৃষ্টান্ত দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়া হল সমস্ত নবী-রাসূলগণের ঐতিহ্য, এবং অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সর্বোত্তম উপায়।

সরলতা

ইরাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের পর, পারস্যের সেনাবাহিনীর প্রধান আল হরমুজান এই শর্তে আত্মসমর্পণ করেছিলেন যে তাকে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা মদিনায় পৌঁছায়, আল হরমুজানকে তার স্বাভাবিক দামী কাপড় এবং মুকুট পরিধান করা হয়েছিল যাতে লোকেরা তাকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পারে। যখন তারা মদিনায় প্রবেশ করল তখন তারা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পেল যে, তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদের মেঝেতে ঘুমাচ্ছেন। আল হরমুজান হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি দেখেছিলেন যে তিনি কোনও প্রহরী বা দারোয়ান দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন না এবং একটি সাধারণ জীবনযাপন করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জেগে ওঠা এবং আল হরমুজান পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি মন্তব্য করেন যে, মানুষকে অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে এবং এই জড় জগতের দ্বারা প্রতারিত হতে হবে না। এটা সব প্রতারণা. ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 228-232-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 4118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে সরলতা ঈমানের অঙ্গ।

ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ এবং বৈধ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে শেখায় না বরং এটি তাদের জীবনের সমস্ত দিক যেমন তাদের খাদ্য, পোশাক,

বাসস্থান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ জীবনধারা গ্রহণ করতে শেখায়, যাতে এটি তাদের অবসর সময় দেয়। পরকালের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিন। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এই সরল জীবন মানেই এই দুনিয়ায় নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করা, অতিরিক্ত অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই।

একজন মুসলমানের বোঝা উচিত যে তারা যত সহজ জীবন যাপন করবে তত কম তারা পার্থিব জিনিসের উপর চাপ দেবে এবং তাই তারা তত বেশি পরকালের জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে, মানসিক, শরীর এবং আত্মার শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির জীবন যত বেশি জটিল হবে তারা তত বেশি চাপ দেবে, অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং তাদের পরকালের জন্য কম চেষ্টা করবে কারণ পার্থিব বিষয় নিয়ে তাদের ব্যস্ততা কখনই শেষ হবে বলে মনে হবে না। এই মনোভাব তাদের মন, শরীর ও আত্মার শান্তি পেতে বাধা দেবে।

সরলতা এই পৃথিবীতে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন এবং বিচার দিবসে একটি সরল সামনের হিসাব নিয়ে যায়। অথচ, একটি জটিল ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন শুধুমাত্র একটি চাপপূর্ণ জীবন এবং বিচার দিবসে কঠিন ও কঠিন হিসাব-নিকাশের দিকে নিয়ে যাবে।

বিশ্বাসঘাতকতা পরিহার করা

ইরাক অভিযানের সময় জুনদাইসাবুর বিজয় হয়েছিল। কিছু যুদ্ধের পর, মুসলমানরা শহরের দরজা খুলে দেওয়া এবং সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম যেমন তাদের ভেড়া চরাতে চলে যাওয়া দেখে অবাক হয়ে যায়। তাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, তারা মুসলমানদের বলে যে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে শান্তি চুক্তি পেয়েছে এবং তারা তাতে সম্মত হয়েছে। মুসলিম নেতা এ ধরনের কোনো চুক্তি পাঠাননি কিন্তু তার সৈন্যদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে তারা দেখতে পান যে তাদের মধ্যে একজন, যে জুন্দাইসাবুরের ক্রীতদাস ছিল, তাদের কাছে শান্তি চুক্তি পাঠিয়েছে। জুনদাইসাবুরের লোকেরা জোর দিয়েছিল যে তারা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি চুক্তি পেয়েছিল এবং তা গ্রহণ করেছিল এবং তাই মুসলমানদের এটিকে বহাল রাখা কর্তব্য ছিল। মুসলিম নেতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখেছিলেন, যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে এবং তিনি তাদের চুক্তিটি মেনে নিতে আদেশ করেছিলেন যে একজন ব্যক্তি যদি তারা তাদের চুক্তিগুলি পূরণ না করে তবে আন্তরিক হবেন না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 233-234-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো

পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

সফলতার পরীক্ষা

পারস্য সাম্রাজ্য জয়ের পর, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পারস্যের রাজা চোসরোসের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সহ যুদ্ধের গনীমত থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ পাঠানো হয়েছিল। এটি পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি মন্তব্য করেন যে, মহান আল্লাহ পার্থিব সাফল্য এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে লাভের এই ধরনের প্রাপ্তি ঠেকিয়ে রেখেছেন, যদিও তারা উভয়েই আরও বেশি ছিলেন। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর চেয়েও প্রিয়। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, এটি তার জন্য একটি পরীক্ষা। তিনি অঝোরে কাঁদলেন এবং গনীমতের মাল গরীবদের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ দিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 234-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছিলেন যে তিনি মুসলিম জাতির জন্য দারিদ্রকে ভয় করেন না। পরিবর্তে তিনি ভয় করেছিলেন যে পৃথিবী তাদের জন্য প্রাপ্ত করা সহজ এবং প্রচুর হয়ে উঠবে। এর ফলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করবে যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে কারণ এই একই প্রতিযোগিতা পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছিল।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি শুধুমাত্র সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই সতর্কবার্তাটি মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সমস্ত দিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব এবং একজনের জীবনের সামাজিক দিক যেমন পরিবার, বন্ধুবান্ধব

এবং পেশার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। যখনই কেউ এই জিনিসগুলি অনুসরণ করে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্য রাখে, যদিও সেগুলি হালাল হলেও, তাদের প্রয়োজনের বাইরে এটি তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে বিভ্রান্ত করবে। এটা তাদের খারাপ চরিত্রের দিকে নিয়ে যাবে যেমন অপব্যয় ও অসংযত হওয়া এবং এমনকি এই জিনিসগুলি পাওয়ার জন্য তাদের পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এগুলি পেতে ব্যর্থ হলে অধৈর্যতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতার অন্যান্য কাজ হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে এই আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক মুসলমানের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে কারণ তারা এই জিনিসগুলি যেমন সম্পদ অর্জন করার জন্য বা ছুটিতে যাওয়ার জন্য আনন্দের সাথে মধ্যরাতে উঠবে কিন্তু স্বেচ্ছায় রাতের প্রস্তাব দেওয়ার পরামর্শ দিলে তা করতে ব্যর্থ হবে। নামাজ বা জামাতের সাথে মসজিদে সকালের ফরজ নামাজে অংশ নেওয়া।

এই জিনিসগুলি অর্জনে কোন ক্ষতি নেই যতক্ষণ না এগুলি একজন ব্যক্তির প্রয়োজন এবং তার নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি যখন এর বাইরে চলে যায় তখন তারা তাদের আখেরাতের ক্ষতির বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কারণ একজন ব্যক্তি যত বেশি তাদের কামনা-বাসনাকে অনুসরণ করবে ততই তারা পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য কম চেষ্টা করবে। আর তাই তাদের জন্য এই হাদীসে প্রদত্ত সতর্কবাণী প্রযোজ্য হবে।

সহজ মাধ্যমে পরীক্ষা

পারস্য সাম্রাজ্য জয়ের পর, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহ তাদের জমি, বাড়িঘর এবং সম্পদ দান করেছেন, দেখার জন্য তারা এর সাথে কী করবে। অতএব, তাদের অবশ্যই তাঁর আদেশগুলি মেনে চলতে হবে এবং তারপর তিনি তাদের সাথে তাঁর চুক্তি পূর্ণ করবেন। তিনি তাদের পরিবর্তন না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন, অন্যথায় মহান আল্লাহ তাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন অন্য কোনো সম্প্রদায়। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, মুসলিম জাতির খারাপ কিছু ঘটলে তা হবে মুসলমানদের পরিবর্তনের কারণে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 251-252-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমানরা প্রায়শই মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়ায়, যেমন জামাতে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়া বা অসুবিধার সময়ে আরও আধ্যাত্মিক অনুশীলন করা। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তারা প্রায়ই শিথিল হয় এবং অলস হয়ে যায়। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সাধারনত কঠিন সময়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সতর্ক থাকা এবং নিজের আনুগত্য বৃদ্ধি করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ এই যে, একজন ব্যক্তি প্রায়শই অসুবিধার চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পাপ করে থাকে, যেমন তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ত্যাগ করা। যদি কেউ ইতিহাসের বিভিন্ন বিপথগামী ব্যক্তিদের যেমন ফেরাউন এবং কুরুনের পর্যালোচনা করে দেখেন যে তাদের পাপ কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েই বহুগুণ বেড়ে যায়। যে কেউ একটি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে যেখানে তারা আটকে আছে এবং ধৈর্য ধরে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের পাপের সম্ভাবনা কম কারণ তারা তাদের অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে চায়। যদিও, একজন ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের

সময়গুলি উপভোগ করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন এবং জাগতিক জিনিসগুলিতে লিপ্ত হবেন যা প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, দারিদ্র্যের সম্মুখীন একজন ব্যক্তির পাপের সম্ভাবনা কম কারণ অনেক পাপের জন্য সম্পদের প্রয়োজন হয়। যদিও, একজন ধনী ব্যক্তি সেই পাপগুলি করার জন্য সহজ অবস্থানে থাকে, যেমন অ্যালকোহল বা ড্রাগ কেনা। তাই মুসলমানদের উচিত এই বিষয়টি খেয়াল রাখা এবং নিশ্চিত করা যে তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখে বা বৃদ্ধি করে যাতে তারা পাপ ও অবাধ্যতায় না পড়ে।

উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে, সে তাদের কঠিন সময়ে মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করবে যা তাদের সফলভাবে অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। . অধ্যায় 47 মুহাম্মদ, আয়াত 7:

"হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সমর্থন কর, তবে তিনি তোমাদের সমর্থন করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে রোপণ করবেন।"

ইচ্ছা অনুসরণ

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর এক ছেলের কাছে গোশত খেতে প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে পুত্র উত্তর দেয় যে তিনি এটি পছন্দ করছেন তাই তিনি এটি নিজের জন্য কিনেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মন্তব্য করেন যে, একজন ব্যক্তির জন্য যা ইচ্ছা ছিল তা খাওয়াই যথেষ্ট। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা পৃষ্ঠা ১৩২-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ইসলাম একজনকে বৈধ ইচ্ছা পূরণের অনুমতি দেয় তবুও এই ঘটনাটি এই মনোভাবের উপর অবিচল না থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করে কারণ এটি প্রায়শই পাপের দিকে নিয়ে যায়।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, যা এই মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করে এবং জামি আত তিরমিযী, 1205 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি সতর্ক করে যে কেউ যখন একটি নিষিদ্ধ অঞ্চলের কাছাকাছি যাত্রা করে, যদিও তারা তারা এখনও একটি বৈধ এলাকায় আছে, একটি সময় আসতে পারে যখন তারা একটি ভুল পদক্ষেপ নেয় এবং নিষিদ্ধ অঞ্চলে শেষ হয়। এটি সেই ব্যক্তির মতো যে অন্যদের সাথে সময় কাটায় যারা নিজে ধূমপান না করলেও ধূমপান করে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ধূমপান তাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হবে যা তাদের ধূমপায়ী হওয়ার এক ধাপ কাছাকাছি।

একইভাবে, যখন কেউ অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসগুলিতে অতিরিক্ত লিপ্ত হয় তখন তারা হারাম জিনিসের কাছাকাছি চলে যায় যেমন সম্পদের অপচয়। আর সময়ের সাথে সাথে যে হারাম কাজগুলো করা তাদের কাছে অকল্পনীয় মনে হতো তা তাদের চোখে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তারপর তারাও সেইসব হারাম কাজ করার আগ পর্যন্ত সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এই কারণেই মুসলমানদের জন্য অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা জরুরী যদিও তারা বৈধ হলেও এই মনোভাব দীর্ঘমেয়াদে তাদের ঈমান ও সম্মান রক্ষা করবে যা পূর্বে উদ্ধৃত হাদিস ঘোষণা করেছে।

অসম্মতি সম্মত হন

উমর ইবনে খাত্তাব এবং উসমান ইবনে আফফান, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, একবার একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে তর্ক করতে দেখা গেছে যতক্ষণ না একজন দর্শক মন্তব্য করেন যে তারা কখনই চুক্তিতে পৌঁছাবেন না। তবুও দু'জন শুধুমাত্র সেরা এবং সবচেয়ে সুন্দর শর্তে আলাদা হয়ে গেছে। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৫০-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তারা এই পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল কারণ তারা কেবল সত্যের কাছে নতি স্বীকার করে। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করে তখন তারা অন্য কারো জন্য তাদের হৃদয়ে খারাপ অনুভূতি বহন করে না।

উপরন্তু, তারা যাদের সাথে তর্ক করে তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে শেখার মাধ্যমে কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করতে পারে।

যেহেতু সমস্ত মানুষকে একইভাবে সৃষ্টি করা হয়নি, তারা কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য। ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং হালাল এবং হারাম জিনিসগুলির মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়গুলিতে একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে হবে, তা সেগুলির সাথে চ্যালেঞ্জ বা দ্বিমত নির্বিশেষে। কিন্তু যেসব বিষয়ে বৈধ পার্থিব বিকল্পগুলির মধ্যে একটি বেছে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে একজন মুসলমান অন্যদের কাছে অনুরোধ করার সময় তাদের

মতামত দেওয়ার অধিকারী। কিন্তু অন্যরা তাদের মতামতের সাথে একমত না হলে তাদের সময় নষ্ট করা বা চাপ দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ এই মতবিরোধকে ধরে রাখে সময়ের সাথে সাথে তারা মানুষের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে পারে যা ভাঙা এবং ভাঙা সম্পর্ক হতে পারে। এর ফলে মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপও হতে পারে। সুতরাং এই ধরনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে যেতে দেওয়া এবং তাদের মতামত এবং পছন্দের সাথে একমত না এমন কারো প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ না করা। এর পরিবর্তে তাদের উচিত অসম্মতিতে সম্মত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে চাপ দেওয়া এবং কোনো অসুস্থ অনুভূতি ছাড়াই পরিস্থিতি থেকে এগিয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি এটি করতে ব্যর্থ হয় সে নিজেকে সর্বদা তর্ক করতে এবং অন্যদের জন্য শত্রুতা পোষণ করে কারণ তারা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং মানসিকতার পার্থক্যের কারণে নির্দিষ্ট বিষয় এবং বিষয়ে অন্যদের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে বাধ্য। এই উপদেশ বোঝা এবং তার উপর কাজ করা এই পৃথিবীতে শান্তি খুঁজে পাওয়ার একটি শাখা।

ঈমানের চর্চার গুরুত্ব

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার একটি খড় কুড়াতে এবং মন্তব্য করতে দেখা গেছে যে তিনি এই খড় হতে চান, তিনি চান যে তিনি কিছুই না এবং তিনি চান যে তার মা তাকে কখনও জন্ম না দেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ১৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি মহান আল্লাহর প্রতি গভীর ভয়ের ইঙ্গিত দেয়, উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। এই ভয়ের একটি দিক ছিল তার উপলব্ধি যে, তিনি যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি দুনিয়া ও পরকালে সফল হতে পারবেন না।

কুফরী হতে পারে ইসলামকে আক্ষরিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা বা কর্মের মাধ্যমে, যার মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করা জড়িত, যদিও কেউ তাকে বিশ্বাস করে। এটি একটি উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি একজন অসচেতন ব্যক্তিকে অন্য একটি সিংহের কাছ থেকে সতর্ক করা হয় এবং অসচেতন ব্যক্তি নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেয় তবে তারা এমন একজন বলে বিবেচিত হবে যিনি তাদের দেওয়া সতর্কবার্তায় বিশ্বাস করেছিলেন কারণ তারা সতর্কতার ভিত্তিতে তাদের আচরণকে মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, যদি অসচেতন ব্যক্তি সতর্ক করার পরে কার্যত তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে, তবে লোকেরা সন্দেহ করবে যে তারা তাদের প্রদত্ত সতর্কীকরণে বিশ্বাস করে না এমনকি যদি অসচেতন ব্যক্তিটি তাদের প্রদত্ত সতর্কতায় মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করে।

কিছু লোক দাবি করে যে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য তাদের অন্তরে রয়েছে এবং তাই তাদের বাস্তবিকভাবে এটি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই মূর্খ মানসিকতা অনেক মুসলমানকে সংক্রামিত করেছে যারা বিশ্বাস করে যে তারা বিশুদ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের অধিকারী যদিও তারা ইসলামের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যখন কারো অন্তর পবিত্র হয় তখন তার শরীর পবিত্র হয় যার অর্থ তার কর্ম সঠিক হয়। কিন্তু কারো হৃদয় কলুষিত হলে শরীর কলুষিত হয় যার অর্থ তাদের কাজ হবে কলুষিত ও ভুল। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে না, কার্যত তাদের কর্তব্য পালন করে সে কখনো বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হতে পারে না।

উপরন্তু, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করা বাস্তবিকভাবে তাদের প্রমাণ ও প্রমাণ যা বিচার দিবসে জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক প্রমাণ না থাকাটা একজন ছাত্রের মতোই নির্বোধ যে তার শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে তাদের জ্ঞান তাদের মনে আছে তাই তাদের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এটি লিখতে হবে না। নিঃসন্দেহে এই ছাত্রটিও একইভাবে ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য ব্যতিরেকে বিচার দিবসে উপনীত হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে, যদিও তাদের বিশ্বাস থাকে। তাদের হৃদয়

একজন আন্তরিক নেতা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এক আত্মীয় একবার তাঁকে সরকারি কোষাগার থেকে সম্পদ দিতে বললেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সমালোচনা করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি কি তাঁর জন্য মহান আল্লাহর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন, যখন তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক রাজা ছিলেন। অতঃপর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিজের সম্পত্তি থেকে তাঁকে সম্পদ দান করেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ১৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য এক অনুষ্ঠানে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি একজন বাদশাহ না খলিফা এবং যদি তিনি একজন রাজা হন তবে এটি (তার বিরুদ্ধে) একটি মহান বিষয়। দুজনের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে মন্তব্য করেছেন কেউ। একজন খলিফা কেবলমাত্র মানুষের কাছ থেকে যা প্রাপ্য (ইসলামী আইন অনুসারে) গ্রহণ করেন এবং তিনি এটিকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করেন, যা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছিলেন। অথচ একজন রাজা জনগণের সাথে অন্যায় আচরণ করে এবং অন্যায়ভাবে প্রজাদের সম্পত্তি হস্তগত করে এবং তা ভুলভাবে ব্যবহার করে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৪৪-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ধার্মিক পূর্বসূরিদের দিন থেকে কীভাবে জিনিসগুলি এত পরিবর্তিত হয়েছে তা লজ্জাজনক। তখনকার দিনে তারা নেতা হয়ে আসলে জনগণের সেবক হয়ে উঠেছিল এবং জনগণের অর্থ নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করে নিজেদের

ব্যক্তিগত অর্থ জনগণের জন্য ব্যয় করত। অথচ আজকাল নেতা ও রাজপরিবাররা জনগণের সম্পদ ব্যয় করে এমন আচরণ করে যেন তারাই জাতির মালিক।

মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরিদেরকে তাদের আদর্শ হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সকলের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে হবে যা একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই নয় যে তাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং তারপরে তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাদেরকে প্রথমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে এবং তারপর মানুষের অধিকার আদায় করতে হবে।

রাগ নিয়ন্ত্রণ

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি যখনই তাঁর পিতা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাগান্বিত হতে দেখেন তখনই তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং তাঁর রাগের উপর কাজ করা থেকে বিরত থাকতেন যখনই মহান আল্লাহ তাঁর কাছে উল্লেখ করা হয়েছে বা যখন তাঁর কাছে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করা হয়েছিল। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ১৩৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ব্যক্তিকে রাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই হাদিসটির অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তির কখনই রাগ করা উচিত নয় কারণ রাগ একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য যা এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। আসলে, কিছু বিরল ক্ষেত্রে রাগ উপকারী হতে পারে উদাহরণস্বরূপ, আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে। এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হল একজন ব্যক্তির উচিত তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে এটি তাকে পাপের দিকে নিয়ে না যায়। উপরন্তু, এই হাদিসটি দেখায় যে রাগ অনেক মন্দের দিকে নিয়ে যায় এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

প্রথমত, এই উপদেশ এমন সব ভালো বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার নির্দেশ যা একজনকে তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণে উৎসাহিত করবে, যেমন ধৈর্য। এই হাদিসটিও ইঙ্গিত করে যে একজন ব্যক্তি তার রাগ অনুযায়ী কাজ করবে না। পরিবর্তে, এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের নিজেদের সাথে লড়াই করা উচিত যাতে এটি তাদের পাপের দিকে নিয়ে না যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান কাজ এবং ঐশ্বরিক ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 134:

"...যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে - এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

ইসলামের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষা রয়েছে যা মুসলমানদের তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে উত্সাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, রাগ শয়তানের সাথে যুক্ত এবং অনুপ্রাণিত হওয়ায় সহীহ বুখারি, 3282 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন রাগান্বিত ব্যক্তিকে শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে একজন ক্ষুব্ধ মুসলিমকে মাটিতে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হতে পারে যে তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে সেজদা করবে। প্রকৃতপক্ষে, যত বেশি একজন নিষ্ক্রিয় শরীরের অবস্থান নেয় ততই তাদের রাগ করার সম্ভাবনা কম। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4782 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উপদেশের উপর কাজ করা একজনকে তাদের রাগকে নিজের মধ্যে বন্দী করার অনুমতি দেয় যতক্ষণ না এটি চলে যায় যাতে এটি অন্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত না করে।

একজন মুসলমান যে রাগান্বিত হয় তার উচিত সুনানে আবু দাউদ, 4784 নম্বরে পাওয়া হাদিসে দেওয়া উপদেশ অনুসরণ করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাগান্বিত মুসলমানকে অজু করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হল জল ক্রোধের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে কাউন্টার করে, তাপ। যদি কেউ তখন প্রার্থনা করে তবে এটি তাদের রাগকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি মহান পুরস্কারের দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করবে।

এ পর্যন্ত আলোচনা করা পরামর্শ একজন রাগান্বিত মুসলমানকে তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। কারো কথা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাগ হলে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। দুর্ভাগ্যবশত, শব্দগুলি প্রায়ই শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে অন্যদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। রাগের মাথায় বলা কথার কারণে অগণিত সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে। এই আচরণ প্রায়ই অন্যান্য পাপ এবং অপরাধের দিকে পরিচালিত করে। একজন মুসলমানের জন্য সুনানে ইবনে মাজা, 3970 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, যা সতর্ক করে যে বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একটি মহান গুণ এবং যে ব্যক্তি এটি আয়ত্ত করে তাকে সহীহ বুখারি, 6114 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ক্রোধ, অর্থ, তারা তাদের ক্রোধের কারণে কোন পাপ করে না, তাদের অন্তর শান্তি ও সত্য বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4778 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এটি পবিত্র হৃদপিণ্ডের একটি বৈশিষ্ট্য যা পবিত্র কুরআনে

উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একমাত্র হৃদয় যা কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88 এবং 89:

“যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে আসে সুস্থ হৃদয় নিয়ে।"

আগেই বলা হয়েছে, সীমার মধ্যে রাগ উপকারী হতে পারে। এটি নিজের নফস, বিশ্বাস এবং সম্পদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা উচিত যা সঠিকভাবে করা হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্রোধ হিসাবে গণ্য হয়। এই ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা, যিনি কখনো নিজের কামনা-বাসনার জন্য রাগান্বিত হননি। তিনি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন, যা সহীহ মুসলিম, 6050 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন, যা সহীহ মুসলিম, 1739 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তিনি যা খুশি তা নিয়ে খুশি হবেন এবং যা রাগান্বিত হবে তাতে রাগান্বিত হবেন।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হওয়া প্রশংসনীয় কিন্তু এই রাগ যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা দোষারোপযোগ্য হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হলেও ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা একজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুনান আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 4901 নম্বর, এমন একজন উপাসককে সতর্ক করে যে ক্রোধের সাথে দাবি করে যে আল্লাহ, মহান, একটি নির্দিষ্ট পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। ফলস্বরূপ

এই উপাসককে জাহান্নামে পাঠানো হবে এবং বিচারের দিনে পাপীকে ক্ষমা করা হবে।

মন্দের উত্স চারটি জিনিস নিয়ে গঠিত: নিজের ইচ্ছা, ভয়, খারাপ ক্ষুধা এবং রাগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এই হাদীসের উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের চরিত্র ও জীবন থেকে এক চতুর্থাংশ মন্দতা দূর করবে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক, তাই এটি তাদের এমনভাবে কাজ বা কথা বলে না যা তাদের এই দুনিয়া এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই বড় আফসোসের দিকে নিয়ে যায়।

রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান

একটি সৎ বর্ণনা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত জুড়ে সিরিয়া অভিযান অব্যাহত ছিল। আবু বক্কর সিদ্দিকের মৃত্যুর পর, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁকে সিরিয়া অভিযানের নেতা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি আবু বক্কর (রাঃ) এর কিছু সত্য বৈশিষ্ট্যেও উল্লেখ করেছেন, যেগুলো জানা এবং অনুকরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 269-270-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর আবু বক্করকে বর্ণনা করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যিনি সত্য অনুসারে কাজ করেছিলেন।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

উমর আবু বক্করকেও বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, কল্যাণের নির্দেশদাতা হিসেবে।

সহীহ বুখারির ২৬৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে বোঝা যায় দুটি স্তর পূর্ণ একটি নৌকার উদাহরণ দিয়ে। মানুষ। নীচের স্তরের লোকেরা যখনই জল পেতে চায় তখনই উপরের স্তরের লোকদের বিরক্ত করে। তাই তারা নীচের স্তরে একটি গর্ত ড্রিল করার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে তারা সরাসরি জল অ্যাক্সেস করতে পারে। উপরের স্তরের লোকেরা যদি তাদের থামাতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অবশ্যই ডুবে যাবে।

মুসলমানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কখনই পরিত্যাগ করবে না। একজন মুসলমানকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে, অন্যান্য বিপথগামী লোকেরা তাদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। পচা আপেলের সাথে রাখলে একটি ভাল আপেল শেষ পর্যন্ত প্রভাবিত হবে। একইভাবে, যে মুসলিম অন্যদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে ব্যর্থ হয়, অবশেষে তাদের নেতিবাচক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হবে তা সূক্ষ্ম বা আপাত। এমনকি বৃহত্তর সমাজ গাফিল হয়ে গেলেও তাদের পরিবারের মতো তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাদের নেতিবাচক আচরণ তাদের আরও বেশি প্রভাবিত করবে না বরং এটি সুনানে আবু দাউদের 2928 নম্বর হাদিস অনুসারে সমস্ত মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এমনকি যদি একজন মুসলিম অন্যদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়, তাদের উচিত তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত তাদের নম্র উপায়ে পরামর্শ দিয়ে যা শক্তিশালী

প্রমাণ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। কেবলমাত্র এইভাবে তারা তাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবে এবং বিচারের দিন ক্ষমা করা হবে। কিন্তু যদি তারা কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে এবং অন্যের কাজকে উপেক্ষা করে তবে আশঙ্কা করা হয় যে অন্যদের নেতিবাচক প্রভাবগুলি তাদের চূড়ান্ত বিপথগামী হতে পারে।

উমর আবু বক্করকেও বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, একজন ভদ্র, সহজ-সরল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি

কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

উমর আবু বক্করকেও বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে।

প্রজ্ঞা একজনকে তাদের জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করে যাতে তারা উভয় জগতের নিজের এবং অন্যদের উপকার করে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান

যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয় । মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

একজন নেতার পরামর্শ

সিরিয়া অভিযানের সময়, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ এবং মুআয বিন জাবাল উমর ইবনে খাত্তাবকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যা ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, তাঁর জীবন ও সময়গুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। , ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 270।

তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি এখন খলিফা হওয়ার পর তাঁর কাছে শত্রু, বন্ধু, মহীয়সী ও অজ্ঞ, শক্তিশালী ও দুর্বল সকলেই আসবে। তাদের সকলেরই তার উপর কিছু অধিকার থাকবে এবং সেগুলি পূরণে সতর্ক থাকতে হবে।

এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতা অবলম্বন করে অর্জন করা হয়।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে

উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

তারা উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করতে এবং বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন। যেদিন মানুষের হৃদয়ের সমস্ত গোপনীয়তা প্রকাশ পাবে এবং সমস্ত গোপন বিষয় প্রকাশ পাবে এবং সমস্ত মানুষ সার্বভৌম, অধীনস্থের অধীন হবে, যিনি তাঁর শক্তি দ্বারা তাদের বশীভূত করবেন। মানুষ আত্মসমর্পণ করবে, তাঁর বিচারের অপেক্ষায়, তাঁর শাস্তির ভয়ে এবং তাঁর করুণার আশায়।

তূর্য বিস্ফোরণে সৃষ্টির মৃত্যু ঘটবে। এটি সহীহ মুসলিম, 7381 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। শেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটি এমন একটি কল যা কেউ সাড়া দিতে পারে না বা প্রত্যাখ্যান করবে না। এটি পুনরুত্থান এবং চূড়ান্ত বিচারের দিকে পরিচালিত করবে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়া, আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে মহান

আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী। অধ্যায় 8 আন আনফাল, আয়াত 24:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের জীবন দেয়..."

এই পৃথিবীতে যে কেউ এই আহ্বানে সাড়া দেবে সে চূড়ান্ত আহ্বান সহ্য করা এবং সাড়া দেওয়া সহজ পাবে। অথচ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ডাকে গাফিলতি করে জীবনযাপন করে, সে দুনিয়াতে শান্তি পাবে না এবং তারা শিঙ্গার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হবে, যা তাদের জন্য ধৈর্য্য ধরা ও সাড়া দেওয়া বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। . একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মহান আল্লাহর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারে, যতক্ষণ না চূড়ান্ত আহ্বানটি ঘটবে, শীঘ্র বা পরে, এবং কেউ তা এড়াতে বা উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে না। যদি এটি অনিবার্য হয় তবে এটি বোধগম্য হয় যে কেউ গাফিলতিতে বাস করার পরিবর্তে এখনই, আজকে এর প্রতিক্রিয়া জানাবে। যদি কেউ গাফিলতি করে শিঙার বিস্ফোরণ শুনতে পায় তবে কোনো কাজ বা অনুশোচনা তাদের উপকারে আসবে না এবং এই ব্যক্তির জন্য যা হবে তা আরও ভয়ঙ্কর হবে।

উপলব্ধির গুরুত্ব

সিরিয়া অভিযানের সময়, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহকে উমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এই খবর তাঁর কাছে পৌঁছলে, আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, তিনি দুনিয়াতে ক্ষমতার সন্ধান করেননি এবং তিনি যা চেয়েছিলেন তা পার্থিব লাভও নয়। তিনি আরও বলেন, এই পৃথিবীতে মানুষ যা দেখছে তা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে এবং শেষ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 271-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং পরকালের উত্তম গৃহ লাভের জন্য কাজ করতেন। এই মানসিকতা প্রাপ্ত হয় যখন কেউ এই জড় জগত ও পরকাল সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি এবং উপলব্ধি গ্রহণ করে।

মুসলমানদের জন্য সঠিক উপলব্ধি বিকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য বাড়াতে পারে, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি পূরণ করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত। ধার্মিক পূর্বসূরিদের কাছে এটিই ছিল এবং এটি তাদের জড় জগতের অতিরিক্ত বিলাসিতা এড়িয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উত্সাহিত করেছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দু'জন লোক অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত এবং এক কাপ ঘোলা জল জুড়ে আসে। তারা উভয়েই তা পান করতে চায় যদিও তা বিশুদ্ধ নয় এবং এর অর্থ হলেও তাদের এটি নিয়ে বিতর্ক করতে হবে। তাদের

তৃষ্ণা বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা জলের কাপের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেয় তারা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা অন্য সমস্ত কিছুর প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এবং বিশুদ্ধ পানির একটি নদী দেখে যা কেবলমাত্র অল্প দূরত্বে ছিল তারা অবিলম্বে পানির কাপের উপর মনোযোগ হারিয়ে ফেলবে যেখানে তারা আর এটিকে গুরুত্ব দেবে না এবং এটি নিয়ে আর বিতর্ক করবে না। এবং পরিবর্তে তারা তাদের তৃষ্ণা সহ্য করবে ধৈর্য সহকারে জানবে যে একটি বিশুদ্ধ জলের নদী কাছাকাছি। যে ব্যক্তি নদী সম্পর্কে অবগত নয় সে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখে অন্য ব্যক্তিকে পাগল বলে বিশ্বাস করবে। এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষের অবস্থা। একদল লোভের সাথে বস্তুজগতের দিকে মনোনিবেশ করে। অন্য দলটি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে পরকাল এবং সেখানের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন নেয়ামতের দিকে। যখন কেউ তাদের আখেরাতের সুখের দিকে মনোনিবেশ করে তখন পার্থিব সমস্যাগুলি এত বড় ব্যাপার বলে মনে হয় না। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি এই জগতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তবে তাদের কাছে সবকিছুই মনে হবে। তারা এর জন্য তর্ক করবে, লড়াই করবে, ভালবাসবে এবং ঘৃণা করবে। ঠিক যেমন আগে উল্লিখিত উদাহরণের ব্যক্তির মতো যিনি শুধুমাত্র ঘোলা জলের কাপে ফোকাস করেন।

এই সঠিক উপলব্ধি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

হিংসা দূর করা

সিরিয়া অভিযানের সময়, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহকে উমর ইবনে খাত্তাব দ্বারা দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাই খালিদ বিন ওয়ালিদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। খালিদ, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, প্রতিস্থাপিত হওয়া নিয়ে কোন সমস্যা ছিল না কিন্তু যারা শুনছেন তাদের অনুস্মারক হিসাবে, আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছেন যে তারা সকলেই মহান আল্লাহর আদেশ পালনকারী ভাই ছিল। আর যদি কোন মুসলমানের ভাইকে তার উপর নিযুক্ত করা হয়, তবে তা তার আধ্যাত্মিক বা পার্থিব বিষয়ে কোন ক্ষতি করবে না, বরং যে দায়িত্বে আছে তার প্রলোভনের কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বা সে যা প্রকাশ পেয়েছে তার কারণে তার পাপের মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। , যারা মহান আল্লাহ দ্বারা সুরক্ষিত ব্যতীত. ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 271-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটা স্পষ্ট যে হিংসা অনেক মুসলমানকে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2510 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ঘটবে বলে সতর্ক করেছেন। এটি অন্যান্য অনেক নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, এটি মুসলমানদেরকে ভালো সমর্থন করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে বাধা দেয় তা নির্বিশেষে যেই করুক কেন ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি অন্যদের সাহায্য করতে চায় না কারণ তারা বিশ্বাস করে যে সমাজে অন্য ব্যক্তির পদমর্যাদা তাদের নিজের থেকে বাড়বে।

একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের চরিত্র থেকে হিংসা দূর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি জিনিস যা এই লক্ষ্যে সাহায্য করতে পারে তা হল একজন ব্যক্তির যা আছে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া । মহান আল্লাহ মানুষকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে দেন না কারণ এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তিনি পরিবর্তে প্রতিটি ব্যক্তির বিশ্বাসের জন্য সর্বোত্তম যা দেন। এটা বোঝা অন্যদের যা আছে তা নিয়ে ঈর্ষা দূর করতে পারে। কত মুসলমান সম্পদ অর্জন করেছে যা তাদের ঈমান নষ্ট করেছে? আর কয়জন মুসলমানকে বিচার দিবসে ক্ষমা করা হবে কারণ তারা ধৈর্য ধরে পরীক্ষা সহ্য করেছে? অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে যে এই জড় জগত সীমিত হওয়ায় এর ভিতরের জিনিসের প্রতি ঈর্ষা করা সহজ। কিন্তু একজন মুসলমান যদি পরকালের লক্ষ্য রাখে এবং এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে তাকে অগ্রাধিকার দেয় তবে তা তাদের থেকে ঈর্ষা দূর করবে। কারণ আখেরাতের আশীর্বাদ সীমাহীন তাই ঈর্ষান্বিত হওয়ার দরকার নেই কারণ এখানে ঘুরতে গেলে প্রচুর নেয়ামত আছে, সেগুলো কখনো শেষ হবে না। কিন্তু বিশ্বের মধ্যে পাওয়া সীমিত জিনিসগুলিকে যত বেশি লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা করবে তারা তত বেশি ঈর্ষান্বিত হবে।

সম্মান ও অপমান

সিরিয়া অভিযানের সময়, একটি মুসলিম সেনাবাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে যতক্ষণ না এর জনগণ এই শর্তে যে খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আসবেন এই শর্তে শহরের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়। তিনি রাজি হন এবং দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে জেরুজালেমে পৌঁছান। যখন তিনি জেরুজালেমের কাছাকাছি ছিলেন তখন তিনি তার সেনাপতিদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ (রা.) তাকে ভালো পোশাক পরতে এবং একটি আনুষ্ঠানিক ঘোড়ায় চড়ার পরামর্শ দেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে অপমানিত মানুষ এবং মহান আল্লাহ তাদের পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আর যদি তারা অন্য কিছুতে সম্মান খোঁজে তবে মহান আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 69-70 নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদ, 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে শীঘ্রই এমন একটি দিন আসবে যখন অন্যান্য জাতি মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করবে এবং যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হবে। বিশ্বের কাছে তুচ্ছ মনে করা। মহান আল্লাহ অন্যান্য জাতির অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় দূর করবেন। বস্তুজগতের প্রতি মুসলিম জাতির ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের ঘৃণার কারণে এটি ঘটবে।

সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তখনও সংখ্যায় কম ছিলেন, তারা সমগ্র জাতিকে পরাস্ত করেছিলেন অথচ মুসলমানরা আজ সংখ্যায় অনেক বেশি, বিশ্বে তাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব নেই। এর কারণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছেন, দুনিয়ার হালাল আনন্দ উপভোগের চেয়ে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অথচ বর্তমানে মুসলমানদের অধিকাংশই বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পাপের মূল হল জড় জগতের ভালবাসা। কারণ যে কোন পাপ সংঘটিত হয় তা ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয়। বস্তুগত জগতকে চারটি দিকে বিভক্ত করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের আত্মীয় এবং বন্ধু। এই জিনিসগুলির অত্যধিক সাধনা যা পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ভাগ্যের প্রতি ভালবাসা থেকে অবৈধ সম্পদ উপার্জন করা। এ কারণেই জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, সম্পদ ও কর্তৃত্বের প্রতি ভালোবাসা একজন ব্যক্তির ঈমানের জন্য যতটা ধ্বংসাত্মক, তার চেয়েও বেশি ধ্বংসকারী দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ভেড়ার পালকে ছেড়ে দিলে। যখনই মানুষ জড় জগতের এই দিকগুলোর আধিক্য অন্বেষণ করে তা সর্বদা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। যখন এটি ঘটে তখন মহান আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায় যা কষ্ট ছাড়া আর কিছুই করে না।

যদিও, কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে যে বস্তুজগতের অতিরিক্ত জিনিসের অনুসরণ করা ক্ষতিকারক নয় এটি এমন একটি বিষয় যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে অনেক হাদিসে সতর্ক করেছেন যেমন সহীহ বুখারি, 3158 নম্বরে পাওয়া যায়। তিনি সতর্ক করেছিলেন। যে তিনি মুসলমানদের জন্য দারিদ্রকে ভয় করতেন না। তার আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা এই জড় জগতের আধিক্যের পিছনে ছুটবে, যেমন অতিরিক্ত সম্পদ, এবং এর ফলে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং এটি তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। এই হাদীসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, এটাই ছিল অতীতের জাতিসমূহের আচরণ।

বস্তুগত জগত যেহেতু সীমিত, এটা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চায় তাহলে এর জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা তাদের এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয় , যেমন অন্যদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা। তারা একে অপরের যত্ন নেওয়া বন্ধ করবে কারণ তারা জড়জগতকে সংগ্রহ এবং মজুদ করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এবং তারা সহীহ বুখারি, 6011 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে প্রদত্ত উপদেশের বিরোধিতা করবে, যেটি পরামর্শ দেয় যে মুসলমানদের একটি শরীরের মতো আচরণ করা উচিত যখন শরীরের কোনো অংশ অসুস্থ হয় তখন শরীরের বাকি অংশ ব্যথায় অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতা একজন মুসলিমকে অন্যদের জন্য ভালবাসা বন্ধ করতে চালিত করবে যা তারা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য, কারণ তারা পার্থিব বিষয়ে তাদের সহ-মুসলমানদের ছাড়িয়ে যেতে চায়। এই প্রতিযোগিতায় অটল থাকা একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে বস্তুজগতের স্বার্থে ভালবাসবে, ঘৃণা করবে, দান করবে এবং রোধ করবে, যা সুনানে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে নিজের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করার একটি দিক। আবু দাউদ, নম্বর 4681। এই প্রতিযোগিতা হল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং আজকের অনেক মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য।

মুসলমানরা যদি একবার ইসলামের শক্তি ও প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে চায়, তাহলে তাদের এই জড় জগতের আধিক্য অর্জন ও সঞ্চয় করার চেষ্টার চেয়ে আখেরাতের প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি একটি পৃথক স্তর থেকে ঘটতে হবে যতক্ষণ না এটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে।

শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাফল্য

সিরিয়া অভিযানের সময়, একটি মুসলিম সেনাবাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে যতক্ষণ না এর জনগণ এই শর্তে যে খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আসবেন এই শর্তে শহরের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়। তিনি সম্মত হন এবং দীর্ঘ যাত্রার পর তিনি জেরুজালেমে পৌঁছান যেখানে তিনি জেরুজালেমের জনগণের সাথে একটি শান্তি চুক্তি আঁকেন যাতে তারা কর (জিজিয়া) প্রদান করা পর্যন্ত তাদের শারীরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 295-296-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সময়ের সাথে সাথে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের শক্তি কমেছে। প্রতিটি মুসলমান তাদের বিশ্বাসের শক্তি নির্বিশেষে পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে বিশ্বাস করে এবং সন্দেহ করে যে এটি তাদের বিশ্বাস হারাতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য লাভের চাবিকাঠি দিয়েছেন যা সারা বিশ্বে মুসলিমরা যে দুর্বলতা ও শোক অনুভব করছে তা দূর করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

" সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে যদি তোমরা [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, উভয় জগতে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জনের জন্য মুসলমানদেরকে প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি কর্তব্য, যেমন অন্যের জন্য ভালোবাসা, যা নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য একজনকে ইসলামিক শিক্ষা ও আমল করতে হবে। শিক্ষা এই মনোভাবের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আর মুসলমানরা যদি তা অর্জন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই এই সঠিকভাবে পরিচালিত মনোভাবের দিকে ফিরে আসতে হবে। যেহেতু মুসলমানরা পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করে তাদের উচিত এই সহজ শিক্ষাটি বোঝা এবং এর উপর আমল করা।

একজন ভ্রমণকারী

সিরিয়া অভিযানের সময়, একটি মুসলিম সেনাবাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে যতক্ষণ না এর জনগণ এই শর্তে যে খলিফা, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আসবেন এই শর্তে শহরের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়। তিনি রাজি হন এবং দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে জেরুজালেমে পৌঁছান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গভর্নরের বাড়িতে থাকার জন্য জোর দিয়েছিলেন, আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ রা. উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর, তাঁর গভর্নরদের সর্বদা পরীক্ষা করার অভ্যাস ছিল যে তারা সমাজের নেতা হিসাবে কীভাবে জীবনযাপন করে এবং আচরণ করে। যখন তিনি তার বাড়িতে প্রবেশ করলেন তখন তিনি একটি তলোয়ার, ঢাল এবং একটি জিন ছাড়া কিছুই দেখতে পাননি। তিনি যখন তার জীবনধারা নিয়ে প্রশ্ন করেন, তখন আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন যে, তার কাছে যা কিছু ছিল তা তাকে তার গন্তব্য অর্থাৎ পরকালের জন্য যথেষ্ট। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি ছাড়া দুনিয়া তাদের সবাইকে পরিবর্তন করেছে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 302-303-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 6416 নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার তাঁর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই পৃথিবীতে অপরিচিত বা মুসাফির হিসাবে বসবাস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ দিতেন যে, যখন একজন ব্যক্তি সন্ধ্যায় পৌঁছায় তখন তার সকালবেলা বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যদি তারা সকালে পৌঁছায় তবে সন্ধ্যায় তাদের বেঁচে থাকার আশা করা উচিত নয়। এবং যে একজন

মুসলমানকে অসুস্থতার সম্মুখীন হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে হবে এবং তাদের মৃত্যুর আগে তাদের জীবনের ভাল ব্যবহার করতে হবে।

এই হাদিসটি মুসলমানদেরকে দীর্ঘ জীবনের জন্য তাদের আশাকে সীমিত করতে শেখায় যা আখেরাতের জন্য প্রস্তুতিতে ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ বস্তুজগতের জন্য নিজের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে কারণ এটি একজন মুসলমানকে বিশ্বাস করে যে তাদের পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর সময় আছে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের এই অস্থায়ী পৃথিবীকে তাদের স্থায়ী আবাস হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের এমন একজনের মতো আচরণ করা উচিত যে এটি ছেড়ে যেতে চলেছে, কখনও ফিরে আসবে না। এটি একজনকে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য অর্থাৎ পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার অধিকাংশ উৎসর্গ করতে এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্বের বাইরে বস্তুজগত লাভের জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সীমিত করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই ধারণাটি পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 39:

"...এই পার্থিব জীবন শুধুমাত্র [অস্থায়ী] ভোগ-বিলাস, এবং প্রকৃতপক্ষে, পরকাল - এটি [স্থায়ী] বন্দোবস্তের আবাস।"

জামে আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে আলোচিত মূল হাদিসের অনুরূপ একটি হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এই পৃথিবীতে এমন একজন সওয়ার হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে ছায়ার নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। একটি গাছ এবং তারপর দ্রুত এগিয়ে যায়। এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতিকে নির্দেশ করার জন্য মহানবী (সা.) একে ছায়ার সাথে তুলনা করেছেন যা

সকলেই জানেন, স্থায়ী বলে মনে হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বস্তুগত জগত কারো কারো কাছে এভাবেই দেখা দিতে পারে। তারা এমন আচরণ করে যেন পৃথিবী চিরকাল স্থায়ী হবে যেখানে বাস্তবে এটি দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে।

উপরন্তু, এই হাদিসে একজন আরোহীর কথা বলা হয়েছে, হেঁটে যাওয়া কাউকে নয়। এর কারণ হল একজন রাইডার পায়ে হেঁটে ভ্রমণকারীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম বিশ্রাম নেবে। এটি আরও ইঙ্গিত করে যে এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির থাকার সময় খুব কম। এটা সবার কাছে বেশ স্পষ্ট। এমনকি যারা বয়স্ক বয়সে পৌঁছেছে তারা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি ঝলকানি দিয়ে গেছে। তাই বাস্তবে, কেউ বার্ধক্যে উপনীত হোক বা না হোক জীবন কেবল একটি মুহূর্ত। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা এটা দেখবে, সেদিন এমন হবে, যেন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

প্রকৃতপক্ষে, বস্তুগত জগৎ একটি সেতুর মতো যাকে অতিক্রম করতে হবে এবং স্থায়ী বাড়ি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যেভাবে একজন মানুষ বাসস্টেশনকে তার বাসস্থান হিসেবে নেয় না জেনেও তারা সেখানে অল্প সময়ের জন্য থাকবে, একইভাবে, একজন ব্যক্তি অনন্ত পরকালে পৌঁছানোর আগে পৃথিবী একটি ছোট স্টপ।

যখন কেউ সারাজীবনের ছুটিতে একবার বেড়াতে যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা তাদের বিলাসবহুল গৃহস্থালী সামগ্রী যেমন একটি প্রশস্ত স্ক্রীন টেলিভিশনের উপর ব্যয় সীমিত করে এবং পরিবর্তে তাদের হোটেল যে পরিষেবাগুলি অফার করে তার সাথে কাজ করে। তারা এইভাবে আচরণ করে কারণ তারা বোঝে যে হোটেলে তাদের থাকার সময় সংক্ষিপ্ত হবে এবং শীঘ্রই তারা আর ফিরে যাওয়ার জন্য ছেড়ে যাবে না। এই মানসিকতা তাদের ছুটির গন্তব্যকে তাদের স্থায়ী বাড়ি হিসাবে নিতে বাধা দেয়। একইভাবে, মানুষকে এমন একটি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল যা অবশ্যই এটিকে তাদের স্থায়ী আবাসে পরিণত করবে না। পরিবর্তে, তাদের পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে বিধান গ্রহণের জন্য যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী আবাস অর্থাৎ পরকালে পৌঁছাতে পারে।

যখনই একজন ব্যক্তি ভ্রমণের ইচ্ছা করেন তখনই তারা ভ্রমণকে আরামদায়ক এবং সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে পরকালের জন্য সর্বোত্তম বিধান হল তাকওয়া। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 197:

"...নিশ্চয়ই সর্বোত্তম রিযিক হল আল্লাহকে ভয় করা..."

এটি তখনই হয় যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয় এবং বিশ্বাস করে যে তিনি কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটি বেছে নেন। দুনিয়া থেকে পরকালের যাত্রা সম্পন্ন করার জন্য খাদ্যের মতো অন্যান্য বিধানের প্রয়োজন। তবে যে বিধানটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা হল তাকওয়া কারণ এটিই একমাত্র বিধান যা এই দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই কাউকে

উপকৃত করবে। যদিও, খাদ্য, সম্পদ এবং বাসস্থানের মতো অন্যান্য সমস্ত প্রকারের বিধান শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই কারও উপকারে আসবে যদি না, এটি পরকালের জন্য নিবেদিত হয়, যেমন দান করা, তবে এটি আসলে তাকওয়ার একটি অংশ।

যেহেতু জড়জগৎ কোনো ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান নয়, তাই তাদের উচিত আলোচনার মূল হাদীসের উপর আমল করা এবং হয় অপরিচিত বা ভ্রমণকারীর মতো জীবনযাপন করা।

অপরিচিত হওয়ার প্রথম অবস্থা হল এমন কেউ যে তাদের হৃদয় ও মনকে তাদের অস্থায়ী বাড়িতে সংযুক্ত করে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহ করা যাতে তারা নিরাপদে তাদের স্থায়ী বাড়িতে অর্থাৎ পরকালে ফিরে যেতে পারে। এটি একজন কাজের ভিসায় বিদেশে বসবাসকারীর মতো। তাদের কাজের জায়গা তাদের বাড়ি নয়; শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের একটি জায়গা যাতে তারা এটি নিয়ে তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। এই ব্যক্তি কখনই বিচিত্র দেশকে তাদের বাড়ি হিসাবে গণ্য করবে না। পরিবর্তে, তারা কেবল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় করে এবং তাদের সম্পদ সঞ্চয় করার দিকে মনোনিবেশ করে যাতে তারা যতটা সম্ভব সম্পদ তাদের আসল এবং স্থায়ী বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে পারে। যদি এই ব্যক্তি তাদের সমস্ত বা সিংহভাগ সম্পদ বিদেশে ব্যয় করে এবং খালি হাতে স্বদেশে ফিরে আসে তবে তারা নিঃসন্দেহে তাদের আত্মীয়দের দ্বারা দোষী বলে বিবেচিত হবে। কারণ তারা কাজের ভিসায় অন্য দেশে বসবাসের তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে, একজন মুসলমানের উচিত আখেরাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার বিধান অর্জনের জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করা। তাদের অন্যদের সাথে বস্তুজগতের বিলাসিতা করার জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তাদের অনন্ত পরকালের বিধান অর্জনের লক্ষ্যে তাদের মনোনিবেশ করতে হবে। যদি তারা তাদের অস্থায়ী বাড়িকে সুন্দর করার জন্য খুব বেশি প্রচেষ্টা করে তবে

তারা অপ্রস্তুত এবং খালি হাতে পরকালে প্রবেশ করবে এবং তাই তারা তাদের মিশনে ব্যর্থ হবে যা মহান আল্লাহ তাদের অর্পণ করেছেন। একজন মুসলমানের নিজের সাথে সৎ হওয়া উচিত এবং প্রতিফলিত করা উচিত দিনের কত ঘন্টা তারা বস্তুগত জগতের জন্য এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই আত্ম-প্রতিফলন তাদেরকে দেখাবে যে তাদের সঠিক মানসিকতা আছে কি না এবং পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাস কতটা দৃঢ়। অধ্যায় 87 আল আ'লা, আয়াত 16-17:

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। যদিও পরকাল উত্তম এবং স্থায়ী।"

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবজাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যখন তারা সবচেয়ে নিচু মানুষ ছিল এবং তাদের অধিকাংশই পাপপূর্ণ জীবনযাপন করছিল যার কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সুস্পষ্ট দলীল সহ সত্যের পথে আহবান করেছেন। এর মধ্যে অনেকেই তার স্পষ্ট বাণী গ্রহণ করে তাকে অনুসরণ করে। তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইসলাম অনেক জাতিকে জয় করবে এবং মুসলমানরা প্রচুর সম্পদ অর্জন করবে । কিন্তু তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন যেন তারা বস্তুগত জগতের বিলাসিতা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। এই সতর্কতার একটি উদাহরণ সুনানে ইবনে মাজা, 3997 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা.) সতর্ক করেছেন যে, বস্তুজগতের অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসের জন্য প্রতিযোগিতা করা মানুষকে ধ্বংস করবে। তাই তিনি মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব ও চাহিদা পূরণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনে সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দেন এবং এর পরিবর্তে পরকালের প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি সবকিছুই সত্য হয়েছে। যখন বিশ্ব মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করা হয় তখন তাদের অধিকাংশই প্রতিযোগিতা, সংগ্রহ, মজুদ ও বস্তুজগতের আধিক্য উপভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে, তারা

পরকালের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া ছেড়ে দেয় যেভাবে তাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। মাত্র কয়েকজন তার উপদেশ গ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রয়োজন ও দায়িত্ব পূরণের জন্য বস্তুগত জগত থেকে যা প্রয়োজন ছিল তা গ্রহণ করেছিল এবং অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ উৎসর্গ করেছিল। এই ছোট দলটি, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিরা আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আঁকড়ে ধরেছিল, কারণ তারা কার্যত তাঁর পরামর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের অমনোযোগী হয়ে বস্তুজগতের পিছনে ছুটতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা দেয়।

দ্বিতীয় যে মানসিকতাটি মুসলমানদের গ্রহণ করা উচিত, আলোচনায় প্রধান হাদীসে বলা হয়েছে তা হল একজন মুসাফির। এই ব্যক্তি এই জড় জগতকে তাদের বাসস্থান হিসাবে দেখেন না এবং পরিবর্তে তাদের প্রকৃত গৃহের অর্থ, পরকালের দিকে যাত্রা করেন। এই মানসিকতা একজন ব্যাক প্যাকারের মতো যে বিভিন্ন শহরে ঘুমিয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাদের কখনই তাদের বাড়ি বলে মনে করে না। তারা তাদের সাথে নিয়ে যায় একমাত্র বিধান যা তারা অর্থ বহন করতে পারে, প্রয়োজনীয় জিনিস। এটি তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের নিরাপদে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে। একজন ব্যাক প্যাকার কখনই অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করবে না জেনে যে এই জিনিসগুলি কেবল তাদের জন্য একটি বোঝা হবে। তারা নিরাপদে তাদের যাত্রা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্যাক করতে ব্যর্থ হবে না। একইভাবে, একজন বুদ্ধিমান মুসলমান শুধুমাত্র এই জড় জগত থেকে কাজ এবং কথাবার্তার ক্ষেত্রেই সংগ্রহ করে, যা তাদের নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। তারা এমন সব কাজ ও কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে যা তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4104 নম্বর অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 7-8-এ পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ

(সাঃ) এই মনোভাবটি গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিয়েছিলেন। :

“নিশ্চয়ই আমরা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাকে তার জন্য শোভাময় করেছি যাতে আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি তাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম। এবং অবশ্যই, আমরা তার উপর যা আছে তা একটি অনুর্বর ভূমিতে পরিণত করব।"

একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে দিন এবং রাত কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত পর্যায় যা মানুষ ভ্রমণ করে, পর্যায়ক্রমে, পরকালে পৌঁছানো পর্যন্ত। তাই তাদের উচিত প্রতিটি পর্যায়কে সৎ আমলের মাধ্যমে পরকালে প্রেরণের মাধ্যমে ব্যবহার করা। তাদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে যাত্রা খুব শীঘ্রই শেষ হবে এবং তারা পরকালে পৌঁছাবে। এমনকি যদি যাত্রাটি দীর্ঘ দেখায় তবে এটি শেষ পর্যন্ত একটি মুহুর্তের মতো মনে হবে তাই এটি অপ্রস্তুত থাকাকালীন এটি শেষ হওয়ার আগে এটিকে বাধ্যতার মুহূর্ত করা উচিত। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা এটা দেখবে, সেদিন এমন হবে, যেন তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

প্রতিটা নিঃশ্বাসে তারা দুনিয়াকে পেছনে ফেলে পরকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও, কেউ নড়াচড়া করছে বলে মনে হতে পারে না কিন্তু বাস্তবে, দিন এবং রাত

তাদের পরিবহন হিসাবে কাজ করে যা তাদের দ্রুত, বিরতি ছাড়াই, পরবর্তী পৃথিবীতে নিয়ে যায়।

মুসলমানদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে যেহেতু তারা মহান আল্লাহর বান্দা, শীঘ্রই একটি দিন আসবে যখন তারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে। তারা ফিরে গেলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের থামানো হবে। অতএব, তাদের এই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভাল কিছু প্রস্তুত করা উচিত। তাদের উচিত মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু যদি তারা গাফিলতি অব্যাহত রাখে এবং প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয় তবে ইতিমধ্যে যা ঘটেছে এবং যা অবশিষ্ট রয়েছে তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরামর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া যা আলোচনার মূল হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রথম অংশে এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের আশা সংক্ষিপ্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। একজন মুসলমানকে বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তারা এই পৃথিবীতে দীর্ঘকাল থাকবে যতক্ষণ না তারা যেকোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে। এমনকি যদি কেউ বহু বছর বেঁচে থাকে তবুও জীবনকে এক ঝলকানিতে চলে গেছে বলে মনে হয়। আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট, মুসলমানদেরকে বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন যে তারা সন্ধ্যায় পৌঁছালে তারা সকালে বেঁচে থাকবে। পার্থিব দায়িত্ব পালন এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত করার জন্য জড়জগত থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করার মূল কারণ এই মানসিকতা। যেখানে দীর্ঘ জীবনের আশা করা বিপরীত অর্থের মূল কারণ, এটি একজনকে সৎকর্ম সম্পাদন এবং পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিলম্বিত করে এবং এটি তাদের সেখানে থাকার বিশ্বাস রেখে জড়জগতকে সংগ্রহ ও জমা করতে উত্সাহিত করে। অত্যন্ত দীর্ঘ হবে।

উপরন্তু, আবদুল্লাহ বিন উমর, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, মুসলমানদের অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের সুস্বাস্থ্যের ভাল ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত, বেশীরভাগ মানুষ সুস্বাস্থ্যের মূল্য হারিয়ে ফেলার পরেই উপলব্ধি করে, যা সহীহ বুখারী, ৬৪১২ নম্বর হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করা হয়েছে। সুস্বাস্থ্য ব্যবহার করার অর্থ হল একজন মুসলমানকে তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে আনুগত্যে ব্যবহার করা উচিত। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, সৎ কাজ করার মাধ্যমে এবং পাপ থেকে বিরত থাকা এমন সময়ে পৌঁছানোর আগে যখন তারা ভাল কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে কিন্তু দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে তা আর করতে পারে না। যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার করবে তাকে তাদের সুস্বাস্থ্যের সময় সৎকর্মের পুরস্কার দেওয়া হবে, এমনকি যখন তারা অসুস্থতার সম্মুখীন হয় এবং সেগুলি আর করতে পারে না। সহীহ বুখারী, 2996 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অথচ যে ব্যক্তি তাদের সুস্বাস্থ্যের সঠিক ব্যবহার করে না সে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই সম্ভাব্য পুরস্কার হারাবে। আসলে তাদের কাছে আফসোস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশের চূড়ান্ত অংশ হল, একজন ব্যক্তির উচিত মৃত্যুর আগে তাদের জীবনের সদ্ব্যবহার করা। এর মধ্যে রয়েছে এমন সব জিনিস ব্যবহার করা যা সৎ কাজের দিকে পরিচালিত করে, যেমন ধন-সম্পদ, এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা যেমন ভালো কাজ থেকে বিরত থাকা সমস্ত জিনিস এড়িয়ে চলা। মুসলমানদের জন্য তাদের সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ, তারা দায়িত্ব নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার আগে, যা স্বাভাবিকভাবেই সময়ের সাথে সাথে ঘটে থাকে, যেমন বিবাহ। এবং তাদের আর্থিক দায়িত্ব বৃদ্ধির আগেই তাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা।

জামে আত তিরমিযী, 2403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর সময় সমস্ত লোকের জন্য অনুশোচনা হবে। সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি আফসোস করবে যে, মৃত্যুর আগে তারা বেশি ভালো কাজ করেনি। পাপী ব্যক্তি আফসোস করবে যে তারা তাদের মৃত্যুর আগে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়নি। এই বিশ্বে লোকেদের প্রায়ই দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ, ড্রাইভিং পরীক্ষা পুনরায় করা, কিন্তু একবার একজন ব্যক্তি মারা গেলে সেখানে কোনো কাজ নেই। আফসোস তাদের কিছুতেই সাহায্য করবে না। পরিবর্তে, এটি কেবল তাদের যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলবে। তাই মুসলমানদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করার জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করতে হবে, তাদের মুহূর্ত শেষ হওয়ার আগেই মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। আগামীকাল পর্যন্ত দেরি করার মানসিকতা ত্যাগ করা উচিত কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আগামীকাল আসে না। একজন মুসলমানের আজকের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং তাই, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজগুলি করা উচিত, যেমন আগামীকাল এই পৃথিবীতে আসতে পারে তবে তারা এটি দেখার জন্য জীবিত নাও থাকতে পারে।

আন্তরিক সৈনিকরা

সিরিয়া অভিযানের সময়, রোমান রাজা, হেরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপলে পিছু হটে। সেখানে তিনি এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলেন যে মুসলিম সেনাবাহিনীর একজন বন্দী ছিল মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। এই আলোচনাটি ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 301- এ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

লোকটি মুসলিম সৈন্যদের দিনে নাইট হিসাবে বর্ণনা করেছিল।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4168 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, দুর্বল বিশ্বাসীর চেয়ে শক্তিশালী বিশ্বাসী মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

এটি অগত্যা শারীরিক শক্তিকে বোঝায় না যা একজন সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করে। তবে এটি জ্ঞান এবং তার উপর আমলকেও নির্দেশ করে। যখন কেউ তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করে তখন এটি বিশ্বাসের নিশ্চিততার দিকে নিয়ে যায়। দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে তার জ্ঞান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে এবং দুর্বল মুমিনের মত অন্ধ অনুকরণ করবে না। একটি দুর্বল বিশ্বাসী শোনার উপর ভিত্তি করে কিছু বিশ্বাস করে যেমন তাদের বলা হয় যে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির ভিতরে রয়েছে যেখানে শক্তিশালী বিশ্বাসী বিশ্বাস করে এবং জ্ঞানের উপর

ভিত্তি করে কাজ করে উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা একটি জানালা দিয়ে তাদের বাড়ির ভিতরে ব্যক্তিটিকে দেখে। যার ঈমান যত শক্তিশালী হবে, আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের আনুগত্য তত বেশি হবে, তাঁর আদেশ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এর ফলে উভয় জগতে তাদের সাফল্য বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 41 ফুসসিলাত, আয়াত 53:

"আমরা তাদের দিগন্তে এবং নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাব যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য..."

লোকটি রাতে মুসলিম সৈন্যদের সন্ন্যাসী বলেও বর্ণনা করেছে।

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি প্রদান করা মহান আল্লাহর সাথে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম। আর এটা তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের

নিদর্শন। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

জামে আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সমস্ত মুসলমান তাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে চায়। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে।

লোকটি মুসলিম সৈন্যদের এমন লোক হিসাবে বর্ণনা করেছে যারা কখনই বেআইনিভাবে কিছু গ্রহণ করবে না।

হারাম ব্যবহার করা একটি বড় গুনাহ। এর মধ্যে রয়েছে বেআইনি সম্পদ ব্যবহার, বেআইনি জিনিস ব্যবহার করা এবং বেআইনি খাবার খাওয়া। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে নির্দিষ্ট জিনিসগুলিকে ইসলাম হারাম বলে আখ্যায়িত করেছে

যেমন অ্যালকোহল শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলিই হারাম নয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি হালাল জিনিসগুলিও হারাম হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি হারাম জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা হয়। যেমন, হালাল খাদ্য হারাম হয়ে যেতে পারে যদি তা হারাম সম্পদ দিয়ে কেনা হয়। তাই, মুসলমানদের জন্য এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা শুধুমাত্র হালাল জিনিসের সাথে মোকাবিলা করে কারণ এটি কাউকে ধ্বংস করার জন্য হারামের একটি উপাদান লাগে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সহীহ মুসলিম, 2346 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি হারাম ব্যবহার করবে তার সমস্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি তাদের দোয়া মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে কি তাদের কোনো ভালো কাজ কবুল হওয়ার আশা করা যায়? প্রকৃতপক্ষে এর উত্তর সহীহ বুখারি, 1410 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদীসে পাওয়া গেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, মহান আল্লাহই কেবল হালালকে গ্রহণ করেন। অতএব, অবৈধ সম্পদের সাথে পবিত্র তীর্থযাত্রা করার মতো যে কোনো কাজ যা হারামের ভিত্তি রয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সহীহ বুখারি, 3118 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন এই ধরনের ব্যক্তিকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 188:

" এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না বা শাসকদের কাছে [ঘুষের মাধ্যমে] পাঠাও না যাতে [তারা সাহায্য করতে পারে] জনগণের সম্পদের একটি অংশ পাপে ভোগ করতে, যদিও তোমরা জান [এটি অবৈধ।]"

লোকটি মুসলিম সৈন্যদের এমন লোক হিসাবে বর্ণনা করেছে যারা অন্যদের কাছে শান্তির ইসলামিক শুভেচ্ছা ছড়িয়ে দেবে।

সহীহ বুখারী, 12 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের মধ্যে পাওয়া একটি ভাল গুণের পরামর্শ দিয়েছেন। যথা, চেনা ও অপরিচিত লোকেদের কাছে শান্তির ইসলামি অভিবাদন ছড়িয়ে দেওয়া।

এই ভাল বৈশিষ্ট্যের উপর কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকাল মুসলমানরা প্রায়শই কেবল তাদের চেনেন তাদের কাছে শান্তির ইসলামিক অভিবাদন ছড়িয়ে দেয়। এটি সবার কাছে ছড়িয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মানুষের মধ্যে ভালবাসার দিকে নিয়ে যায় এবং ইসলামকে শক্তিশালী করে। প্রকৃতপক্ষে, এই বৈশিষ্ট্যটি সহীহ মুসলিম, 194 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

একজন মুসলমানের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তারা অন্যদের কাছে প্রসারিত শান্তির প্রতিটি শুভেচ্ছার জন্য ন্যূনতম দশটি পুরষ্কার পাবে এমনকি অন্যরা তাদের উত্তর দিতে ব্যর্থ হলেও। সুনানে আবু দাউদ, 5195 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত শান্তির ইসলামী অভিবাদনকে সঠিকভাবে পূরণ করা উচিত অন্যদের প্রতি তাদের অন্যান্য বক্তৃতা ও কর্মে এই শান্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যের নিজের এবং সম্পদ থেকে দূরে রেখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, সুনানে আন নাসায়ী, 4994 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুসলমান এবং মুমিনের সংজ্ঞা।

লোকটি মুসলিম সৈন্যদের এমন লোক বলেও বর্ণনা করেছিল যারা তাদের বিরোধিতাকারীদের ধ্বংস করে দেয়।

এটি মুসলমানদেরকে অবিচল থাকার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখনই তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, যেমন শয়তান, তাদের ভেতরের শয়তান এবং যারা তাদেরকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ জানায়। যখনই এই শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় তখনই একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে তাদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি এমন স্থান, জিনিস এবং লোকদের এড়িয়ে চলার মাধ্যমে অর্জন করা হয় যারা তাদেরকে পাপ এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আমন্ত্রণ ও প্রলুব্ধ করে। শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকা শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। একটি পথে একইভাবে ফাঁদ শুধুমাত্র অনুরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী দ্বারা এড়ানো যায়; শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে পারে কিন্তু তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা গীবত করার মতো পাপের মাধ্যমে তাদের সৎ কাজগুলি না বুঝেই ধ্বংস করতে পারে। একজন মুসলমান এই আক্রমণগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য তাই তাদের উচিত তাদের জন্য প্রস্তুত করা উচিত মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এবং

বিনিময়ে একটি অগণিত পুরস্কার লাভ করা। যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এইভাবে সংগ্রাম করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ সঠিক পথনির্দেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

"এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

অথচ অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার সাথে এসব আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াই উভয় জগতেই কষ্ট ও অসম্মানের দিকে নিয়ে যাবে। একইভাবে একজন সৈনিক যার কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র নেই সে পরাজিত হবে; একজন অজ্ঞ মুসলমানের কাছে এই আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র থাকবে না যার ফলে তাদের পরাজয় ঘটবে। অথচ, জ্ঞানী মুসলমানকে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সরবরাহ করা হয় যা পরাস্ত করা যায় না বা প্রহার করা যায় না, অর্থাৎ মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য। এটি কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

তাদের বর্ণনা শুনে হেরাক্লিয়াস মন্তব্য করেন যে, মুসলিম সৈন্যরা যদি লোকটির কথা মতো হয় তবে তারা তার পায়ের নিচের জমি জয় করবে।

আর্থিক লেনদেন

আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রা.) শুরুতে সিরিয়ার একটি শহর হোমসের নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু যখন কথা এল যে রোমানরা হোমস পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে, কৌশলগত সুবিধার কারণে তিনি শহর থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার নাগরিকদের কাছ থেকে আদায় করা কর (জিজিয়া) তাদের কাছে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন, কারণ এই কর তখনই নেওয়া হয় যখন কোনো দেশে মুসলিম শাসন চলতে থাকে। লোকেরা তাদের আচরণে হতবাক হয়েছিল কারণ তারা তাদের কাছ থেকে তাদের সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে রোমানদের অভ্যস্ত ছিল। লোকেরা বিজয় অর্জনের জন্য মুসলমানদের জন্য প্রার্থনা করেছিল যাতে তারা ফিরে আসে এবং আবার হোমসকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 305-306-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই ঘটনাটি একজনের চুক্তি, বিশেষ করে আর্থিক বিষয়গুলো পূরণ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2146 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে ব্যবসায়ীরা অনৈতিক লোক হিসাবে উত্থাপিত হবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎ কাজ করে এবং কথা বলে। সত্য।

যারা ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নেয় তাদের জন্য এই হাদীসটি প্রযোজ্য। মহান আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ পালন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের উচিত তাদের বক্তৃতায় সৎ হওয়া উচিত লেনদেনের সমস্ত বিবরণ যারা জড়িত তাদের কাছে প্রকাশ করে। সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 2079 নম্বর, সতর্ক করে যে মুসলমানরা যখন আর্থিক লেনদেনে জিনিসগুলি লুকিয়ে রাখে, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, এটি বরকতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে পণ্যের জন্য অত্যধিক অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা না করা। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে সেরকম আচরণ করা যেভাবে তারা অর্থপূর্ণ আচরণ করতে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশের সাথে। একইভাবে, একজন মুসলিম আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার করা পছন্দ করবে না তাদের অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়।

যারা ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

মিশরে অভিযান

ফিক্সিং না করাপ্টিং

উমর ইবনে খাত্তাব, আমর ইবনে আল আস, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, মিশরের দিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, যেটি রোমানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। যখন তিনি এর একটি শহর আল ফার্মা জয় করেন, তখন তিনি তার সৈন্যদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মিশরের জনগণকে জানা উচিত যে তারা শান্তির সৈন্য এবং তারা যেন দেশে কোনো দুর্নীতি না করে। পরিবর্তে, তাদের উচিত এর বিষয়গুলি সংশোধন করা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা থেকে একটি উত্তম উদাহরণ স্থাপন করা। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 312-313-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

দুর্নীতি হল যখন একজন ব্যক্তি তার কাছে থাকা আশীর্বাদের অপব্যবহার করে, বিশেষ করে তাদের সামাজিক প্রভাব, পার্থিব জিনিস, যেমন ক্ষমতা এবং সম্পদ লাভের জন্য। এটি মহান আল্লাহর প্রতি একজন মুসলমানের কর্তব্যকে প্রভাবিত করে এবং মানুষের বিরুদ্ধে অনেক পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন নিপীড়ন।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে যখন সাধারণ জনগণ একে অপরের সাথে আর্থিকভাবে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচারী নেতা নিয়োগ করে তাদের শাস্তি দেন। এই নিপীড়নের একটি দিক হলো দুর্নীতি যা সাধারণ জনগণকে চরম দুর্ভোগের কারণ। একই হাদিস সতর্ক করে যে, যখন সাধারণ জনগণ মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তারা তাদের শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হবে যারা তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। আবার, এটি দুর্নীতির একটি দিক যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, যেমন সরকারি কর্মকর্তারা পরিণতির ভয় ছাড়াই অন্যের জিনিসপত্র অবাধে নিয়ে যায়। যখন সাধারণ জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তখন তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিরা এই আচরণকে সাধারণ জনগণ গ্রহণ করে বলে বিশ্বাস করে একইভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। এটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের নেতারা এবং প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা দুর্নীতিগ্রস্তভাবে কাজ করার সাহস করবে না এবং সাধারণ জনগণ এর পক্ষে দাঁড়াতে পারবে না। এবং পূর্বে উদ্‌ধৃত হাদিস অনুসারে, সাধারণ জনগণ যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তবে তিনি তাদের প্রভাবশালী পদে লোক নিয়োগ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবেন যারা ন্যায়বিচারে রয়েছেন।

বিশ্বে পরিলক্ষিত ব্যাপক দুর্নীতির জন্য অন্যকে দোষারোপ করার অপরিপক্ক পথ গ্রহণ না করে মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের আচরণের প্রতি সত্যিকারভাবে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তাদের মনোভাব সামঞ্জস্য করা। তা না হলে সময়ের সাথে সাথে সমাজে দুর্নীতি বাড়বে। কেউ বিশ্বাস করবেন না যে তারা প্রভাবশালী সামাজিক অবস্থানে না থাকায় সমাজে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত দুর্নীতি সাধারণ জনগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে ঘটে এবং তাই সাধারণ জনগণের ভালো আচরণের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."

কৃতজ্ঞতার কাজ

মিশরে অভিযানের সময়, বলবিস বিজয়ের ফলে মিশরের শাসকের কন্যাকে বন্দী করা হয়। মুসলিম জেনারেল, আমর ইবন আল আস, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাঁর সৈন্যদেরকে ধার্মিকতার সাথে নেকীর প্রতিদান দেওয়ার ইসলামী নীতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন: অধ্যায় 55 আর রহমান, আয়াত 60:

"ভালোর প্রতিদান কি ভাল ছাড়া [কিছুই]?"

তারপর তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে মিশরের শাসক বহু বছর আগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে একটি উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং তাদের উচিত এই অনুগ্রহের প্রতিদান তাঁর কাছে তাঁর কন্যা এবং তাঁর সাথে বন্দী হওয়া সমস্ত লোককে পাঠিয়ে দেওয়া এবং সম্পদ। যা তার সাথে জব্দ করা হয়েছে। তারা এতে সম্মত হয় এবং তার বাবা মুসলমানদের আচরণে সন্তুষ্ট হন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 314-316-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 1954 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে সকল নেয়ামতের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নয়, মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর কারণ হল, মহান আল্লাহ কখনো কখনো একজন ব্যক্তিকে তার পিতামাতার মতো অন্যদের সাহায্য করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করেন। যেহেতু মাধ্যমগুলো মহান আল্লাহ সৃষ্টি ও ব্যবহার করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। তাই, মুসলমানদের অবশ্যই উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং সর্বদা অন্যদের কাছ থেকে যে কোনো সাহায্য বা সমর্থন প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, তার আকার নির্বিশেষে। তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশ অনুযায়ী নেয়ামতকে ব্যবহার করে তিনিই আশীর্বাদের উৎস এবং সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত কারণ তারাই আল্লাহর সৃষ্টি ও মনোনীত মাধ্যম। একজন মুসলমানের উচিত মৌখিকভাবে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কার্যত তাদের উপায় অনুযায়ী তাদের দয়ার কাজটি শোধ করা যদিও তা তাদের পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনাই হয়। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, 216 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না এবং তাই তাকে নিয়ামত বৃদ্ধি করা হবে না। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

যদি একজন মুসলমান আশীর্বাদ বৃদ্ধি করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই কৃতজ্ঞতার উভয় দিকই পূরণ করতে হবে, যেমন আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি।

মুসলমানদের মনোভাব

মিশর অভিযানের সময় বাবলিয়ন দুর্গ মুসলমানরা অবরোধ করে। মিশরের শাসক আল মুকাকিস তার কিছু দূতের সাথে মুসলমানদের নেতা আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। দূতগণ মুসলমানদের সাথে দুই দিন অবস্থান করেন এবং ফিরে আসার পর আল মুকাকিস তাদের কাছে মুসলমানদের বর্ণনা দিতে বলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 325-327-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দূতরা মুসলমানদেরকে এমন একটি জাতি বলে বর্ণনা করেছিলেন যাদের কাছে জীবনের চেয়ে মৃত্যু প্রিয় ছিল।

কারণ তারা জড় জগতের চেয়ে পরকালকে প্রাধান্য দিয়েছিল। কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করতে পারে যখন তারা এই জড়জগত ও পরকালের ব্যাপারে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি গ্রহণ করে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

দূতরাও মুসলমানদেরকে এমন একটি জাতি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যাদের কাছে উচ্চ মর্যাদার চেয়ে নম্রতা প্রিয় ছিল।

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ের সাথে জীবনযাপন করবে তখন তাকে মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। এটি ঘটে কারণ নম্রতা মহান আল্লাহর দাসত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নম্রতার বিপরীত যা অহংকার শুধুমাত্র মালিকের জন্য, অর্থাৎ আল্লাহ, সর্বোত্তম, কারণ মানুষের যা কিছু আছে তা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং দান করা হয়েছে। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি অহংকার পরিহার করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে নম্রতা প্রদর্শন করে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব এবং উভয় জগতেই প্রকৃত মহিমার দিকে নিয়ে যায়।

দূতরাও মুসলমানদেরকে এমন একটি জাতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যাদের বস্তুজগতের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা বা ভালোবাসা ছিল না।

যখন লোকেরা, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে, ছুটিতে যায় তারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি প্যাক করে এবং হয়ত একটু অতিরিক্ত কিন্তু তারা অতিরিক্ত প্যাকিং এড়াতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা যে পরিমাণ অর্থ তাদের সাথে নিয়ে যায় তা তারা বিদেশে থাকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে। যখন তারা পৌঁছায় তখন তারা প্রায়ই এমন একটি হোটেলে থাকে যেখানে সাধারণত কিছু অতিরিক্ত জিনিসের সাথে বসবাসের প্রধান প্রয়োজনীয়তা থাকে। যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা ভবিষ্যতে একই গন্তব্যে ফিরে আসবে না তারা কখনই একটি বাড়ি কিনবে না কারণ তারা দাবি করবে যে তাদের থাকার সময় কম এবং তারা ফিরে আসবে না। তারা তাদের ছুটির সময় চাকরি পায় না এই দাবি করে যে তারা ছোট থাকে তাই তাদের বেশি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নেই। তারা বিয়ে করে না বা বাচ্চাদের দাবি করে যে ছুটির গন্তব্য তাদের জন্মভূমি নয় যেখানে তারা বিয়ে করবে এবং সন্তান ধারণ করবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এটি হল ছুটির নির্মাতাদের মনোভাব এবং মানসিকতা।

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তারা শীঘ্রই এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে যার অর্থ, তারা ছুটিতে থাকার মতোই এই পৃথিবীতে থাকা অস্থায়ী, এবং তারা বিশ্বাস করে যে পরকালে তাদের থাকার স্থায়ী হবে, তারা এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয় না। তারা যদি সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের কাছে ছুটির মতোই স্বল্প সময় আছে, তবে তারা তাদের বাড়িতে খুব বেশি প্রচেষ্টা নিবেদন করবে না এবং পরিবর্তে একটি সাধারণ বাড়িতে সন্তুষ্ট থাকবে যেমন ভ্রমণকারী একটি সাধারণ হোটেলে সন্তুষ্ট। সুতরাং বাস্তবে, এই পৃথিবীটি উদাহরণে ছুটির গন্তব্যের মতো এখনও, মুসলমানরা এটিকে একের মতো বিবেচনা করে না। পরিবর্তে, তারা অনন্ত পরকালকে অবহেলা করে তাদের বেশিরভাগ প্রচেষ্টা তাদের দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য উৎসর্গ করে। কখনও কখনও বিশ্বাস করা কঠিন যে কিছু মুসলমান প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী পরকালে বিশ্বাস করে যখন কেউ

দেখে যে তারা অস্থায়ী জগতের জন্য কতটা প্রচেষ্টা নিবেদন করে। তাই মুসলমানদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং দুনিয়ার প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে ভ্রমণকারী হিসেবে বসবাস করার উপদেশ দিয়েছেন সহীহ বুখারি, ৬৪১৬ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। তারা যেন এই পৃথিবীকে স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ না করে বরং এর মতো আচরণ করে। একটি ছুটির গন্তব্য।

দূতরাও মুসলমানদেরকে এমন একটি জাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন যাদের নেতা তাদের একজনের মতো এবং উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিদেরকে নীচ থেকে বা প্রভুকে দাস থেকে আলাদা করা যায় না।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের

মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি

বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

দূতগণ মুসলমানদেরকে এমন লোক হিসাবে বর্ণনা করেছেন যারা বিনয়ের সাথে নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের একজনও নামাজ থেকে পিছিয়ে থাকেননি।

যদিও, এখনও মুসলমানদের উপর অনেক ফরজ কর্তব্য রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল ফরজ নামাজ কায়েম করা। এটি এমন হয় যখন কেউ নামাজ আদায় করে তার সমস্ত শর্ত ও শিষ্টাচার, যেমন সময়মত আদায় করা। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফরজ নামায ত্যাগ করাই প্রথম ধাপ যা বড় গুনাহ ও গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

ফরয নামায একটি বাধা হিসাবে কাজ করে যা একজনকে এই গোমরাহী থেকে রক্ষা করে কিন্তু যে মুহুর্তে কেউ এই বাধাকে ধ্বংস করে দেয় তখন তারা গোমরাহ হওয়ার আগে সময়ের ব্যাপার মাত্র। এটিকে সতর্ক করা হয়েছে অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 36:

"আর যে পরম করুণাময়ের স্মরণ থেকে অন্ধ হয়, আমি তার জন্য একজন শয়তান নিযুক্ত করি এবং সে তার সঙ্গী।"

একজনকে কেবল তাদের চেনা লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা বুঝতে পারবে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের গোমরাহীর প্রথম ধাপটি ছিল ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করা।

মুসলমানদের জন্য তাদের ফরজ নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করা এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের যেমন তাদের সন্তানদেরও তা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক । বাচ্চাদের নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করার মাধ্যমে অভিভাবকদের অবশ্যই সক্রিয় হতে হবে, এমনকি তারা বয়সে পৌঁছানোর আগেই তাদের নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। সুনানে আবু দাউদের 495 নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ দিয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি বিলম্বিত করা পিতামাতা এবং সন্তান উভয়ের জন্যই বড় আফসোস হয়ে দাঁড়াবে যেমন একজন বড় সন্তানকে উৎসাহিত করা হয়। তাদের ফরয নামায কায়েম করা যখন তারা এতে অভ্যস্ত না হয় তখন খুবই কঠিন। পিতামাতাদের মনে রাখা উচিত যে তারা বিচারের দিনে তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে ব্যর্থতার জন্য জবাব দেবে কারণ এটি তাদের উপর একটি কর্তব্য ছিল। এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 66 আত তাহরীম, আয়াত 6:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর..."

সবাই সমান

মিশর অভিযানের সময় বাবলিয়ন দুর্গ মুসলমানরা অবরোধ করে। মিশরের শাসক আল মুকাকিস তার কিছু দূতের সাথে মুসলমানদের নেতা আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। দূতগণ মুসলমানদের সাথে দুই দিন অবস্থান করেন এবং ফিরে আসার পর আল মুকাকিস তাদের কাছে মুসলমানদের বর্ণনা দিতে বলেন। তাদের কথা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তির আলোচনা করাই উত্তম হবে তাই তিনি আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে অনুরোধ করলেন যে তিনি কিছু লোক পাঠাতে যাদের সাথে তিনি আলোচনা করতে পারেন। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি দল পাঠালেন এবং উবাদা ইবনে আস সামিতকে তাদের নেতা নিযুক্ত করলেন। যখন তারা শাসকের দরবারে পৌঁছায়, তখন উবাদাহ, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, আল মুকাকিসকে সম্বোধন করার জন্য এগিয়ে গেলেন কিন্তু পরবর্তীরা তাকে বরখাস্ত করেন কারণ তিনি কালো চামড়ার ছিলেন। আল মুক্ককিস তাকে অন্য কাউকে সম্বোধন করার দাবি করেছিলেন কিন্তু মুসলমানদের দল উত্তর দিয়েছিল যে উবাদাহ, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তাদের নেতা, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম, তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। তারা আরও বলেন, ইসলামে গায়ের রঙের কোনো ওজন নেই। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 325-328-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিভাবে বাচ্‌তে হয়

মিশর অভিযানের সময় বাবলিয়ন দুর্গ মুসলমানরা অবরোধ করে। মিশরের শাসক আল মুকাকিস তার কিছু দূতের সাথে মুসলমানদের নেতা আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। দূতগণ মুসলমানদের সাথে দুই দিন অবস্থান করেন এবং ফিরে আসার পর আল মুকাকিস তাদের কাছে মুসলমানদের বর্ণনা দিতে বলেন। তাদের কথা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাদের সাথে একটি শান্তি চুক্তির আলোচনা করাই উত্তম হবে তাই তিনি আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে অনুরোধ করলেন যে তিনি কিছু লোক পাঠাতে যাদের সাথে তিনি আলোচনা করতে পারেন। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি দল পাঠালেন এবং উবাদা ইবনে আস সামিতকে তাদের নেতা নিযুক্ত করলেন। যখন উবাদাহ, আল্লাহ তাঁর সাথে খুশি, আল মুকাকিসকে সম্বোধন করেছিলেন তখন তিনি তাকে বলেছিলেন যে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানের কারণ, যারা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের কোনটিই পার্থিব লাভের আশা বা সম্পদ আহরণ নয়। যদি তারা যুদ্ধের মাধ্যমে একটি সোনার পাহাড় বা শুধুমাত্র একটি রৌপ্য মুদ্রা অর্জন করে তবে তারা এই পৃথিবী থেকে যা চায় তা খাওয়া এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য এবং নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখার জন্য একটি কাপড়। তারা সন্তুষ্ট হবে. তাদের মধ্যে কেউ যদি একটি সোনার পাহাড়ও অর্জন করে তবে তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করবে এবং তাদের হাতে যা অবশিষ্ট থাকবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। কারণ এই জড় জগতের আনন্দ প্রকৃত আনন্দ নয় এবং এর বিলাসিতা প্রকৃত বিলাসিতা নয়: বরং প্রকৃত আনন্দ ও বিলাসিতা আসে পরকালে। এভাবেই মহান আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করেছেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যা শিখিয়েছেন। তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, এই পৃথিবীতে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র ক্ষুধা নিবারণ এবং তাদের শরীর ঢেকে রাখার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত, তাদের প্রধান উদ্বেগ হওয়া উচিত মহান আল্লাহকে খুশি করা এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করা। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 325-328-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2377 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে তিনি এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি নিয়ে চিন্তিত নন এবং এই পৃথিবীতে তাঁর উদাহরণ হল একজন সওয়ারীর মতো যে একটি গাছের ছায়ায় সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম এবং তারপর এটিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তিই একজন ভ্রমণকারী যারা এই পৃথিবীতে খুব সীমিত সময়ের জন্য অবস্থান করে যেখানে তারা অর্থ, আত্মার জগত থেকে এসেছেন এবং তারা যেখানে যাচ্ছেন যা অনন্ত পরকাল। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবী তুলনামূলকভাবে বাস স্টপে অপেক্ষা করার মতো। এ হাদীসে এ পৃথিবীকে ছায়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হল একটি ছায়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং লোকেরা এমনকি খেয়াল না করেও দ্রুত বিবর্ণ হয়ে যায় যা একজন ব্যক্তির দিন এবং রাত ঠিক কীভাবে কেটে যায়। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণকারীর হোটেল বা হোটেলের কথা উল্লেখ করেননি কারণ এগুলো শক্ত কাঠামো যা স্থায়ীত্ব নির্দেশ করে। একটি বিবর্ণ ছায়া এই বস্তুজগতকে আরও ভালভাবে বর্ণনা করে। এটি এই কারণে যে একজন ব্যক্তির বয়স যতই হোক না কেন তারা সর্বদা স্বীকার করে যে তাদের জীবন একটি মুহুর্তের মতো ফ্ল্যাশ করেছে এবং অনুভব করেছে। অধ্যায় 79 আন নাজিয়াত, আয়াত 46:

"যেদিন তারা এটা (বিচার দিবস) দেখবে, সেদিন এমন হবে যে, তারা তার একটি বিকেল বা একটি সকাল ছাড়া [জগতে] অবস্থান করেনি।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন আরোহীকে ইঙ্গিত করেছেন যে কেউ হাঁটবে না কেননা যে হাঁটছে সে আরোহীর চেয়ে গাছের ছায়ায় বেশি বিশ্রাম নেবে। এটি আরও নির্দেশ করে যে মানুষ এই পৃথিবীতে কতটা সীমিত সময় ব্যয় করে।

ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়া একজনের গুরুত্ব নির্দেশ করে বস্তুগত জগতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বিধানগুলি পাওয়ার জন্য ঠিক যেমন রাইডার তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমন বিশ্রাম। তাই একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুত হয়ে এই দুনিয়া থেকে অবিলম্বে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে এই দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য একজনকে বস্তুগত জগতকে ব্যবহার করা উচিত। রাইডার বিশ্রাম নেয় এবং মুসলমানদের অবশ্যই অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে তাদের সময় উৎসর্গ করার পরিবর্তে এমন জিনিসগুলি সংগ্রহ করতে হবে যা তাদের আখেরাতের জন্য উপকারী হবে যা বিচারের দিনে তাদের খালি হাতে ছেড়ে দেবে। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23-24:

“এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম-সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, ভাল] স্মরণ হবে? সে বলবে, হায়!

মুসলমানদের শক্তি

মিশরের অভিযানের সময়, যা রোমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, এর রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া, মুসলমানরা অবরোধ করেছিল তবুও এটি জয় করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এটাকে জয় করতে যে সময় নিচ্ছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর সেনাপতি আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে সম্ভবত এই বিলম্ব তার সেনাবাহিনীর কিছু পাপের কারণে বা সম্ভবত তারা এই জড় জগতকে ভালবাসতে শুরু করেছে বলে। তিনি আরও বলেন, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরই বিজয় দান করেন যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক। আমর, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, এবং তার লোকেরা দুই চক্র প্রার্থনা করেছিল এবং তার ক্ষমা ও করুণার জন্য তার কাছে প্রার্থনা করেছিল এবং তারপর তাদের বিজয় মঞ্জুর করা হয়েছিল। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 321-322-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, কিছু কৌশলগত ত্রুটির কারণে বিজয়ে বিলম্ব হয়েছে বলে বিশ্বাস করেননি। পরিবর্তে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিজয় মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে এবং যারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করে তাদের দেওয়া হয়।

যদিও, তেলের মতো বিশ্বের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও মুসলমানদের হাতে, তবুও জাতি হিসেবে মুসলমানদের সমাজ ও অন্যান্য জাতির উপর খুব কম প্রভাব রয়েছে। মুসলিমরা প্রায়ই এই সামাজিক দুর্বলতার জন্য অন্যদের দায়ী করে, যেমন

পশ্চিমের দেশগুলো। তারা এই ব্যাপক সামাজিক দুর্বলতা ও প্রভাবের কারণ হিসেবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অপপ্রচারকে দায়ী করে । দুর্ভাগ্যবশত, অনেকেই বোঝেন না যে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের অভ্যাস ছিল না। তারা তখনও সংখ্যায় কম ছিল, সমগ্র জাতিকে অতিক্রম করেছিল। এর কারণ হল অন্যের দিকে আঙুল তোলার পরিবর্তে তারা আয়নায় তাকিয়ে তাদের নিজস্ব চরিত্রের মূল্যায়ন করেছে এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসারে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করেছে। মহান আল্লাহর প্রতি এই আন্তরিক আনুগত্যই ছিল সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের শক্তি। অথচ, আজ অনেক মুসলমান অন্যের দিকে আঙুল তোলায় এতটাই ব্যস্ত যে তারা তাদের ত্রুটি ও মহান আল্লাহর অবাধ্যতার প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে না। এর ফলে তারা নিজেদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে, যা কিছু পণ্ডিতদের মতে, সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যের মূল। এর কারণ এই যে, যে নিজের উপর সন্তুষ্ট সে নিজের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে না এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সংশোধন করবে না। এটি সর্বদা খারাপ বৈশিষ্ট্য এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করবে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজা , 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, মুসলমানরা যখন মহান আল্লাহর আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন তাদের শত্রুদের উপর ক্ষমতা দেওয়া হবে। তারা এবং তারা অবাধে মুসলমানদের জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমনকি সুনানে আবু দাউদ 4297 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে কিন্তু দুনিয়ার চোখে তাদের কোনো মূল্য থাকবে না। এটি বস্তুগত জগতের প্রতি তাদের ভালবাসা এবং মৃত্যুর প্রতি তাদের অপছন্দের কারণে। জড় জগতের প্রেম সর্বদা একজনকে পরকালের জন্য প্রস্তুতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এর ফলে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা হবে এবং এভাবে মুসলিম জাতির প্রভাব তুচ্ছ হয়ে যাবে।

মুসলমানদের উচিত অন্যকে দোষারোপ করা বন্ধ করে বরং নিজেদের চরিত্র নিয়ে চিন্তা করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সংশোধন করা। এটি তাদের পরকালের জন্য প্রচেষ্টা এবং ভালবাসার কারণ হবে। মহান আল্লাহ তখন সমাজের বাকি অংশের হৃদয়ে তাদের ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলবেন, যেমনটি তিনি সাহাবাদের জন্য করেছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এটি ইসলামী জাতিকে আবারও সমাজের মধ্যে শক্তি ও প্রভাব অর্জনের সুযোগ দেবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 139:

"সুতরাং দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ হবে যদি তুমি [সত্যিকার] বিশ্বাসী হও।"

অন্যদের জন্য ভালবাসা

মিশরে অভিযানের সময়, আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুসলমানদের সাথে একটি শান্তি চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন যার অর্থ, তাদের জমি এবং বন্দিদের ফিরিয়ে দেওয়া হলে তারা কর (জিজিয়া) প্রদান করবে। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এই চুক্তি মেনে নেন কিন্তু তাঁর সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলেন, প্রথমে প্রত্যেক বন্দীকে ইসলামের প্রস্তাব দিতে এবং যদি তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে তাহলে কর (জিজিয়া) তাদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। যখন বন্দীদের জড়ো করা হয়েছিল, তখন তাদের একে একে বিকল্প দেওয়া হয়েছিল, এবং প্রত্যেক বন্দী যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মুসলমানদের দ্বারা মহান আল্লাহর বজ্রধ্বনি উচ্চারণে স্বাগত জানানো হয়েছিল (তাকবীর), অথচ যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের প্রত্যেকের সাথে দেখা হয়েছিল। মুসলমানদের থেকে অনুশোচনা ও অনুশোচনা। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 336-337-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও ইসলাম প্রত্যাখ্যান করা মুসলমানদের আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছিল, যেমন তারা অমুসলিমদের কাছ থেকে কর (জিজিয়া) নেবে, তবুও তাদের আচরণ স্পষ্ট করে যে তারা আর্থিক সুবিধা লাভের চেয়ে ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল। এটি অন্যদের জন্য ভালবাসার একটি দিক যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে।

সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে।

এর অর্থ এই নয় যে একজন মুসলমান তাদের বিশ্বাস হারাবে যদি তারা এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এর অর্থ হল, যতক্ষণ না তারা এই উপদেশের উপর আমল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানের ঈমান পূর্ণ হবে না। এই হাদিসটি আরও ইঙ্গিত করে যে একজন মুসলিম তাদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও অপছন্দ করে। এটি সহীহ মুসলিমে পাওয়া আরেকটি হাদিস দ্বারা সমর্থিত, নম্বর 6586। এটি পরামর্শ দেয় যে মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের একটি অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ ব্যথা ভাগ করে নেয়। এই পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণা করা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে এবং ঘৃণা করে।

একজন মুসলমান তখনই এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যখন তার অন্তর হিংসা-বিদ্বেষের মতো খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকে। এই মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা একজনকে নিজের জন্য আরও ভাল কামনা করতে বাধ্য করবে। সুতরাং বাস্তবে এই হাদিসটি একটি ইঙ্গিত দেয় যে, ক্ষমাশীল হওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষের মতো মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করার মতো ভাল বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এটি কেবলমাত্র পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব।

মুসলমানদের জন্য এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের জন্য ভাল কামনা করা তাদের ভাল জিনিসগুলিকে হারিয়ে ফেলবে। মহান আল্লাহর ভান্ডারের কোন সীমা নেই তাই স্বার্থপর ও লোভী মানসিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

অন্যদের জন্য ভাল কামনা করার মধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত, যেমন আর্থিক বা মানসিক সমর্থন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যদের সাহায্য করতে চান। অতএব, এই ভালবাসা কেবল কথায় নয় কাজের মাধ্যমে দেখাতে হবে। এমনকি যখন একজন মুসলমান মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং অন্যের ইচ্ছার পরিপন্থী উপদেশ দেয়, তখন তাদের উচিত এমনভাবে করা উচিত যেমন তারা চায় অন্যরা তাদের সদয় উপদেশ দিক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আলোচ্য প্রধান হাদিসটি পারস্পরিক ভালবাসা এবং যত্নের বিরোধিতাকারী সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি দূর করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন হিংসা। ঈর্ষা হল যখন একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট আশীর্বাদের অধিকারী হতে চায় যা শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন তা অন্য কারো কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই মনোভাব মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নিয়ামত বিতরণের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এ কারণে এটি একটি বড় গুনাহ এবং হিংসাকারীর নেক আমলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সুনান আবু দাউদ, 4903 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটিকে সতর্ক করা হয়েছে। যদি একজন মুসলিম অন্যের কাছে থাকা হালাল জিনিসগুলি কামনা করতে হয় তবে তাদের উচিত অন্য ব্যক্তিকে না হারিয়ে একই বা অনুরূপ জিনিস দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা করা উচিত। আশীর্বাদ। এই ধরনের হিংসা বৈধ এবং ধর্মের দিক থেকে প্রশংসনীয়। সহীহ মুসলিম, 1896 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের কেবল

সেই ধনী ব্যক্তিকে হিংসা করা উচিত যে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হন যিনি তাদের জ্ঞানকে নিজের এবং অন্যদের উপকারে ব্যবহার করেন।

একজন মুসলমানের উচিত শুধু অন্যের জন্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ লাভের জন্য নয় বরং উভয় জগতের ধর্মীয় আশীর্বাদ লাভের জন্যও ভালবাসা। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ অন্যদের জন্য এটি কামনা করে, তখন এটি তাকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকার এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে উত্সাহিত করে। এই ধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতা ইসলামে স্বাগত জানানো হয়েছে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 26:

"...সুতরাং এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দিন।"

এই উত্সাহ একজন মুসলমানকে তাদের চরিত্রের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং দূর করার জন্য নিজেকে মূল্যায়ন করতে অনুপ্রাণিত করবে। যখন এই দুটি উপাদান অর্থকে একত্রিত করে, মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করা এবং নিজের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা, এটি উভয় জগতেই সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তাই একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসার দাবি করা উচিত নয় বরং তাদের কর্মের মাধ্যমে তা দেখাতে হবে। আশা করা যায় যে এইভাবে অন্যের জন্য উদ্বিগ্ন সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর উদ্বেগ লাভ করবে। জামে আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য চেষ্টা করা

উমর ইবনে খাত্তাব একবার মিশর বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে আমর ইবনে আল আস কর্তৃক প্রেরিত একজন বার্তাবাহককে বলেছিলেন যে মানুষের প্রতি তার উদ্বেগ তাকে দিনের বেলা ঘুমাতে বাধা দেয় এবং নিজের জন্য তার উদ্বেগ তাকে বাধা দেয়। রাতে ঘুম থেকে। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 335-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের জন্য উদ্বেগ ইঙ্গিত করে যে তিনি অন্যদের জন্য কতটা আন্তরিকতা রেখেছিলেন।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের

প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

নিজের জন্য উদ্বেগ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাতে ঘুমাতে বাধা দেয়।

সহীহ বুখারী, 1145 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ প্রতি রাতে তাঁর অসীম মহিমা অনুসারে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং মানুষকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের চাহিদা পূরণ করুন যাতে তিনি তাদের পূরণ করতে পারেন।

স্বেচ্ছায় রাতের ইবাদত মহান আল্লাহর প্রতি একজনের আন্তরিকতা প্রমাণ করে, কারণ অন্য কোন চোখ তাদের দেখছে না। এটি প্রদান করা মহান আল্লাহর সাথে

অন্তরঙ্গ কথোপকথনের একটি মাধ্যম। আর এটা তাঁর কাছে একজনের দাসত্বের নিদর্শন। এর অগণিত ফজিলত রয়েছে উদাহরণস্বরূপ, সুনানে আন নাসাই, 1614 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস ঘোষণা করে যে এটি সর্বোত্তম স্বেচ্ছায় প্রার্থনা।

বিচার দিবসে বা জান্নাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কারো হবে না এবং এই মর্যাদা সরাসরি স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের সাথে যুক্ত। এ থেকে বোঝা যায় যে, যারা রাতের স্বেচ্ছায় নামায কায়েম করবে তারা উভয় জগতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 79:

"এবং রাতের [অংশ] থেকে, এটির সাথে সালাত [অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াত] আপনার জন্য অতিরিক্ত [ইবাদত] হিসাবে; আশা করা যায় যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে পুনরুত্থিত করবেন।"

জামে আত তিরমিযী, 3579 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন মুসলমান রাতের শেষ অংশে মহান আল্লাহর নিকটতম। অতএব, এই সময়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করলে কেউ অগণিত নিয়ামত লাভ করতে পারে।

সমস্ত মুসলমান তাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে এবং তাদের চাহিদা পূরণ করতে চায়। অতএব, তাদের স্বেচ্ছায় রাতের নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ সহীহ

মুসলিম, 1770 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে প্রতি রাতে একটি বিশেষ সময় থাকে যখন ভাল প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছায় রাতের নামায কায়েম করা একজনকে পাপ করা থেকে বিরত রাখার একটি চমৎকার উপায়, এটি একজন ব্যক্তিকে অর্থহীন সামাজিক সমাবেশ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একজন ব্যক্তিকে অনেক শারীরিক অসুস্থতা থেকে রক্ষা করে। জামে আত তিরমিযী, 3549 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত খাওয়া বা পান না করে স্বেচ্ছায় রাতের নামাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত কারণ এটি অলসতাকে প্ররোচিত করে। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিজেকে ক্লান্ত করা উচিত নয়। দিনের বেলা একটি ছোট ঘুম এর সাথে সাহায্য করতে পারে। পরিশেষে, একজনকে পাপ পরিহার করা উচিত এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত, তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে আনুগত্যকারীরা স্বেচ্ছায় রাতের সালাত আদায় করা সহজ বলে মনে করে।

সদয় চিকিৎসা

মিশর জয়ের পর এবং আল ফুসতাতে প্রথম জুমার খুতবার সময়, আমর ইবনে আল আস, তাঁর সাথে, মুসলমানদের স্থানীয়দের সাথে ভাল আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ তাদের সাথে তাদের শান্তির চুক্তি হয়েছিল এবং তারা তাদের সাথে বিবাহের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছিল। (তাদের পূর্বপুরুষের মাধ্যমে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রী, হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি মিশরীয় ছিলেন)। তিনি মুসলমানদেরকে তাদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতে এবং তাদের দৃষ্টি নত করে তাদের নারীদের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 342-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আন নাসায়ী, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন সত্যিকারের মুসলমান এবং একজন সত্যিকারের মুমিনের লক্ষণের পরামর্শ দিয়েছেন। একজন প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে তাদের মৌখিক ও শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখে। এটি প্রকৃতপক্ষে, তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করে। এতে এমন সব ধরনের মৌখিক ও শারীরিক পাপ রয়েছে যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যদের সর্বোত্তম উপদেশ দিতে ব্যর্থ হওয়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিকতার বিরোধিতা করে যা সুনানে আন নাসায়ী, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে অন্যদেরকে মহান আল্লাহকে অমান্য করার উপদেশ দেওয়া এবং এর ফলে তাদেরকে পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানানো অন্তর্ভুক্ত। . একজন মুসলমানের এই আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত কারণ তাদের খারাপ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাদের হিসাব নেওয়া

হবে। সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবিকার সমস্যা সৃষ্টি করা, প্রতারণা করা, অন্যকে প্রতারণা করা এবং শারীরিক নির্যাতন করা। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে একজন প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি যে অন্যের জানমাল থেকে নিজেদের ক্ষতিকে দূরে রাখে। আবার, এটি তাদের ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে চুরি করা, অপব্যবহার করা বা অন্যের সম্পত্তি এবং জিনিসপত্রের ক্ষতি করা অন্তর্ভুক্ত। যখনই কাউকে অন্য কারো সম্পত্তির উপর অর্পণ করা হয় তখন তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শুধুমাত্র মালিকের অনুমতি নিয়ে এবং মালিকের কাছে খুশি এবং সম্মত উপায়ে এটি ব্যবহার করছে। সুনানে আন নাসাই নং 5421-এর একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তগত করে, তা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে, যদিও তা একটি ডালের ডালের মতোই হয়। গাছ জাহান্নামে যাবে।

উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের মৌখিকভাবে বিশ্বাসের ঘোষণাকে কর্মের সাথে সমর্থন করতে হবে কারণ সেগুলি একজনের বিশ্বাসের দৈহিক প্রমাণ যা বিচারের দিনে সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য পূরণ করা। মানুষের প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে এটি অর্জনের একটি

চমৎকার উপায় হল অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা যা তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়, যা সম্মান এবং শান্তির সাথে।

আল্লাহর ঘর (SWT)

যখনই কোন মুসলিম বাহিনী একটি সুরক্ষিত চৌকি তৈরি করে বা একটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করে, তারা প্রথম কাজটি করেছিল একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা কারণ এটি ইসলামী জ্ঞানের প্রচার এবং নামাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য ছিল। ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 367-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম, 1528 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হল মসজিদ এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।

ইসলাম মুসলমানদের মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে যেতে নিষেধ করে না। কিংবা তাদেরকে সর্বদা মসজিদে বসবাসের নির্দেশ দেয় না। তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাজারের জায়গায় যাওয়ার চেয়ে জামাতের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং ধর্মীয় সমাবেশে যোগদানকে অগ্রাধিকার দেয়।

যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন শপিং সেন্টারের মতো অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হওয়ার কোন ক্ষতি নেই, তবে একজন মুসলমানের উচিত অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেখানে যাওয়া এড়িয়ে যাওয়া কারণ তারা এমন জায়গা যেখানে পাপ বেশি হয়। যেখানে, মসজিদগুলিকে বোঝানো হয়েছে পাপ থেকে

আশ্রয়স্থল এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি আরামদায়ক স্থান। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা , তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। একজন ছাত্র যেমন একটি লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয় যেমন এটি অধ্যয়নের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়, তেমনি মুসলমানরা মসজিদ থেকে উপকৃত হতে পারে কারণ তাদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে দরকারী জ্ঞান অর্জন এবং কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা যাতে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে।

একজন মুসলমানকে অন্য জায়গার চেয়ে মসজিদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয় বরং তাদের উচিত অন্যদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, এটি যুবকদের জন্য পাপ, অপরাধ এবং খারাপ সঙ্গ এড়ানোর জন্য একটি চমৎকার জায়গা, যা উভয় জগতে কষ্ট এবং অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

এটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য যে, যদিও ইসলামি সাম্রাজ্যের কিছু অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে তবুও ইতিহাসের অন্য সব সাম্রাজ্যের বিপরীতে ভূমি বা ক্ষমতা লাভ করা লক্ষ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী ভূখন্ডের জনগণকে ইসলামের শিক্ষা শোনার সুযোগ দেওয়া, যা বিদেশী শক্তি দ্বারা বাধা দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যেহেতু ইসলাম একটি বিশ্বাস যা হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হবে, তাই তরবারির মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ আয়াত 256:

"ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি থাকবে না। সঠিক পথ ভুল থেকে আলাদা হয়ে গেছে..."

তাঁর পূর্ববর্তীদের মতো, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শাসনাধীনে থাকা সমস্ত লোকের ইসলাম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা ছিল তা নিশ্চিত করেছিলেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নেতাদের এবং সৈন্যদের সদ্য বিজিত ভূমির নাগরিকদের অধিকারকে সম্মান করতে এবং পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা একই অধিকার দিয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে সকল মুসলমানের কাছে ঋণী, যদিও তারা সম্প্রতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা হয় এবং এর মাধ্যমে বহু মানুষ ইসলামের ব্যাপক

উপকারিতা ও সত্যতা প্রত্যক্ষ করে ইসলাম গ্রহণ করে। লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, মুসলমানরা ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করার কারণে নাগরিকদের আনুগত্য অর্জন করেছিল।

একবার, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খ্রিস্টান দাসকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন যে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং তিনি বিষয়টিকে আরও এগিয়ে নেননি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুবরণ করছিলেন তখন তিনি এই বান্দাকে মুক্ত করেছিলেন।

জেরুজালেম জয় করার পরও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে বসবাসকারী অমুসলিমদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন যে তাদের জান, মাল, ক্রুশ ও গির্জা রক্ষা করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 203-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোনো ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারকারী অন্য কোনো ধর্মই তার কর্তৃত্বাধীন অন্য ধর্মকে প্রকাশ্যে ও নিপীড়নের ভয় ছাড়াই তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয়নি।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরিবর্তে ইসলামী ভূমিতে বসবাসকারী বয়স্ক ও অক্ষম অমুসলিমদের জন্য সুবিধার পরিকল্পনা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি একবার একজন বৃদ্ধ অন্ধ ইহুদিকে ভিক্ষা করতে দেখেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং কিছু জিনিস দিলেন। তারপর তিনি সরকারী

কোষাগারের ট্রাস্টিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে তখন থেকে অন্ধ লোকটিকে সাহায্য করার এবং তার মতো অন্যদেরও তাদের সাহায্য করার জন্য সন্ধান করার নির্দেশ দেন। তিনি দরিদ্র ও অক্ষমদের কর (জিজিয়া) প্রদানের প্রয়োজনীয়তাও দূর করেছিলেন, যা ইসলামী ভূমিতে বসবাসকারী অমুসলিমরা সরকারকে প্রদান করবে। রাষ্ট্র যখন ইসলামী অঞ্চলে বসবাসরত অমুসলিমদের মৌলিক জনসেবা প্রদান ও সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় তখনও এই কর নেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, সিরিয়া অভিযানের সময়, আবু বক্কর (রা.)-এর খিলাফতের সময়, যখন মুসলিম বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যের সীমানায় পিছু হটতে বাধ্য হয়, যা শেষ পর্যন্ত ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়, কর। সিরিয়ার অমুসলিমদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া এলাকাগুলো যেগুলো মুসলিমরা প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, সেগুলো জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পদ ফেরত পাওয়ার সময় লোকেরা মন্তব্য করেছিল যে তারা আশা করেছিল যে মুসলমানরা রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে এবং তাদের কাছে ফিরে আসবে কারণ মুসলমানরা তাদের সাথে রোমানদের চেয়ে ভাল আচরণ করেছিল। রোমানরা তাদের কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে যেত এবং তাদের কিছুই না রেখে চলে যেত, অথচ, যুদ্ধের সময়ও মুসলমানরা তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দিত। অমুসলিমরা যখন বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে তাদের ভূমি রক্ষায় অংশগ্রহণ করত তখনও কর নেওয়া হত না। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনে আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 204-205 এবং 444-446-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া

তাঁর শেষ পবিত্র তীর্থযাত্রার (হজ্জ) সময়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরত করার পর ২৩ তম বছরে, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাবার পথে আবতাহ নামক স্থানে থামলেন। মিনা। তিনি একটি বালির স্তূপ তৈরি করে তার উপর রেখেছিলেন এবং তারপর মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং তার তত্ত্বাবধানে থাকা লোকেরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাই তিনি মহান আল্লাহর কাছে নিয়ে যেতে চান (মৃত্যুকালে)) তাঁর ভক্তিতে থাকাকালীন এবং তাঁর প্রচেষ্টা বৃথা যাচ্ছে না। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১০২ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যু কামনা করেননি বরং তিনি গ্রহণ করতে বলেছেন যখন মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এভাবে দোয়া করা ইসলামে জায়েজ। এটি সহীহ বুখারী, 5671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নগরীতে শাহাদাত ও মৃত্যুবরণ করার জন্যও মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ১০১ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া তখনই সম্ভব যখন কেউ ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে সঠিক উপলব্ধি ও উপলব্ধি গ্রহণ করে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4108 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে আখেরাতের তুলনায় বস্তুগত জগত সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতো।

প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে পরকালের তুলনায় জড় জগত কত ছোট। কিন্তু বাস্তবে তাদের তুলনা করা যায় না কারণ জড় জগত ক্ষণস্থায়ী যেখানে পরকাল চিরন্তন। অর্থ, সীমাবদ্ধকে সীমাহীনের সাথে তুলনা করা যায় না। বস্তুগত জগতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: খ্যাতি, ভাগ্য, কর্তৃত্ব এবং একজনের সামাজিক জীবন, যেমন তাদের পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব। পার্থিব আশীর্বাদ যাই হোক না কেন এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে তা সর্বদা অপূর্ণ, ক্ষণস্থায়ী এবং মৃত্যু একজন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অন্যদিকে, আখেরাতের আশীর্বাদ দীর্ঘস্থায়ী এবং নিখুঁত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে বস্তুজগৎ একটি অন্তহীন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা ছাড়া আর কিছু নয়।

উপরন্তু, মৃত্যুর সময় অজানা বলে একজন ব্যক্তির এই পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা নেই। যেখানে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং পরকালে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং একজনের অবসরের মতো একটি দিনের জন্য প্রচেষ্টা করা বোকামি, যেটি তারা পৌঁছানোর গ্যারান্টিযুক্ত পরকালের জন্য প্রচেষ্টার চেয়ে কখনও পৌঁছাতে পারে না।

এর অর্থ এই নয় যে একজনকে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিত কারণ এটি একটি সেতু যা পরকালে নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। পরিবর্তে, একজন মুসলমানের উচিত এই জড়জগত থেকে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যথেষ্ট। এবং অতঃপর মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের বাকি প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তহীন সমুদ্রের উপর জলের ফোঁটাকে অগ্রাধিকার দেবেন না এবং একজন বুদ্ধিমান মুসলিম শাশ্বত পরকালের চেয়ে সাময়িক বস্তুগত জগতকে অগ্রাধিকার দেবেন না।

স্বরনিকা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সীলমোহরের আংটিতে খোদাই করা ছিল, "হে উমর (রা) উপদেশদাতার জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট।" ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ১৩৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি ইঙ্গিত করে যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কত ঘন ঘন মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা করতেন এবং এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

মৃত্যু এমন একটি জিনিস যা ঘটবে নিশ্চিত কিন্তু সময়টি অজানা তাই এটি বোধগম্য হয় যে একজন মুসলিম যে পরকালে বিশ্বাস করে সে তার জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয় যা ঘটতে পারে না, যেমন বিয়ে, সন্তান বা তাদের অবসর গ্রহণ। এটা আশ্চর্যজনক যে কত মুসলমান বিপরীত মানসিকতা অবলম্বন করেছে যদিও তারা সাক্ষ্য দেয় যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত অথচ আখেরাত চিরস্থায়ী এবং তারা সেখানে পৌঁছানো নিশ্চিত। কেউ যেভাবে আচরণ করুক না কেন তাদের কাজের ব্যাপারে তাদের বিচার করা হবে। একজন মুসলমানকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করা উচিত নয় যে তারা ভবিষ্যতে পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে পারে এবং করবে কারণ এই মনোভাব তাদের মৃত্যু ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত তাদের আরও বিলম্বিত করে এবং তারা অনুশোচনা নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় যা তাদের সাহায্য করবে না।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নয় যে মানুষ মারা যাবে কারণ এটি অনিবার্য, তবে মূল বিষয় হল এমনভাবে কাজ করা যাতে কেউ এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। এর জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার একমাত্র উপায় হল ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করা, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি তখনই সম্ভব যখন কেউ ঘটতে না পারে এমন জিনিসগুলির জন্য প্রস্তুতির চেয়ে পরকালের জন্য প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেয়।

আভিজাত্য বিশ্বাসে

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, আবু হুযায়ফা (রা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সেলিম যদি সে সময় জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি তাকে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করতেন। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৪১-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে প্রকৃত আভিজাত্য একজন ব্যক্তির বিশ্বাসের শক্তিতে নিহিত।

সুনানে আবু দাউদ, 5116 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, আভিজাত্য কারো বংশের মধ্যে থাকে না কারণ সকল মানুষই হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর। , এবং তিনি ধূলিকণা তৈরি করা হয়েছিল. তাই মানুষের উচিত তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশ নিয়ে অহংকার করা ছেড়ে দেওয়া।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদিও কিছু অজ্ঞ মুসলমান জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অন্য জাতির মনোভাব অবলম্বন করেছে এবং এই গোষ্ঠীর ভিত্তিতে কিছু লোককে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেছে, ইসলাম শ্রেষ্ঠত্বের একটি সহজ মাপকাঠি ঘোষণা করেছে, তাকওয়া। অর্থ, একজন মুসলমান যত বেশি মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তার নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের

মুখোমুখি হয়, মহান আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা তত বেশি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এই আয়াতটি অন্য সমস্ত মানকে ধ্বংস করে যা অজ্ঞ লোকদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেমন একজনের জাতি, জাতি, সম্পদ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান।

উপরন্তু, যদি কোন মুসলমান তাদের বংশের একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য গর্বিত হয় তবে তাদের উচিত মহান আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিশ্বাসটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে অন্যদের সম্পর্কে গর্ব করা ইহকাল বা পরকালে কাউকে সাহায্য করবে না। জামে আত তিরমিযী, ২৯৪৫ নং হাদিসে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশেষে, যে অন্যদের জন্য গর্বিত কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে পরোক্ষভাবে তাদের অসম্মান করে কারণ বহির্বিশ্ব তাদের খারাপ চরিত্র পর্যবেক্ষণ করবে এবং ধরে নেবে তাদের ধার্মিক পূর্বপুরুষ একইভাবে আচরণ করেছিলেন। এই কারণে এই লোকদের উচিত মহান আল্লাহর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। এরা সেইসব লোকের মত যারা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক রীতিনীতি ও উপদেশ গ্রহণ করে, যেমন দাড়ি

বাড়ানো বা স্কার্ফ পরা, তার অন্তরের চরিত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বহির্বিশ্ব তখনই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করবে, যখন তারা এই মুসলমানদের খারাপ চরিত্র দেখবে।

নেতৃত্বের গুণাবলী

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি যদি আবু হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মুক্তকৃত ক্রীতদাস সালিমকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাহলে তিনি তা করবেন। উত্তরে বলুন যে, তিনি এমনটি করেছেন যেভাবে তিনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি মহান আল্লাহকে গভীরভাবে তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, ৩৯৮ নম্বরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ভালোবাসার মূলে রয়েছে আন্তরিকতা।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত

তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি...।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না...।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে।

অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন, তাহলে তিনি তাঁকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিয়োগ করবেন। এবং যখন মহান আল্লাহ তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি উত্তর দিতেন যে তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, তাঁর জাতির আমানতদার ছিলেন আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকির একটি দিক।

এর মধ্যে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের কাছ থেকে থাকা সমস্ত আমানত রয়েছে। প্রত্যেকটি নিয়ামত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে মহান আল্লাহ। এই আমানতগুলো পূরণ করার একমাত্র উপায় হলো দোয়াগুলোকে সেভাবে ব্যবহার করা যা মহান আল্লাহর কাছে খুশি। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আরও আশীর্বাদ লাভ করবে কারণ এটি সত্য কৃতজ্ঞতা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মানুষের মধ্যে বিশ্বাস পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যাকে অন্যের জিনিসপত্র অর্পণ করা হয়েছে সে যেন সেগুলোর অপব্যবহার না করে এবং মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করে। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিশ্বাস হল কথোপকথন গোপন রাখা যদি না অন্যকে জানানোর মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সুবিধা না থাকে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি প্রায়ই মুসলমানদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয়।

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি মুআয বিন জাব্বাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর থেকে বেঁচে থাকেন তবে তিনি তাঁকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিয়োগ করবেন। আর যখন মহান আল্লাহ তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি উত্তর দিতেন যে, তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন মুআয রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে পুনরুত্থিত করা হবে। বিচারের সময়, তিনি পণ্ডিত এবং জ্ঞানবাদীদের নেতৃত্ব দেবেন এবং তিনি তাদের সামনে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকবেন। ইমাম আল আসফাহানীর হিলয়াত আল আউলিয়া, 573 নম্বরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

জামে আত তিরমিযী, 2645 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ যখন কাউকে কল্যাণ দিতে চান তখন তিনি তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক মুসলমান তাদের ঈমানের শক্তি নির্বিশেষে উভয় জগতের মঙ্গল কামনা করে। যদিও অনেক মুসলমান ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে তারা যে ভালোটি কামনা করে তা খ্যাতি, সম্পদ, কর্তৃত্ব, সাহচর্য এবং তাদের কর্মজীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই হাদিসটি এটিকে স্পষ্ট করে দেয় যে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার মধ্যেই সত্য স্থায়ী মঙ্গল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মীয় জ্ঞানের একটি শাখা হল উপকারী পার্থিব জ্ঞান যেখানে কেউ তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বৈধ বিধান উপার্জন করে। যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কোথায় তা নির্দেশ করেছেন তবুও এটা লজ্জার বিষয় যে কত মুসলমান এর মূল্য রাখে না। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য ন্যূনতম ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যের মতো আরও অনেক কিছু অর্জন ও আমল করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে তারা জাগতিক জিনিসের উপর তাদের প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে এবং বিশ্বাস করে যে সেখানে সত্য ভাল পাওয়া যায়। অনেক মুসলমান এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে ধার্মিক পূর্বসূরিদের শুধুমাত্র পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আয়াত বা হাদিস শেখার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল, যেখানে আজকে কেউ তাদের বাড়ি ছাড়াই ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়ন করতে পারে। তবুও, অনেকে আধুনিক দিনের মুসলমানদের দেওয়া এই আশীর্বাদটি ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম রহমত থেকে তাঁর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে শুধু সত্য কল্যাণ কোথায় তা নির্দেশ করেননি বরং তিনি এই মঙ্গলকে মানুষের আঙুলের ডগায়ও রেখেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন যেখানে একটি চিরন্তন সমাধিস্থ ধন রয়েছে যা উভয় জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কেবল তখনই এই কল্যাণ

লাভ করবে যখন তারা এটি অর্জন এবং তার উপর কাজ করার জন্য সংগ্রাম করবে।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হত্যা

বিশ্বের দাস

আল মুগীরাহ ইবনে শুবাত রাদিয়াল্লাহু আনহুর আবু লুলুয়া নামে একজন অমুসলিম ক্রীতদাস ছিল যে পিষে পাথর তৈরি করত। আল মুগীরাহ (রা.) তাঁর কাছ থেকে প্রতিদিন চারটি রৌপ্য মুদ্রা নিতেন। আবু লুলু উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ করেন এবং তাঁকে আল-মুগীরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আদেশ করতে বলেন, তিনি তাঁর কাছ থেকে নেওয়া পরিমাণ কমাতে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আল্লাহকে ভয় করতে এবং তার মালিকের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য সতর্ক করেছিলেন কিন্তু তিনি আল মুগীরাহ (রা.) এর সাথে কথা বলার সম্পূর্ণ ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া আবু লুলুয়ার পক্ষে যথেষ্ট ভাল না হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 383-384-এ এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট ছিল যে আবু লুলুয়া শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির দাস ছিল না বরং সে তার নিজের ইচ্ছারও দাস ছিল, কারণ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিক্রিয়া অন্যায় ছিল না।

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে তাদের কামনা-বাসনা এবং অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এবং এটি তাদের জন্য নির্দেশিত যারা অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসগুলিকে এমনভাবে অনুসরণ করে যে এটি তাদের সঠিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে অবহেলা করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পরকাল এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা পায় না তখন তারা তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

“এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

মুসলমানদের বরং ধৈর্য্য ও সন্তুষ্ট থাকতে শেখা উচিত তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের ঐশ্বর্য। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি হল অভাবী অর্থ, দরিদ্র যদিও তার কাছে অনেক সম্পদ আছে। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে জানা, মহান, মানুষকে তাদের জন্য সর্বোত্তম কী দান করেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

“আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

নামাজের প্রতি আন্তরিকতা

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা গেলেও তিনি জামাতের নামায বন্ধ হতে দেননি। ইহা ইঙ্গিত দেয় নামাজের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা।

জামে আত তিরমিযী, 2618 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল ফরজ নামায ত্যাগ করা।

এই দিন এবং যুগে এটি অনেক বেশি সাধারণ হয়ে উঠেছে। অনেকে তুচ্ছ কারণে তাদের ফরজ নামাজ ত্যাগ করে যা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত তার জন্য যদি নামাযের ফরজ বাদ না দেওয়া হয় তবে তা অন্য কারো থেকে কিভাবে সরানো যাবে? অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 102:

"এবং যখন আপনি [অর্থাৎ, সেনাবাহিনীর কমান্ডার] তাদের মধ্যে থাকবেন এবং তাদের নামাযে নেতৃত্ব দেবেন, তখন তাদের একটি দল আপনার সাথে [প্রার্থনায়] দাঁড়াবে এবং তাদের অস্ত্র বহন করুক। এবং যখন তারা সেজদা করে, তখন তাদের আপনার পিছনে [অবস্থানে] থাকতে দিন এবং অন্য দলটিকে এগিয়ে আসতে দিন যারা [এখনও] নামায পড়েনি এবং তারা সতর্কতা অবলম্বন করে এবং তাদের অস্ত্র বহন করে আপনার সাথে সালাত আদায় করুক..."

মুসাফির বা অসুস্থ কেউই তাদের ফরয নামায পড়া থেকে রেহাই পায় না। মুসাফিরকে তাদের জন্য বোঝা কমানোর জন্য কিছু ফরজ নামাজে চক্রের পরিমাণ কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেগুলি নামায থেকে রেহাই পায়নি। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 101:

"এবং যখন আপনি সারা দেশে ভ্রমণ করেন, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করার জন্য আপনার উপর কোন দোষ নেই.."

অসুস্থদের শুকনো অযু করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যদি পানির সংস্পর্শে তাদের ক্ষতি হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 6:

"...তবে যদি তুমি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো বা তোমাদের মধ্যে কেউ স্বস্তির স্থান থেকে আসে বা নারীদের সাথে যোগাযোগ করে পানি না পেয়ে, তাহলে পরিষ্কার মাটির সন্ধান করো এবং তা দিয়ে তোমার মুখমন্ডল ও হাত মুছে ফেলো..."

এছাড়াও, অসুস্থ ব্যক্তিরা ফরজ সালাত এমনভাবে আদায় করতে পারে যা তাদের পক্ষে সহজ। অর্থ দাঁড়াতে না পারলে তাদের বসতে দেওয়া হবে এবং বসতে না পারলে শুয়ে ফরজ নামাজ পড়তে পারবে। জামে আত তিরমিযী, 372 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আবার, অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয় না যদি না কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হয় যা তাদের নামাযের বাধ্যবাধকতা বুঝতে বাধা দেয়।

অন্য প্রধান সমস্যা হল যে কিছু মুসলমান তাদের ফরজ নামাজ বিলম্বিত করে এবং তাদের সঠিক সময়ের বাইরে নামাজ আদায় করে। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনের বিরোধিতা করে কারণ বিশ্বাসীদেরকে তাদের ফরজ নামাজ যথাসময়ে আদায়কারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 103:

"... অবশ্যই, মুমিনদের উপর নামায ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।"

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি তাদের নির্দেশ করে যারা অকারণে তাদের ফরজ নামাজে বিলম্ব করে। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড 10, পৃষ্ঠা 603-604-এ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 107 আল মাউন, আয়াত 4-5:

"অতএব যারা নামাজ পড়ে তাদের জন্য দুর্ভোগ। [কিন্তু] যারা তাদের নামাযের প্রতি উদাসীন।"

এখানে যারা এই মন্দ স্বভাব অবলম্বন করেছে তাদের উপর মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকলে দুনিয়া বা পরকালে সফলতা কিভাবে পাওয়া যাবে?

সুনানে আন নাসাই নং 512-এ পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, ফরয নামায অকারণে বিলম্বিত করা মুনাফিকির লক্ষণ। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করে বলেছে যে, মানুষের জাহান্নামে প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হল ফরজ নামাজ আদায়ে ব্যর্থ হওয়া। অধ্যায় 74 আল মুদ্দাত্থির, আয়াত 42-43:

"[এবং তাদের জিজ্ঞাসা], "কি আপনাকে সাকারে ফেলেছে?" তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

ফরয নামায ত্যাগ করা এমন একটি মারাত্মক গুনাহ যে, জামে আত তিরমিযী, ২৬২১ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে, যে এ পাপ করবে সে ইসলামে কাফের।

উপরন্তু, অন্য কোন নেক আমল একজন মুসলমানকে উপকৃত করবে না যতক্ষণ না তার ফরজ নামাজ কায়েম না হয়। সহীহ বুখারি, 553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি কেউ দুপুরের ফরজ সালাত মিস করে তাহলে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যদি একটি ফরজ নামায পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে এমন হয় তাহলে কি সবগুলো পরিত্যাগের শাস্তি কল্পনা করা যায়?

সহীহ মুসলিমের ২৫২ নম্বর হাদিসে সঠিক সময়ে ফরয নামায পড়াকে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে নির্ণয় করা যায় যে, ফরয নামাযকে সময় অতিক্রম করতে বিলম্ব করা বা ফরয নামায আদায় করা। তাদের সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মহান আল্লাহ দ্বারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ এক.

তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ফরজ নামাজ পড়তে উৎসাহিত করা সকল প্রবীণদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যাতে তারা তাদের উপর আইনত বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই তা প্রতিষ্ঠা করে। যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা এটি বিলম্বিত করে এবং বাচ্চাদের বড় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে। যে শিশুদের শুধুমাত্র ফরয নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল যখন এটি তাদের উপর ফরয হয়ে যায় তারা খুব কমই তাদের দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কয়েক বছর লেগে যায়। আর দোষটা পড়ে পরিবারের বড়দের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের ওপর। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 495 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে ফরজ নামাজ পড়তে উত্সাহিত করে।

আরেকটি প্রধান সমস্যা অনেক মুসলমানের মুখোমুখি হয় যে তারা বাধ্যতামূলক নামাজ পড়তে পারে কিন্তু সঠিকভাবে তা করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে নামাজের ধাপগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে না এবং এর পরিবর্তে তাড়াহুড়ো করে। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারি, 757 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ পড়ে সে আদৌ নামাজ পড়েনি। অর্থ, তারা তাদের সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হিসাবে লিপিবদ্ধ নয় এবং তাই তাদের বাধ্যবাধকতা পূর্ণ হয়নি। জামে আত তিরমিযী, 265 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি নামাজের প্রতিটি অবস্থানে স্থির থাকে না তার দোয়া কবুল হয় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ব্যক্তি নামাজে সঠিকভাবে রুকু বা সেজদা করে না তাকে নিকৃষ্ট চোর বলে বর্ণনা করেছেন। মুওয়াত্তা মালিক, বই নম্বর 9, হাদিস নম্বর 75-এ প্রাপ্ত একটি হাদিসে এই বিষয়ে

সতর্ক করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান যারা তাদের ফরয এবং অনেক স্বেচ্ছায় নামাজ আদায় করার জন্য কয়েক দশক অতিবাহিত করেছে তারা দেখতে পাবে যে তাদের কেউই গণনা করেনি এবং এইভাবে তারা হবে। যারা তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি তাকে হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি সুনানে আন নাসায়ী, 1313 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সাধারণত একটি মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ পড়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 43:

"... আর রুকু কর তাদের সাথে যারা [ইবাদত ও আনুগত্যে]।

প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে কিছু নির্ভরযোগ্য আলেম মুসলিম পুরুষদের জন্য এটিকে ফরজ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 550 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যে সমস্ত মুসলিমরা মসজিদে জামাতের সাথে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করবে না তাদেরকে সাহাবীগণ মুনাফিক বলে গণ্য করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কোনো বৈধ অজুহাত ছাড়াই মসজিদে তাদের ফরজ নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ পুরুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 1482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার অবস্থানে আছেন তাদের তা করা উচিত। তাদের এই দাবি করা উচিত নয় যে তারা অন্য ধার্মিক কাজ করছে যেমন তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা। যদিও সহীহ বুখারী, ৬৭৬

নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি রেওয়ায়েত, তবে তার রেওয়ায়েতের গুরুত্বকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস না করা গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এটি করে তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে না তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করছে যদিও তারা একটি সৎ কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, এই একই হাদিস উপদেশ দিয়ে শেষ করে যে যখন ফরয সালাতের সময় হবে তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

জবাবদিহিতার ভয়ে

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। এর পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে একজন যুবক তার কাছে প্রবেশ করে এবং একজন সাহাবী, আল্লাহ তার সাথে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য এবং তার খেলাফতের জন্য যা ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ ছিল তার প্রশংসা করে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিয়েছিলেন যে তিনি চান যে তাঁর সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি ভারসাম্যহীনতাকে প্রতিহত করবে যাতে তিনি কিছু হারান বা লাভ না করেন। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি তার জবাবদিহিতার ভয়কে নির্দেশ করে যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

“সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

নম্রতা

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। এর পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে প্রবেশ করেন এবং একজন সাহাবী হওয়ার জন্য এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা. তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, তিনি যখন মারা গেলেন তখন তিনি খুশি হয়েছিলেন। এবং তিনি তার খিলাফতকালে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমর্থন করার জন্য এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে সন্তুষ্ট ছিলেন এমন ব্যক্তিদের একজন হওয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যে, এ সবই মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ। সহীহ বুখারী, 3700 এবং 3692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

এটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মহান বিনয়কে নির্দেশ করে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 63:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা

উভয় জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

“আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে । এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অনুশোচনা

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। এর পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে প্রবেশ করেন এবং একজন সাহাবী হওয়ার জন্য এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা. তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, তিনি যখন মারা গেলেন তখন তিনি খুশি হয়েছিলেন। এবং তিনি তার খিলাফতকালে আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমর্থন করার জন্য এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে সন্তুষ্ট ছিলেন এমন ব্যক্তিদের একজন হওয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন যে, এ সবই মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ। তিনি উপসংহারে এসেছিলেন যে যদি তার কাছে পৃথিবীর সমান সোনা থাকে তবে তিনি তাঁর সাথে

সাক্ষাতের আগে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে মুক্তি দেবেন। সহীহ বুখারী, 3700 এবং 3692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সারা জীবন কিয়ামতের প্রস্তুতির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, তবুও এই কথাগুলি এমন একটি জীবন পরিচালনা করা এড়িয়ে চলার গুরুত্ব নির্দেশ করে যেখানে কেউ বিচারের দিনের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয় এবং তাদের শেষ মুহুর্তে আফসোস ছাড়া কিছুই বাকি রইল না। অনুশোচনা, যা তাদের প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করবে না।

মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখনই তারা কোন ধরনের পার্থিব ব্যর্থতা বা অনুশোচনার সম্মুখীন হয় তখনই তাদের আখেরাতের অনুশোচনার কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, যেমন 89 আল ফজর, 24 নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"সে বলবে, "হায়, আমি যদি আমার জীবনের জন্য [কিছু ভালো] পাঠাতাম।"

এই পৃথিবীতে একজনের অনুশোচনা সর্বদা অন্য একটি সুযোগ বা অন্য বিকল্প দ্বারা অনুসরণ করা হবে যা তারা আবার সাফল্য অর্জনের জন্য অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু পরকালের অনুশোচনা ও ব্যর্থতা এমন একটি বিষয় যার অর্থ সংশোধন করা যায় না, পরকালের দ্বিতীয় কোনো সম্ভাবনা নেই। ভিন্নভাবে কাজ করার জন্য কেউ পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ পাবে না।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত দুনিয়ার ব্যর্থতা ও অনুশোচনার কারণে আখেরাতে যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে পারে তা নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে এই পৃথিবীতে বৈধ সাফল্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। এর অর্থ হল তাদের সর্বদা দুনিয়ায় সাফল্য লাভের চেয়ে পরকালে সাফল্য অর্জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিকতা যা মুসলমানদের এমন একটি দিনে পৌঁছানোর আগে গ্রহণ করা উচিত যেখানে তাদের ব্যর্থতা এবং অনুশোচনার প্রতিফলন তাদের সামান্যতম সাহায্য করবে না। অধ্যায় 89 আল ফজর, আয়াত 23:

"এবং আনা হল, সেই দিনটি হল জাহান্নাম - সেই দিন, মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু কীভাবে তার [অর্থাৎ, কী উপকার হবে] স্মরণ হবে?"

শ্রেষ্ঠ সাহচর্য

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। এর পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য বলেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি নবী মুহাম্মদের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। তাঁকে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর বাড়িতে তাঁর দুই সাহাবীর পাশে দাফনের অনুমতির জন্য, অর্থাত্ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বক্কর সিদ্দিক রা. তাকে। তিনি তার ছেলেকে খলিফা হিসাবে উল্লেখ করার সময় তার অনুমতি না নেওয়ার জন্য জোর দিয়েছিলেন, কারণ তিনি আর খলিফা ছিলেন না। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি নিজে সেখানে দাফন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিজের চেয়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পছন্দ করেছিলেন। যখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবহিত করা

হয়েছিল তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই তাঁর কাছে নেই। তিনি তার ছেলেকে বলেছিলেন যে তিনি মারা যাওয়ার পরে আবার তার অনুমতি চাইতে এবং যদি সে তাকে তার দুই সঙ্গীর সাথে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি দেয় । সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি নিজেকে খলিফা হিসাবে উল্লেখ করেননি, কারণ তিনি আয়েশাকে প্রভাবিত করতে চাননি, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট, তিনি মুসলমানদের নেতা হওয়ায় অনিচ্ছায় সম্মত হন। তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার অনুমতি চাওয়ার মাধ্যমে, তিনি আয়েশাকে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট, তার মন পরিবর্তন করার একটি সুযোগ দিয়েছিলেন কারণ তিনি সম্ভবত অনিচ্ছায় সম্মত হয়েছিলেন কারণ সে সময় সে মারা যাচ্ছিল।

প্রত্যেক মুসলমান খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে, তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবী-রাসুল (সঃ) এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাকে খুব কমই চেনে কারণ তারা তাঁর জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করতে ব্যস্ত। এটা বোকামি যে কিভাবে একজন সত্যিকারের ভালোবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদের কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, হাশরের দিনে তারা কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন, চরিত্র ও শিক্ষার উপর অধ্যয়ন ও আমল করা। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা

অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

অন্যদের জন্য শোক

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। এর পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য বলেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি নবী মুহাম্মদের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। তাঁকে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর বাড়িতে তাঁর দুই সাহাবী অর্থাত্ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে দাফনের অনুমতির জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। , যা সে রাজি। অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর স্ত্রী এবং উমরের কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার কাছে গেলেন এবং তাঁর জন্য কাঁদলেন। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আবু দাউদে পাওয়া একটি হাদিস, 3127 নম্বর, সতর্ক করে যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে প্রিয়জনকে হারানোর মতো কঠিন সময়ে কান্না করা অনুমোদিত নয়। এটি ভুল কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সময় কেউ মারা গেলে কেঁদেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি কেঁদেছিলেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 3126 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কারো মৃত্যুতে কান্না করা রহমতের নিদর্শন যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। এবং শুধুমাত্র যারা অন্যদের প্রতি দয়া দেখায় তাদের উপর মহান আল্লাহ রহমত প্রদর্শন করবেন। সহীহ বুখারী, 1284 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই একই হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নাতি যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য কেঁদেছিলেন।

সহীহ মুসলিম, 2137 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে কান্নার জন্য বা তাদের হৃদয়ে যে দুঃখ অনুভব করে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু তারা শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে যদি তারা মহান আল্লাহর পছন্দের ব্যাপারে তাদের অধৈর্যতা প্রদর্শন করে এমন শব্দ উচ্চারণ করে।

এটা স্পষ্ট যে, কারো হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করা বা চোখের জল ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। হারাম জিনিসগুলি হল কান্না, কথা বা কাজের মাধ্যমে অধৈর্যতা প্রদর্শন করা, যেমন কারো কাপড় ছিঁড়ে ফেলা বা দুঃখে মাথা ন্যাড়া করা। যারা এইভাবে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর সতর্কবাণী। অতএব, যে কোনও মূল্যে এই কর্মগুলি এড়ানো উচিত। এইভাবে কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে না, তবে যদি মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করে এবং অন্যদেরকে এইভাবে কাজ করার আদেশ দেয় তবে তারাও জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি এটা না চায় তাহলে তারা কোনো জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। জামি আত তিরমিযী, 1006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। এটা বোঝা সাধারণ জ্ঞান যে মহান আল্লাহ অন্যের কাজের কারণে কাউকে শাস্তি দেবেন না যখন পূর্ববর্তী ব্যক্তিটি তাদের সেভাবে কাজ করার পরামর্শ দেয়নি। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 18:

"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না..."

খিলাফতের পরামর্শদাতা

শাসন

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। এর পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য বলেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি নবী মুহাম্মদের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। তাঁকে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর বাড়িতে তাঁর দুই সাহাবী অর্থাত্ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে দাফনের অনুমতির জন্য তাঁর

প্রতি সন্তুষ্ট। , যা সে রাজি। যখন তাকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করার আহ্বান জানানো হয়, তখন তিনি তাদের উপদেশ দেন যে নিম্নলিখিত ছয় জনের মধ্য থেকে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করা হবে, যাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুর আগে সন্তুষ্ট করেছিলেন: আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, আয জুবায়ের ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উমর জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর পুত্র, আবদুল্লাহ বিন উমর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, খলিফা নিযুক্ত হবেন না তবে তিনি পরবর্তীটি বেছে নিতে সহায়তা করতে পারেন। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, শোয়েব আর রুমিকেও নিযুক্ত করেছিলেন, পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জামাতের নামাজের ইমামতি করার জন্য। তিনি পরবর্তী খলিফা হতে বেছে নেওয়া ছয়জনের মধ্যে একজনকে নামাযের নেতৃত্ব দেওয়া থেকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন কারণ এটি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে এক প্রকার অনুমোদন হতে পারে, পরবর্তী খলিফা কে হবেন। নির্বাচনকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে চাননি তিনি। ইমাম মুহাম্মদ আস সাল্লাবী, উমর ইবনুল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 398-এ এটি আলোচনা করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রকে পরবর্তী খলিফা হতে বাধা দিয়ে রাজাদের প্রথা এড়িয়ে গেছেন, যদিও তিনি এর যোগ্য ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র এই কাজের জন্য সেরা পুরুষকেই চেয়েছিলেন তাই ছয়জনকে বেছে নিয়েছিলেন যারা খলিফার ভূমিকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এটি ইঙ্গিত করে যে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মানুষের প্রতি কতটা আন্তরিকতা ছিল।

সহীহ মুসলিম নং 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ।

অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয় । আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"...আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

চূড়ান্ত আদেশ

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুবরণ করছিলেন তখন তিনি তাঁর ছেলেকে নিম্নোক্ত আদেশ দিয়েছিলেন, যা ইমাম সুয়ূতির তারিখ আল খুলাফা, পৃষ্ঠা 154-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁকে বললেন, তাঁর কাফনের জন্য বেশি ব্যয় করবেন না, কারণ মহান আল্লাহ যদি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি তা তাঁর জন্য উত্তম জিনিস দিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি তিনি তার উপর রাগান্বিত হন, তাহলে তিনি তার কাফন খুলে ফেলতেন।

এমনকি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাফনের মধ্যেও বাড়াবাড়ি পরিহার করতেন।

সহীহ বুখারী, ২৮৮৬ নং হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও সুন্দর পোশাকের দাসদের সমালোচনা করেছেন। এসব মানুষ পেলে খুশি হয় আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

বাস্তবে, এটি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পার্থিব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমালোচনা তাদের প্রতি নির্দেশিত নয় যারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য জড় জগতে সংগ্রাম করে কারণ এটি মহান আল্লাহর আনুগত্যের একটি অংশ। কিন্তু এটা তাদের দিকেই নির্দেশিত যারা হয় সম্পদ ও অন্যান্য পার্থিব জিনিস অর্জনের জন্য হারামের পেছনে ছুটছে তাদের কামনা-বাসনা এবং অন্যের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। এবং এটি তাদের জন্য নির্দেশিত যারা অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিসগুলিকে এমনভাবে অনুসরণ করে যে এটি তাদের সঠিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে অবহেলা করে। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি তাদের পরকাল এবং তাদের চূড়ান্ত বিচারের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

উপরন্তু, এই সমালোচনা তাদের জন্য যারা অধৈর্য হয় যখন তারা এই দুনিয়ায় তাদের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছা অর্জন করে না। এই মনোভাব একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে। অর্থ, যখন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অর্জন করে তখন তারা তাঁর আনুগত্য করে কিন্তু যখন তারা তা পায় না তখন তারা তাঁর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করবে তার জন্য পবিত্র কুরআন উভয় জগতেই মারাত্মক ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করেছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

মুসলমানদের বরং ধৈর্য্য ও সন্তুষ্ট থাকতে শেখা উচিত তাদের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে কারণ সহীহ মুসলিমের 2420 নম্বর হাদিস অনুযায়ী এটাই সত্যিকারের ঐশ্বর্য। বাস্তবে, আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ব্যক্তি হল অভাবী অর্থ, দরিদ্র যদিও তার কাছে অনেক সম্পদ আছে। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে জানা, মহান, মানুষকে তাদের জন্য সর্বোত্তম কী দান করেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নয় কারণ এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

“আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কবর খনন করার সময় তাকে মিতব্যয়ী হতেও বলেছিলেন, কারণ মহান আল্লাহ যদি তার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তবে তা যতদূর দৃষ্টিশক্তি পৌঁছাতে পারে ততদূর প্রসারিত হবে। কিন্তু যদি তিনি তার উপর রাগান্বিত হতেন, তাহলে কবর তার উপর আঁটসাঁট করে রাখত যতক্ষণ না তার পাঁজরগুলো একত্রিত হয়ে যায়। তিনি তাকে কবর দেওয়ার জন্য দ্রুততার সাথে বলেছিলেন কারণ যদি তার মধ্যে ভাল থাকে তবে তিনি যা ভাল তার দিকে চলে যাবেন। কিন্তু যদি তার মধ্যে খারাপ থাকে, তবে তারা দ্রুততার সাথে তাদের কাঁধ থেকে একটি মন্দ দূর করবে।

জামে আত তিরমিযী, 2460 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, কবর হল জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত। এই হাদিসটি আরও ব্যাখ্যা করে যে যখন একজন সফল মুমিনকে তাদের কবরে স্থাপন করা হয় তখন তা তাদের জন্য প্রশস্ত এবং আরামদায়ক হয়ে ওঠে যেখানে একজন পাপী ব্যক্তির কবর তাদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং ক্ষতিকারক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবে প্রত্যেক ব্যক্তি যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তখন তাদের সাথে জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত নিয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আমল। যদি একজন মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়, তবে এটি নিশ্চিত করবে যে তারা প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রস্তুত করবে। তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। কিন্তু যদি তারা মহান আল্লাহকে অমান্য করে, তাহলে তাদের পাপ জাহান্নামের গর্ত তৈরি করবে যে তারা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম পাবে।

অতএব, মুসলমানদের আজই কাজ করতে হবে এবং এই প্রস্তুতিতে দেরি না করে কারণ মৃত্যুর সময় অজানা এবং প্রায়শই হঠাৎ আসে। আগামীকালের জন্য দেরি করা একটি বোকামি এবং এটি কেবল অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। একইভাবে একজন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে তাদের ঘরকে সুন্দর করার জন্য অনেক শক্তি এবং সময় ব্যয় করে তাদের অবশ্যই তাদের কবরকে সুন্দর করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কারণ সেখানে যাত্রা অনিবার্য এবং সেখানে দীর্ঘ সময় থাকা। এবং যদি কেউ তাদের কবরে কষ্ট পায় তবে এর পরে যা হবে তা আরও খারাপ হবে। সুনানে ইবনে মাজা, 4267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে আরও বলেছিলেন যে, কেউ যেন তাঁর কাছে পবিত্রতা না বলে, কারণ মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন।

সহীহ বুখারী, 2662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অন্যের প্রশংসা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

এটি একটি অপছন্দনীয় কাজ কারণ এটি প্রথমত পাপ হতে পারে যদি প্রশংসা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হয়। বিশেষ করে লোকেদের প্রশংসা করা সত্য হলেও, অজ্ঞরা তাদের গর্বিত হতে পারে। এটি একটি খারাপ বৈশিষ্ট্য কারণ একটি পরমাণুর মূল্য একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রশংসা করা এমনকি প্রশংসিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করেছে, এবং তাই তাঁর আনুগত্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই।

একজন মুসলমানকে অন্যের প্রশংসায় প্রতারিত করা উচিত নয় কারণ তারা তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং অভ্যন্তরীণ লুকানো চরিত্র অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে ভালো জানে। মহান আল্লাহ তায়ালা অসংখ্যবার মানুষের কাছ থেকে তাদের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা নিয়ে চিন্তা করলে তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত। উপরন্তু, তাদের মনে রাখা উচিত যে তারা যে প্রশংসিত গুণের অধিকারী, তা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন, তাই সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিৎ মহান আল্লাহর প্রতি আরো বেশি

কৃতজ্ঞ হওয়া, তাদের কাছে থাকা নেয়ামতগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে। বরং তাদের উচিত অন্যদেরকে এই হাদিস সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের প্রশংসা না করার জন্য সতর্ক করা।

শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে অন্যের প্রশংসা গ্রহণযোগ্য এবং তাদের প্রশংসা করা উচিত নয়, সত্যের সাথে লেগে থাকা এবং এটি করা উচিত যাতে তাদের আরও ভাল কাজ করতে উত্সাহিত করা যায়। এটি বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন, তাদের স্কুলের কাজের সম্মানে তাদের প্রশংসা করা, ভালো আচরণ করা এবং ইসলামের দায়িত্ব পালন করা।

চূড়ান্ত পরামর্শ

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যেই জানতেন যে তিনি শহীদ হবেন যেহেতু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহীহ বুখারী, 3675 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার মসজিদে নববীতে ইমামতি করার জন্য বের হয়েছিলেন। নামাজ শুরু করার সাথে সাথে তাকে বলতে শোনা গেল, কুকুর আমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আবু লুলুয়া নামক এক অমুসলিম ক্রীতদাস তাকে বিষাক্ত দু-ধারের ছুরি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে। লোকটি পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং তেরো জনকে ছুরিকাঘাত করেছিল, যার মধ্যে সাতজন মারা গিয়েছিল, যতক্ষণ না একজন মুসলিম তার উপর একটি চাদর ছুঁড়েছিল এবং যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে সে ধরা পড়েছে, তখন সে আত্মহত্যা করেছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাওয়ার আগে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে সামনের দিকে ঠেলে দেন যাতে তিনি জামাতের নামাজের ইমামতি শেষ করতে পারেন। এর পরে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য বলেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি নবী মুহাম্মদের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। তাঁকে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর বাড়িতে তাঁর দুই সাহাবী অর্থাত্ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে দাফনের অনুমতির জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। , যা সে রাজি। মৃত্যুর আগে তিনি নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন, যা সহীহ বুখারির ৩৭০০ নম্বর হাদিসে এবং ইমাম মুহাম্মাদ আস সাল্লাবীর, উমর ইবন আল খাত্তাব, হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস, ভলিউম 2, পৃষ্ঠা 389-390-এ আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি পরবর্তী খলিফাকে মক্কা থেকে মদিনায় প্রথম দিকের হিজরতকারীদের ভাল যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাদের অধিকার জানতে এবং তাদের সম্মান ও সম্পদ রক্ষা করেন। তার জন্য মদিনার সাহাবীদের (সাহায্যকারীদের) ভাল যত্ন নেওয়ার জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি পরবর্তী খলিফাকে তাদের ভালোকে মেনে নিয়ে এবং তাদের অন্যায়কে ক্ষমা করে তাদের প্রতি নমনীয় হওয়ার আহ্বান জানান। শহরের মানুষের সাথেও তার ভালো ব্যবহার করা উচিত। তার উচিত আরব বেদুইনদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, কারণ তারা আরবদের উৎপত্তি এবং ইসলামের উপাদান। তার উচিত তাদের নিম্নমানের ধন-সম্পদ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা (ফরজ সদকা)। পরিশেষে, খলিফার উচিত ইসলামী শাসনের অধীনে অমুসলিমদের যুদ্ধ ও রক্ষার মাধ্যমে তাদের অধিকার পূরণ করা এবং তাদের সামর্থ্যের বাইরে যা ছিল তা দিয়ে তাদের উপর অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই উপদেশ ভদ্রতার প্রতি আহ্বান জানায়।

জামে আত তিরমিযী, 2701 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা সকল মুসলমানের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটি একজন ব্যক্তির জীবনের সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নম্র হওয়া অন্য কারো চেয়ে মুসলমানদের নিজেদেরই বেশি উপকার করে। তারা শুধু মহান আল্লাহর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার লাভ করবে না এবং তাদের পাপের পরিমাণ কমিয়ে দেবে, যেহেতু একজন ভদ্র ব্যক্তি তাদের কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে পাপ করার সম্ভাবনা কম থাকে, তবে এটি তাদের পার্থিব বিষয়েও উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর সাথে ভদ্র আচরণ করে সে যদি তার স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করে তবে তার বিনিময়ে তারা আরও বেশি ভালবাসা এবং সম্মান পাবে। শিশুরা তাদের পিতামাতার আনুগত্য এবং সম্মানের সাথে আচরণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে যখন তাদের সাথে নরম আচরণ করা হয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যে তাদের সাথে নম্র আচরণ করে তাকে সাহায্য করার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণ অন্তহীন. শুধুমাত্র খুব বিরল ক্ষেত্রে একটি কঠোর মনোভাব প্রয়োজন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, কঠোর মনোভাবের চেয়ে মৃদু আচরণ অনেক বেশি কার্যকর হবে।

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনও অগণিত ভাল গুণাবলীর অধিকারী, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর নম্রতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন কারণ এটি অন্যদেরকে ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মূল উপাদান। অধ্যায় 3 আল ইমরান, আয়াত 159:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই একজন মহানবী (সাঃ) এর চেয়ে উত্তম হতে পারে না, এবং তারা যার সাথে যোগাযোগ করে সে ফেরাউনের চেয়েও খারাপ হতে পারে না, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-কে শান্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফেরাউনের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য তাদের প্রতি হও। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 44:

"এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

অতএব, একজন মুসলমানের উচিত সকল বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করা কারণ এটি অনেক সওয়াবের দিকে পরিচালিত করে এবং অন্যদেরকে প্রভাবিত করে, যেমন একজনের পরিবারকে, ইতিবাচক উপায়ে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলিফাকে মানুষের ব্যাপারে মহান আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু মহান আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ইসলাম মুসলমানদের শেখায় যে বস্তুগত জগত থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাদের বিশ্বাসের সাথে কখনই আপস করা উচিত নয়। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 135:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর অবিচল থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়..."

বস্তুগত জগৎ অস্থায়ী হওয়ায় এর থেকে যা কিছু লাভ হয় তা শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যায় এবং পরকালে তাদের কর্ম ও মনোভাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে। অন্যদিকে, ঈমান হল সেই মূল্যবান রত্ন যা একজন মুসলিমকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ দেখায়। অতএব, সাময়িক কিছুর জন্য যে জিনিসটি বেশি কল্যাণকর ও দীর্ঘস্থায়ী, তার সাথে আপোষ করা স্পষ্ট বোকামি।

অনেক লোক বিশেষ করে মহিলারা তাদের জীবনে এমন মুহুর্তগুলির মুখোমুখি হবে যেখানে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করতে হবে কিনা তা বেছে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষেত্রে একজন মুসলিম মহিলা বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি যদি তার স্কার্ফ খুলে ফেলেন এবং একটি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরেন তবে তিনি কর্মক্ষেত্রে আরও সম্মানিত হবেন এবং এমনকি কর্পোরেট সিঁড়িতে আরও দ্রুত আরোহণ করতে পারেন। একইভাবে, কর্পোরেট জগতে কাজের সময়ের পরে সহকর্মীদের সাথে মিশতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। তাই একজন মুসলমান কাজ করার পরে নিজেকে একটি পাব বা ক্লাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

এরকম সময়ে এটা মনে রাখা জরুরী যে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা কেবল তাদেরই দেওয়া হবে যারা ইসলামের শিক্ষার উপর অবিচল থাকে। যারা এভাবে আমল করবে তারা পার্থিব ও দ্বীনি সফলতা লাভ করবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তাদের পার্থিব সাফল্য তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। প্রকৃতপক্ষে, এটি মহান

আল্লাহর জন্য মানবজাতির মধ্যে তাদের মর্যাদা ও স্মরণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত খলিফারা এর উদাহরণ। তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করেনি এবং বরং সারা জীবন অবিচল থাকে এবং এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের একটি পার্থিব ও ধর্মীয় সাম্রাজ্য দান করেন।

সাফল্যের অন্য সব রূপ খুব সাময়িক এবং শীঘ্র বা পরে তারা তার বাহকের জন্য একটি অসুবিধা হয়ে ওঠে। একজনকে শুধুমাত্র অনেক সেলিব্রিটিদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যারা খ্যাতি এবং ভাগ্য অর্জনের জন্য তাদের আদর্শ এবং বিশ্বাসের সাথে আপোষ করেছিলেন শুধুমাত্র এই জিনিসগুলির জন্য তাদের দুঃখ, উদ্বেগ, হতাশা, পদার্থের অপব্যবহার এবং এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে ওঠে।

এক মুহুর্তের জন্য এই দুটি পথের উপর প্রতিফলিত করুন এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নিন কোনটি পছন্দ এবং বেছে নেওয়া উচিত।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরবর্তী খলিফাকে গরীবদের ওপর ধনীদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ না করার পরামর্শও দিয়েছিলেন।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৪৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বাহ্যিক চেহারা বা সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিচার করেন। এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল যে কোন কাজ করার সময় একজন মুসলমানকে সর্বদা তাদের নিয়ত সংশোধন করা উচিত যেহেতু আল্লাহ, মহান, শুধুমাত্র তখনই তাদের প্রতিদান দেবেন যখন তারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করে। যারা অন্য লোক ও জিনিসের জন্য কাজ করে তাদের বলা হবে যে তারা বিচার দিবসে যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

উপরন্তু, এই হাদীসটি ইসলামে সাম্যের গুরুত্ব নির্দেশ করে। একজন ব্যক্তি তার জাতিগত বা সম্পদের মতো পার্থিব বিষয়গুলির দ্বারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। যদিও, অনেক মুসলমান সামাজিক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মতো এই বাধাগুলি তৈরি করেছে যার ফলে কিছুকে অন্যদের চেয়ে ভাল বিশ্বাস করে ইসলাম স্পষ্টভাবে এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। একমাত্র জিনিস যা একজন মুসলমানকে অন্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তাদের তাকওয়া মানে, তারা কতটা মহান আল্লাহর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

তাই একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, তাঁর অধিকার ও মানুষের অধিকার পূরণ করে এবং বিশ্বাস না করা যে তাদের কিছু আছে বা আছে যা তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। সহীহ মুসলিমের ৬৮৫৩ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন যে, যে মুসলমানের সৎকাজের অভাব রয়েছে তার অর্থ, মহান আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে না। তাদের বংশের কারণে পদমর্যাদা। বাস্তবে, এটি সম্পদ, জাতি, লিঙ্গ বা সামাজিক ভ্রাতৃত্ব এবং বর্ণের মতো সমস্ত জাগতিক জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরবর্তী খলিফাকে মহান আল্লাহর হুকুম, তাঁর পবিত্র সীমাবদ্ধতা এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করার পরামর্শ দেন।

সহীহ মুসলিম, 159 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুদূরপ্রসারী উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে মহান আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে আন্তরিকভাবে ঘোষণা করার এবং তারপর তার উপর অটল থাকার পরামর্শ দেন।

নিজের ঈমানের উপর অটল থাকার অর্থ হল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশ, যা তাঁর সাথে সম্পর্কিত, যেমন ফরজ রোযা এবং যা মানুষের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা। এটি ইসলামের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অন্তর্ভুক্ত যা একজন ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর মধ্যে এবং অন্যদের সাথে জড়িত। একজন মুসলমানকে অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করতে হবে

যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সর্বোত্তম কি তা বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

অবিচলতার মধ্যে উভয় প্রকারের শিরক থেকে বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। প্রধান ধরন হল যখন কেউ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে। গৌণ ধরন হল যখন কেউ অন্যদের কাছে তাদের ভাল কাজগুলি দেখায়। সুনানে ইবনে মাজা, ৩৯৮৯ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব, অবিচলতার একটি দিক হলো সর্বদা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

এর মধ্যে রয়েছে নিজেকে বা অন্যের আনুগত্য ও সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে অমান্য করে, নিজেকে বা অন্যকে খুশি করার মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা জানবে না মানুষ তাদের মহান আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে না। পক্ষান্তরে, যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য করেন, তিনি তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে সুরক্ষিত থাকবেন যদিও এই সুরক্ষা তাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়।

নিজের ঈমানের উপর অবিচল থাকার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসরণ করা এবং এ থেকে বিচ্যুত পথ অবলম্বন না করা। যে ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করার চেষ্টা করবে তার আর কিছুর প্রয়োজন হবে না কারণ এটাই তাদের ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য যথেষ্ট।

মানুষ নিখুঁত না হওয়ায় তারা নিঃসন্দেহে ভুল করবে এবং পাপ করবে। সুতরাং ঈমানের বিষয়ে অবিচল থাকার অর্থ এই নয় যে একজনকে নিখুঁত হতে হবে বরং এর অর্থ হল তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যদি তারা পাপ করে থাকে তাহলে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। এটি 41 ফুসসিলাত, 6 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"... সুতরাং তাঁর কাছে সোজা পথে চলুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন..."

জামি আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এটি আরও সমর্থন করে, যা মহান আল্লাহকে ভয় করার এবং একটি (ছোট) পাপকে মুছে ফেলার পরামর্শ দেয় যা একটি সৎ কাজ সম্পাদন করে। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই 2, হাদিস নম্বর 37-এ পাওয়া আরেকটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও তারা তা করবে। নিখুঁতভাবে করতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন মুসলমানের কর্তব্য হল মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য এবং শারীরিক কর্মের মাধ্যমে তাদের

যে সম্ভাবনা দেওয়া হয়েছে তা পূরণ করা। এটা সম্ভব নয় বলে তাদের পূর্ণতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, নিজের অন্তরকে প্রথমে পরিশুদ্ধ না করে কেউ তাদের শারীরিক কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজা, 3984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুধুমাত্র শুদ্ধভাবে কাজ করবে যদি আধ্যাত্মিক হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করলেই হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জিত হয়।

অবিচল আনুগত্যের জন্য একজনকে তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটি হৃদয়কে প্রকাশ করে। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য সম্ভব নয়। জামে আত তিরমিযী, 2407 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহ তায়ালার অবিচল আনুগত্যে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক অনুতপ্ত হতে হবে এবং মানুষের অধিকারের সাথে জড়িত থাকলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যায় 46 আল আহকাফ, আয়াত 13:

"নিশ্চয় যারা বলেছে, "আমাদের রব আল্লাহ" অতঃপর সঠিক পথে রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, পরবর্তী খলিফাকে আইনগত শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে নম্র না হওয়ার পরামর্শ দেন।

সমাজ বিমুখ হয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল মানুষ ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করেছে। সহীহ বুখারি 6787 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) একবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্বলদের শাস্তি দিত যখন তারা আইন ভঙ্গ করত কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালীদের ক্ষমা করত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও এই হাদিসে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ে অপরাধ করলে তিনি তার উপর পূর্ণ আইনি শাস্তি কার্যকর করবেন। যদিও সাধারণ জনগণের সদস্যরা তাদের নেতাদের তাদের ক্রিয়াকলাপে ঠিক থাকার পরামর্শ দেওয়ার অবস্থানে নাও থাকতে পারে তবে তারা তাদের সমস্ত লেনদেন এবং কর্মে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমানকে অবশ্যই তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের, যেমন তাদের সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে। সুনানে আবু দাউদ, 3544 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা কার সাথে লেনদেন করুক না কেন তাদের সকল ব্যবসায়িক লেনদেনে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত। যদি মানুষ স্বতন্ত্র স্তরে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করে তবে সম্প্রদায়গুলি আরও ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ যারা প্রভাবশালী অবস্থানে আছেন, যেমন রাজনীতিবিদ, তারা চান বা না চান তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলিফাকে সমালোচকদের দোষারোপকে ভয় না করার পরামর্শ দেন।

একজন মুসলমানকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই ধরনের মানুষ আছে। প্রথমটি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় কারণ তাদের অন্যদের সমালোচনা পবিত্র কুরআনে পাওয়া সমালোচনা এবং উপদেশ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনটি সর্বদা গঠনমূলক হবে এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবে। এই লোকেরাও অন্যের বেশি বা কম প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদের অতিরিক্ত প্রশংসা করা তাদের গর্বিত এবং অহংকারী হতে পারে। অন্যদের প্রশংসা করার অধীনে তাদের অলস হয়ে যেতে পারে এবং তাদের ভাল কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া প্রায়ই শিশুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রশংসা করা অন্যদেরকে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এটি তাদের অহংকারী হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতএব, এই ব্যক্তির প্রশংসা এবং গঠনমূলক সমালোচনা অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং তার উপর কাজ করা উচিত।

দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ইচ্ছার ভিত্তিতে সমালোচনা করে। এই সমালোচনা বেশিরভাগই গঠনমূলক এবং শুধুমাত্র একজনের খারাপ মেজাজ এবং মনোভাব দেখায়। এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রশংসা করে যখন তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই দুটির নেতিবাচক প্রভাব আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রশংসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা উচিত যদিও তা প্রিয়জনের কাছ থেকে আসে কারণ এটি

কেবল সমালোচনার ক্ষেত্রে অহেতুক দুঃখিত এবং প্রশংসার ক্ষেত্রে অহংকারী হয়ে ওঠে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে অন্যদের বেশি প্রশংসা করে সে প্রায়শই তাদের সমালোচনাও করবে। যে নিয়মটি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত তা হল তাদের কেবলমাত্র ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে সমালোচনা ও প্রশংসা গ্রহণ করা উচিত। অন্যান্য সমস্ত জিনিস উপেক্ষা করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে নেওয়া উচিত নয়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলিফাকেও সত্যকে মেনে চলার এবং তা পৌঁছানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার পরামর্শ দেন।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। বেশিরভাগ মৌখিক পাপ ঘটে কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলিফাকে সর্বদা নিজেকে উপদেশ দেওয়ার পরামর্শ দেন।

মুসলমানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদের সম্পর্কে নিজেদের চেয়ে ভালো জানেন না। যখন কেউ সততার সাথে তাদের নিজের কাজের বিচার করে তখন এটি তাদের তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে অনুপ্রাণিত করে এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে তাদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয় সে গাফিলতির জীবন যাপন করবে যাতে তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে পাপ করে। এই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাদের কৃতকর্মের ওজন করা অত্যন্ত কঠিন মনে করবে । প্রকৃতপক্ষে, এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

একজন চতুর ব্যবসার মালিক সর্বদা তাদের অ্যাকাউন্টগুলি নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এটি তাদের ব্যবসায়িক মাথা সঠিক পথে নিশ্চিত করবে এবং তারা ট্যাক্স রিটার্নের মতো সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টগুলি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেছে তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু মূর্খ ব্যবসার মালিক নিয়মিত তাদের ব্যবসার হিসাব নেবে না। এটি লাভের ক্ষতি এবং তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুতিতে ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। যারা সরকারের কাছে সঠিকভাবে তাদের হিসাব জমা দিতে ব্যর্থ হয় তারা শাস্তির সম্মুখীন হয় যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লার জন্য একজনের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং প্রস্তুত করতে ব্যর্থতার শাস্তিতে আর্থিক জরিমানা জড়িত নয়। এর শাস্তি আরও কঠোর এবং সত্যিকার অর্থে অসহনীয়। অধ্যায় 99 Az Zalzalah, আয়াত 7-8:

“সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরবর্তী খলিফাকে মুসলমানদের প্রতি দয়া প্রদর্শন, বয়স্কদের সম্মান, তরুণদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং জ্ঞানীদের সম্মান করার পরামর্শ দিয়েছেন।

জামে আত তিরমিযী, 1921 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে একজন ব্যক্তি যদি ছোটদের প্রতি দয়া দেখাতে, বড়দের সম্মান করতে এবং আদেশ দিতে ব্যর্থ হয় তবে সে প্রকৃত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ভাল এবং মন্দ নিষেধ।

ধর্ম, বয়স বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান ও দয়ার সাথে আচরণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না সে অন্যদের জন্য তা পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে যা জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

যুবকদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের মধ্যে রয়েছে তাদের মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করা, তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য

অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এটি অবশ্যই উদাহরণের মাধ্যমে নেতৃত্বের মাধ্যমে করা উচিত কারণ এটি অন্যদের, বিশেষ করে যুবকদের পথ দেখানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের নেতিবাচক বা ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করার কারণে তাদের শুধুমাত্র ভাল লোকেদের সাথে যেতে উত্সাহিত করা উচিত। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরিশেষে, তাদের দেখানো উচিত যে ইসলাম একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম যা তাদের প্রচুর বৈধ মজা করার অনুমতি দেয়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4835 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রাচীনদের সম্মান করার মধ্যে রয়েছে তাদের সঙ্গে ধৈর্যশীল হওয়া এবং তাদের সঙ্গে তর্ক না করা। একজন মুসলিম বড়দের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে কিন্তু সর্বদা ভালো আচরণ এবং সম্মান বজায় রাখতে হবে। তাদের অবশ্যই সর্বদা সমর্থন করা উচিত যার মধ্যে শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সহজ কথায়, একজন প্রবীণদের সাথে কীভাবে আচরণ করে তা হল তারা যখন বয়স্ক হয় তখন অন্যরা তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করবে।

পরিশেষে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামী জ্ঞান অনুসারে ভালোর আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতে হবে। কঠোরতা প্রায়ই মানুষকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়। একজন মুসলমানের এই দায়িত্ব পালন করা উচিত, তা মানুষের উপর প্রভাব ফেলুক বা না করুক কেননা এটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। তারা তাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হবে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরবর্তী খলিফাকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সম্পদকে শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যে প্রবাহিত হতে দেবেন না।

সহীহ বুখারির ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, দুনিয়ার ধনী ব্যক্তিরা পরকালে গরীব হবে যদি না তারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করে তবে এই লোক সংখ্যায় অল্প। .

এর অর্থ এই যে, অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ ভুলভাবে ব্যয় করে, অর্থাৎ হয় নিরর্থক জিনিসের জন্য যা তাদের আখিরাতে কোন উপকার করে না, অথবা তারা এমন পাপ কাজে ব্যয় করে যা উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় অথবা তারা ব্যয় করে। ইসলামের অপছন্দের মত হালাল জিনিসের উপর যেমন অপব্যয় বা অযথা। এসব কারণে বিচারের দিন ধনীরা গরীব হয়ে যাবে কারণ তাদের জবাবদিহি করা হবে এবং এমনকি তাদের উপর শাস্তিও দেওয়া হবে।

উপরন্তু, যারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পদ তাদেরকে তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাই তারা পরকালে খালি হাতে গরিব হিসেবে পৌঁছাবে। জামি আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি তার জন্য দায়বদ্ধ থাকা অবস্থায় অন্যদের ভোগের জন্য সম্পদ রেখে যাবে।

পরিশেষে, ধনীরা যেমন তাদের সম্পদ অর্জন, মজুদ, রক্ষা এবং বৃদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, এটি তাদের সৎ কাজ করা থেকে বিভ্রান্ত করে যা বিচার দিবসে কাউকে ধনী করে তোলে। বাস্তবে, এটিকে হারানো তাদের দরিদ্র করে তুলবে।

এটা মনে রাখা জরুরী, সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করা মানে শুধু দাতব্য দান করা নয় বরং এর মধ্যে অযথা বা অপব্যয় না করে তাদের প্রয়োজনীয় এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত ধনী সেই ব্যক্তি যে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে। এই ব্যক্তি দুনিয়া ও পরকালে ধনী হবে। এবং এই মনোভাব অনেক সম্পদ থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। যেকোন পরিমাণ সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একজন ব্যক্তি ধনী হতে পারে যদিও তার কাছে সামান্য সম্পদ থাকে। বাস্তবে, এই ব্যক্তি তাদের সম্পদ তাদের সাথে পরকালে নিয়ে যায় এবং এই মনোভাব তাদের অবসর সময় দেয় যা তাদেরকে সৎ কাজ করতে দেয় যা পরকালে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পরবর্তী খলিফাকেও উপদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি লোকেদের জন্য তাঁর দরজা বন্ধ করবেন না।

সহীহ মুসলিমের ৬৫৮৬ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন যে, মুসলিম জাতি একটি দেহের মতো। শরীরের কোনো অংশে ব্যথা হলে শরীরের বাকি অংশ তার ব্যথায় অংশ নেয়।

এই হাদিসটি, অন্য অনেকের মতো, নিজের জীবনে এতটা আত্মমগ্ন না হওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে যাতে এমন আচরণ করা হয় যেন মহাবিশ্ব তাদের এবং তাদের সমস্যাগুলির চারপাশে ঘুরছে। শয়তান একজন মুসলিমকে তাদের নিজের জীবন এবং তাদের সমস্যার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে যে তারা বড় চিত্রের উপর মনোযোগ হারায় যা অধৈর্যতার দিকে পরিচালিত করে এবং তাদের অন্যদের প্রতি গাফিলতি করে যার ফলে তাদের উপায় অনুযায়ী অন্যদের সমর্থন করার দায়িত্ব ব্যর্থ হয়। একজন মুসলমানের সর্বদা এটি মনে রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব অন্যদের সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। এটি আর্থিক সাহায্যের বাইরেও প্রসারিত এবং এতে সমস্ত মৌখিক এবং শারীরিক সাহায্য যেমন ভালো এবং আন্তরিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের উচিত নিয়মিত সংবাদ পর্যবেক্ষণ করা এবং যারা সারা বিশ্বে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। এটি তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া এড়াতে এবং পরিবর্তে অন্যদের সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত করবে। বাস্তবে, যে কেবল নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে সে একটি পশুর চেয়েও নিচু হয়, এমনকি তারা তাদের সন্তানদেরও যত্ন করে। প্রকৃতপক্ষে, একজন মুসলমানের উচিত তার নিজের পরিবারের বাইরে অন্যের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পশুর চেয়েও উত্তম।

যদিও একজন মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে না কিন্তু তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করতে পারে কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেন এবং আশা করেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী খলিফাকেও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, শক্তিশালীকে দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতে না দেওয়া।

সুনানে আবু দাউদ, 4340 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করার গুরুত্বের পরামর্শ দিয়েছেন। এই হাদিসটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে সকল প্রকারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। তাদের শক্তি এবং উপায় অনুযায়ী মন্দ. এই হাদিসে বর্ণিত সর্বনিম্ন স্তর হল মন্দকে অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা।

এটি দেখায় যে অভ্যন্তরীণভাবে খারাপ কাজগুলিকে অনুমোদন করা নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ, 4345 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ সংঘটিত হলে উপস্থিত থাকে এবং তা নিন্দা করে সে সেই ব্যক্তির মতো যে উপস্থিত ছিল না। . কিন্তু যে অনুপস্থিত ছিল এবং মন্দ কাজটি অনুমোদন করেছে সে সেই ব্যক্তির মত যে এটি করার সময় উপস্থিত ছিল।

মন্দের প্রতি আপত্তি করার প্রথম দুটি দিক, যা আলোচনায় প্রধান হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হল একজনের শারীরিক কাজ ও কথাবার্তা। এটি শুধুমাত্র একজন মুসলিমের উপর একটি কর্তব্য যার তা করার শক্তি আছে উদাহরণস্বরূপ, তারা তাদের কাজ বা কথার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নিজের হাত দিয়ে মন্দকে আপত্তি করা মানে লড়াই করা নয়। এটি অন্যের মন্দ কাজগুলিকে সংশোধন করাকে বোঝায়, যেমন বেআইনিভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে এমন কারো অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। যে ব্যক্তি

এখনও এটি করার অবস্থানে রয়েছে, সে তা করা থেকে বিরত থাকে তাকে একটি শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4338 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে।

মহানবী (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 2191 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে তারা যেন সৃষ্টিকে ভয় না করে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি সৃষ্টির ভয়কে তাদের মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করা থেকে বিরত রাখতে দেয় তাকে সেই ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে নিজেকে ঘৃণা করে এবং বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালার দ্বারা সমালোচিত হবে। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 4008 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি উল্লেখ্য যে, এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় না যে ক্ষতির ভয়ে চুপ থাকে কারণ এটি একটি গ্রহণযোগ্য অজুহাত, তবে এটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে নীরব থাকে কারণ মানুষ তাদের চোখে ধরে রাখে স্ট্যাটাস।

সুনানে আবু দাউদ, 4341 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি যখন অন্যরা তাদের লোভের আনুগত্য করে, তাদের ভুল মতামত ও আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করে এবং যখন তারা পরকালের চেয়ে বস্তুগত দুনিয়াকে পছন্দ করে তখন তাদের কাজ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে খারাপ জিনিসের বিরুদ্ধে আপত্তি করা ছেড়ে দিতে পারে। এই সময়টা এসে গেছে বলে শেষ করতে পণ্ডিত লাগে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 105।

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের উপর। যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তুমি হেদায়েত পাবে..."

তবে এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানকে তাদের নির্ভরশীলদের প্রতি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা উচিত কারণ এটি সুনানে আবু দাউদ, 2928 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এবং তারা শারীরিক ও মৌখিকভাবে যা অনুভব করে তাদের প্রতি এটি একটি কর্তব্য। থেকে নিরাপদ, কারণ এটি উচ্চতর মনোভাব।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্ট যে মন্দ জিনিসের প্রতি আপত্তি করাকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ, এটি মুসলমানদেরকে অন্যদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না যাতে আপত্তি করার মতো খারাপ জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু নিষিদ্ধ। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 12:

"ওহে যারা ঈমান এনেছ... গুপ্তচরবৃত্তি করো না..."

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে হবে, তাদের ইচ্ছার উপর নয়। একজন মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে, যখন তারা নয়। এটা প্রমাণিত হয় যখন তারা মন্দের বিরুদ্ধে এমনভাবে আপত্তি করে যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে যা ভাল কাজ বলে মনে করা হয় তা পাপ হয়ে যেতে পারে।

একজন মুসলমানকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মৃদু ও ন্যায্যভাবে মন্দের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিপরীতটি কেবলমাত্র মানুষকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে দূরে ঠেলে দেবে এবং তাদের ক্রোধের ফলে আরও পাপ হতে পারে।

একটি ফাইন রোল মডেল

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর তাঁকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয় এবং লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে, তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকে। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে তিনি পছন্দ করবেন এমন কেউ নেই। সহীহ বুখারী, ৩৬৮৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি একটি ভাল রোল মডেল বেছে নেওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ইতিহাসের পাতা উল্টালে তারা এমন অনেক লোককে দেখতে পাবে যারা মহান পার্থিব সাফল্য অর্জন করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এখনও মানবজাতিকে উপকৃত করেছে, তারা অন্তত একটি জিনিসও লক্ষ্য করবে যা তাদের অর্জনকে কলঙ্কিত করে। কিন্তু কেউ যদি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী পর্যবেক্ষণ করে, তবে তারা সফলতা এবং মানবজাতির উপকারী অগণিত জিনিস ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। যদিও এমন কিছু লোক আছে যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিথ্যা সমালোচনা করে, তবুও তাঁর অত্যন্ত নির্ভুল ও বিশদ জীবনী থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যা নির্ভরযোগ্য মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে যে এই সমালোচনার ভিত্তি। মিথ্যা ছাড়া কিছুই না। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই সমস্ত রোল মডেলকে একপাশে রেখে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্রুটিহীন চরিত্র অধ্যয়ন ও গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটিই

একজনের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনেই প্রকৃত সাফল্য অর্জনের একমাত্র উপায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এই পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ তাদের বিশ্বাস নির্বিশেষে এটি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা করে। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তার সবটুকুই তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদতলে রেখেছেন। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং [যে] বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে।"

এটা সহজ, একজন ব্যক্তি যদি পার্থিব ও ধর্মীয় সাফল্য কামনা করে তবে তার উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কিন্তু যদি তারা তার ব্যতীত অন্য কোন পথ বেছে নেয় তবে তারা যা কিছু কলঙ্কিত সাফল্য অর্জন করে তা শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং এটি একটি মহান দিনে শাস্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ভালো সাহচর্য

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর তাঁকে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয় এবং লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে, তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকে। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি সর্বদা মনে করতেন যে মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর দুই সাহাবীর সাথে রাখবেন, অর্থাত্ মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু সা. বক্কর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, যেমন তিনি প্রায়শই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিজের, আবু বক্কর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একত্রে উল্লেখ করতে শুনেছেন। সহীহ বুখারী, ৩৬৮৫ নং হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুনিয়াতে তার ভালো সাহচর্য আখিরাতে ভালো সাহচর্যের দিকে নিয়ে যায়।

সহীহ বুখারী, 5534 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভাল এবং খারাপ সঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম সঙ্গী হল সেই ব্যক্তির মত যে সুগন্ধি বিক্রি করে। তাদের সঙ্গী হয় কিছু সুগন্ধি প্রাপ্ত হবে বা অন্তত মনোরম গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হবে. অন্যদিকে, একজন খারাপ সঙ্গী একজন কামারের মতো, যদি তাদের সঙ্গী তাদের কাপড় না পোড়ায় তবে তারা অবশ্যই ধোঁয়ায় আক্রান্ত হবে।

মুসলমানদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যে লোকেদের সাথে থাকবে তাদের উপর প্রভাব পড়বে তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক, স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম। কাউকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয় এবং এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীর ধর্মে রয়েছে। অর্থ, একজন ব্যক্তি তার সঙ্গীর বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। তাই মুসলমানদের জন্য সর্বদা ধার্মিকদের সঙ্গী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা নিঃসন্দেহে তাদের ইতিবাচক উপায়ে প্রভাবিত করবে যার অর্থ, তারা তাদের অনুপ্রাণিত করবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। অন্যদিকে, খারাপ সঙ্গীরা হয় কাউকে মহান আল্লাহকে অমান্য করতে অনুপ্রাণিত করবে, অথবা তারা একজন মুসলমানকে পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য বস্তুগত জগতে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে। এই মনোভাব বিচারের দিনে তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হয়ে উঠবে যদিও তারা যে জিনিসগুলির জন্য চেষ্টা করে তা বৈধ কিন্তু তাদের প্রয়োজনের বাইরে।

পরিশেষে, সহীহ বুখারী, 3688 নং হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে একজন ব্যক্তি পরকালে যাদেরকে ভালবাসে তাদের সাথে শেষ হবে, একজন মুসলমানকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে তাদের সঙ্গ দিয়ে ধার্মিকদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু যদি তারা খারাপ বা গাফেল লোকদের সঙ্গ দেয় তবে তা প্রমাণ করে এবং ইঙ্গিত করে যে তারা তাদের প্রতি ভালবাসা এবং পরকালে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

উসমান ইবনে আফফানকে খলিফা মনোনীত করা

পরবর্তী খলিফা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের পর এবং তাঁর পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি যে ছয়জনকে মনোনীত করেছিলেন: আলী ইবনে আবু তালিব, উসমান ইবনে আফফান, আয জুবায়ের ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াকাস এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, একটি বৈঠক করেন। আব্দুর রহমান, তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, অন্যদেরকে শাসনের জন্য প্রার্থীদের সংখ্যা কমিয়ে তিনজন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আয জুবায়ের আলীর পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। তালহা উসমানের পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। সা'দ আব্দুর রহমানের পক্ষে তার অধিকার ছেড়ে দেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অধিকার ছেড়ে দেন এবং বাকি দুজনকে, অর্থাৎ আলী ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের সঙ্গীর পক্ষে তাদের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। দুজনেই চুপ করে থেকে ভাবতে লাগলো কি করা যায়। তারপর আব্দুর রহমান, আল্লাহ তাঁর সাথে সন্তুষ্ট, তাদের কাছ থেকে অন্যদের সাথে পরামর্শ করার অনুমতি চাইলেন যাতে তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কে হবেন পরবর্তী খলিফা। তারা উভয়েই তার পরামর্শে রাজি হন। অবশেষে, আব্দুর রহমান, তাঁর উপর সন্তুষ্ট, উসমানের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং তাঁর পরে আনুগত্যের অঙ্গীকারকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আলী, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এরপর বাকি লোকেরাও তাঁর কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করল। সহীহ বুখারী, 3700 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে তারা প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছিল এবং জাগতিক কারণে উদ্‌বুদ্ধ ছিল না এবং পরবর্তী খলিফা হিসেবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ছিল।

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একটি সত্যবাদী প্রশংসা

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদমর্যাদা আসমানে নির্ধারিত হয়েছিল এবং তারপর সত্যবাদী মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আশ্রয়দাতা হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন সত্যের কণ্ঠস্বর এবং পবিত্র কুরআনের মাপকাঠি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সবকিছু বিচার করতেন। তাঁর প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা চিরকাল তাঁর পতাকা এবং তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর বাণীকে শক্তিশালী করেছেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সমর্থন করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন এর ব্যানারগুলো উঁচু হয়ে যায় কারণ তিনি ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার জবাব। জামে আত তিরমিযী, 3681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই দিন থেকে ইসলাম জনবহুল হয়ে ওঠে এবং এর ভিত্তি দৃঢ় হয়। তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত মহানুভবতার মাধ্যমে মুসলমানদের ভাগ্যের পালা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুমিনদের কণ্ঠস্বর গোপন হওয়ার পর শোনা গেল। বিশ্বাসীদের আত্মা উন্নীত হয়েছিল এবং তিনি ঐশ্বরিক প্রকাশকে রক্ষা করার জন্য একটি নতুন স্পষ্টতা এবং সংকল্প নিয়ে আসেন। সেই দিন থেকে অবিশ্বাসীদের ছলনা ও তাদের ছলনা প্রবলভাবে নড়ে উঠল। তাদের সংখ্যার ওজন আর ক্ষমতার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করেনি এবং তাদের খলনায়ক কৌশলটি প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং ব্যর্থ হওয়ার জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি অসাধারণ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যারা ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করেছিল তাদের পরিকল্পনার অবসান ঘটাতে তার দৃঢ় সংকল্প অবিশ্বাসীদের তাদের পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিল। তিনি তাঁর অবিসংবাদিত আস্থা এবং মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ শক্তি এবং সাহায্যের উপর অদম্য নির্ভরতার মাধ্যমে তাদের প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, পূর্ণতা, তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীতে তাঁর সর্বোচ্চ ইচ্ছার সেবা করার প্রত্যাশায় বিশ্বাসীদের কষ্ট ও দুঃখ-কষ্টে অংশীদার হতেন। যখন তিনি নীরব ছিলেন তখনও তার সমতা কথা বলেছিল, তার অস্থিরতা

তার শক্তিকে অতিক্রম করেছিল, তার তপস্বী বিচ্ছিন্নতা তার উদ্দেশ্যকে বলেছিল, তার স্থির কথাগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর কাছাকাছি ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে, সেগুলি বহুবার ঐশ্বরিক প্রকাশ দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। এটি সহীহ বুখারী, 402 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসতেন এবং মহান আল্লাহ তায়ালা তৈরি করেছেন। তার কথায় সত্য ও ন্যায়ের অনুরণন। পালাক্রমে, উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, মহান আল্লাহকে এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর রব ছাড়া আর কাউকে ভয় করতেন না।

উপসংহার

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরকতময় জীবন অধ্যয়ন করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, তিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি কার্যত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে চলা এবং অনুসরণ করে তার মৌখিক বিশ্বাসের ঘোষণাকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি তার ইচ্ছার উপযোগী আদেশ বাছাই করেননি, বরং তিনি মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং মহান আল্লাহর প্রতিটি আদেশকে আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত ছিলেন। তাঁর একক লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর সমস্ত কথা ও কাজ এই মহৎ লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এই মনোভাব তাকে আধ্যাত্মিকভাবে জড়জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে উৎসাহিত করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে নিজের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। এবং তিনি আধ্যাত্মিকভাবে পরকালের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এর জন্য কার্যত প্রস্তুতির জন্য তার প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করে। এই বৈশিষ্ট্যই তাকে এবং অন্যান্য সাহাবীগণকে, মহানবী (সা.)-এর পর সর্বোত্তম দলে পরিণত করেছিল। এই সত্যটি ইমাম আবু নাঈম আল-আসফাহানীর, হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাত আল আসফিয়া, বর্ণনা 278-এ আলোচনা করা হয়েছে। তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যগুলি শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। , তাঁর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক, যাতে তারাও উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করে।

উপরন্তু, তার জীবন অধ্যয়ন করলে, এটি স্পষ্ট যে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সহজে পৌঁছেনি।

সাহাবায়ে কেরামের রক্ত, অশ্রু, ঘাম এবং ত্যাগের মাধ্যমে তারা তাদের কাছে পৌঁছেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। দুর্ভাগ্যবশত, এই সত্যটি আজ মুসলমানদের দ্বারা প্রায়ই উপেক্ষা করা হয় , কারণ ইসলামের শিক্ষাগুলি আজকাল খুব সহজলভ্য। কেউ কল্পনা করতে পারেন যে উমর, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, কতটা হতাশ হবেন যদি তিনি দেখতে পান যে কিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে পারে। নিঃসন্দেহে, সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের ত্যাগের জন্য তাদের পুরস্কার পাবেন কিন্তু মুসলমানদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তারা তাদের কাছে ঋণী। এই স্বীকৃতি কেবল কথায় নয় কর্মে দেখাতে হবে। এর সাথে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে আন্তরিকভাবে শেখা ও আমল করা জড়িত। এটিই একমাত্র উপায় যা একজন সাহাবায়ে কেরামকে স্বীকৃতি, সম্মান এবং ভালবাসেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। কাজ ছাড়া কথা ভালোবাসার চেয়ে ভন্ডামীর কাছাকাছি।

পরিশেষে, প্রত্যেক মুসলমান খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে, তারা পরকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), অন্যান্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের সাহচর্য কামনা করে। তারা প্রায়শই সহীহ বুখারি, 3688 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি উদ্‌ধৃত করে, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি পরকালে তাদের সাথে থাকবে যাদের তারা ভালবাসে। আর এর কারণে তারা মহান আল্লাহর এই নেক বান্দাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে তারা এই ফলাফল কামনা করে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি ভালবাসার দাবি করে, তবুও তারা তাদের জীবন অধ্যয়ন করতে খুব ব্যস্ত বলে তাদের খুব কমই চেনেন। , অক্ষর এবং শিক্ষা. কীভাবে একজন সত্যিকারের মানুষকে ভালবাসতে পারে যাকে তারা জানে না?

উপরন্তু, যখন এই লোকদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি তাদের ভালবাসার প্রমাণ চাওয়া হবে, তখন তারা বিচারের দিন কি বলবে? তারা কি উপস্থাপন করবে? এই ঘোষণার প্রমাণ তাদের জীবন, চরিত্র এবং শিক্ষার উপর অধ্যয়ন এবং অভিনয়। এই প্রমাণ ছাড়া একটি ঘোষণা মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন না। এটা খুবই সুস্পষ্ট কারণ সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে ভালো ইসলামকে কেউ বুঝতে পারেনি, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, এবং এটি তাদের মনোভাব ছিল না। তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ঘোষণা করেন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কর্মের মাধ্যমে তাদের দাবিকে সমর্থন করেন। এই কারণেই তারা পরকালে তার সাথে থাকবে।

যারা বিশ্বাস করে যে ভালবাসা হৃদয়ে রয়েছে এবং এটিকে কাজের মাধ্যমে দেখানোর প্রয়োজন হয় না তারা সেই ছাত্রের মতো বোকা যে ছাত্রটি তাদের শিক্ষকের কাছে একটি ফাঁকা পরীক্ষার কাগজ ফিরিয়ে দেয় এবং দাবি করে যে জ্ঞান তাদের মনে রয়েছে তাই তাদের কার্যত লিখতে হবে না। কাগজে নিচে এবং তারপর এখনও পাস করার আশা.

যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, সে মহান আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসে না, কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা নিঃসন্দেহে শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যান্য ধর্মের সদস্যরাও তাদের পবিত্র নবীদের প্রতি ভালবাসা দাবি করে, তাদের উপর শান্তি। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাদের শিক্ষার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা অবশ্যই বিচারের দিন তাদের সাথে থাকবে না। এক মুহুর্তের জন্য যদি কেউ এই সত্যটি নিয়ে চিন্তা করে তবে এটি বেশ স্পষ্ট।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

সম্পূর্ণ অডিওবুক - নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীদের (রাঃ) জীবনী:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLt1Vizm7rRKaK5Vk9IdVBnpLLolh0dhYG

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
eBooks/AudioBooks-এর জন্য ব্যাকআপ সাইট:
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক: https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe